অন্তঃকরণ

শৈবাল মিত্র

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

এই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির পাঠক

অধ্যাপক সুজিৎ ঘোষ

য়ু নিড্ অপারেশন, তোমাকে অপারেশন করাতে হবে। পল্লবের বুক থেকে স্টেথিস্কোপ তুলে কথাটা বললেন ইংল্যাণ্ডের ডাকসাইটে সার্জেন মিস্টার লিওনার্ড কলিন্স।

পল্লব চুপ।

তিন হাজার পাউণ্ড খরচ লাগবে।

পল্লব নির্বাক।

আমার পারিশ্রমিক দু হাজার পাউণ্ড আমি নেব না। পারিশ্রমিক বাদ দিয়েই তিন হাজার পাউণ্ড!

কলিন্সের সব কথা কানে ঢুকছে না পল্লবের। বোবা হয়ে গেছে সে।

তোমার হার্টের যা অবস্থা তিন মাসের মধ্যে টাকাটা যোগাড় করতে হবে তোমাকে। দেরি হলে বিপদ ঘটতে পারে।

কথা শেষ করে বাদামী রঙের নরম, পুরু কার্পেট মাড়িয়ে নিঃশব্দে নিজের ঘরে চলে গেলেন কলিন্স। কলিন্সের পেছনে গেল তাঁর সেক্রেটারি মিসেস্ হেওয়ার্থ। অসাড়, আচ্ছন্ন পল্লব দেখল রোগী দেখার ঘর ফাঁকা হয়ে গেছে। পল্লবের ঠিক মুখের ওপর লম্বা গলা সারসের মত স্প্রিং লাগানো একটা টেবিল ল্যাম্প। জোরালো আলো। কলিন্সের মুখ, কথা কিছুই মনে পড়ছে না পল্লবের। মাথার মধ্যে ঝিমঝিম, অলৌকিক ঘণ্টাধ্বনি, তিন-হাজার পাউণ্ড, তিন মাস সময় বেজে চলেছে। তিনমাস মানে নব্বই দিনের মধ্যে তিন হাজার পাউণ্ড যোগাড় না হলে তাকে মরতে হবে। তিন মাস পরের সেই দিন, হিসেব কষে পল্লব পেল তেইশে মার্চ। তেইশে মার্চের পর পৃথিবীতে তার জায়গা হবে না। তেইশে মার্চের পর হয়ত আরও দু' পাঁচদিন সে বাঁচতে পারে। তার বেশি নয়। নিঃশব্দে তেইশে মার্চ, তেইশে মার্চ পল্লব বিড়বিড় করল কয়েকবার। তেইশে মার্চ কী বার হদিস করতে চাইল সে। একটু ভেবেই পেয়ে গেল তেইশে মার্চ, মঙ্গলবার। নব্বই দিন পরের এক ধূসর মঙ্গলবার যেন স্পষ্ট দেখতে পেল সে। এক তীক্ষ্ণ কণ্ঠ, কী হবে, আমার কী হবে, আমি কি বাঁচব না, মরে যাব, গোঙাতে

থাকল তার অন্তরাত্মা। কিন্তু বাঁচার দাম, তিন হাজার পাউন্ড, ষাট হাজার টাকা এই অচেনা বিদেশ বিভূঁই-এ কে দেবে আমাকে ? কোথা থেকে এতো টাকা যোগাড় করব আমি ? কলকাতায় থাকলেও কি এ টাকা আমি যোগাড় করতে পারতাম ? পারতাম না। তিন মাস কেন, তিন বছরেও যোগাড় হত না। তার মানে টাকার অভাবে মরতে হবে আমাকে। অমোঘ, নিশ্চিত মৃত্যু !

কথাটা ভেবে আরও বিকল, অবশ হল পল্লব। তেইশে মার্চ, মঙ্গলবার আবার মনে পড়ল তার। এ জীবনে হয়ত সেই শেষ মঙ্গলবার। তারপর পৃথিবীতে তার চিহ্ন থাকবে না। মঙ্গলবার রাত ফুরোলে বুধবার সকালে সূর্য উঠবে, সূর্য ডুববে, আরও অনেক সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষায় ঋতুবদল হবে, বদলে যাবে আকাশের রঙ, মাটির গন্ধ, নারী, পুরুষ, শিশু বৃদ্ধের হাসি, কান্না, কোলাহলে উথলে উঠবে পৃথিবী, শুধু সে নেই, সে থাকবে না। আগামী বছর তেইশে মার্চ, দু'এক দিন আগে, পরে তাকে ঝেড়ে ফেলে দেবে পৃথিবী। তিন মাস পরে তেইশে মার্চ, মঙ্গলবারের কথা ভেবে আতঙ্কে কুঁকড়ে গেল পল্লবের অসুস্থ হৃৎপিন্ড। নিজের মনে পল্লব ডুকরে উঠল, আমি মরব না, কিছুতেই নয়, কত কাজ আমার বাকি; আমাকে বাঁচতেই হবে।

কাজের কথা, বাঁচার আকাঙ্ক্ষায় ভীষণ কান্না পেল পল্লবের। চোখ ফেটে জল আসতে চাইল। কিন্তু শুকনো, খটখটে শুধু জ্বালা, এক ফোঁটা জল নেই। গত চার পাঁচ বছর ল্যাসিক্স নামে একটা ওষুধ খেয়ে তার শরীরের সব জল শুকিয়ে গেছে। কান্নার জন্যেও ছিটেফোঁটা জল শরীরে নেই। পল্লব ভাবল, দেশ, ঘর, বৌ, ছেলেমেয়ে ছেড়ে ছ'হাজার মাইল দূরে এই বিদেশে কেন মরতে এলাম আমি ?

হার্লে স্ট্রিটে মিঃ লিওনার্ড কলিন্সের রোগী দেখার ঘরে সাদা ধবধবে চাদর ঢাকা বিছানায় একা শুয়ে তার যুক্তি, বুদ্ধি তালগোল পাকিয়ে গেল। পনের দিন হল লন্ডনে এসেছে পল্লব। লন্ডনে পেঁছে সে জানল যে আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে রুটিন পরীক্ষার জন্যে কলিন্স ওয়াশিংটনে গেছে। পনের দিন হাপিত্যেশ প্রতীক্ষার পর কলিন্সের সার্জারিতে আজ ডাক পেয়েছে পল্লব। এ দেশে ডাক্তারের ব্যক্তিগত চেম্বারকে সার্জারি বলা হয়। ব্যাকেলাইটের তৈরি আধফোটা পদ্মফুলের মত শেডে ঢাকা মৃদু আলো ডানদিকের

টেবিলে জ্বলছে। বিছানার পায়ের কাছে দেওয়ালে হাল্কা সবুজ রঙের বেসিন। বেসিনে ঠাণ্ডা, গরম জলের দুটো কল। বেসিনের ঠিক ওপরে ঝকঝকে আয়না।

শুধু ট্রাউজার্স পরে খালি গা পল্লব বিছানায় শুয়ে আছে। সেণ্ট্রাল হিটিং গরম ঘরেও শীত করছে তার। বাইজেনটাইন্ নকশা করা দামী ওয়াল-পেপার লাগানো দেওয়ালের দিকে ফাঁকা চোখে তাকিয়ে আছে সে।

বন্ধ কাঁচের জানলায় হলুদ ভেলভেটের ঢেউ তোলা পর্দা। বেসিনের পাশে একপায়া মেহগনি কাঠের হ্যাটস্ট্যাণ্ডের পেতলের হুকে ঝুলছে পল্লবের শার্ট, কার্ডিগান, জ্যাকেট। চারপাশ চুপচাপ, শব্দহীন। সামনের ঘরে তার জন্যে অপেক্ষা করছেন মিঃ কলিন্স। পল্লব জানে, তার মেডিকেল রিপোর্ট আলোকিত কাঁচের বাক্সে এক্সরে প্লেট এঁটে কলিন্স এখন খুঁটিয়ে দেখছেন। কলিন্সের সেক্রেটারি মিসেস্ হেওয়ার্থ একগাদা ফাইল দুহাতে বুকে আঁকড়ে ধরে, ফাইলগুলো যেন এখনই হাত ফসকে মেঝেতে পড়ে যাবে, এরকম বিব্রত ভঙ্গীতে সার্জেনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘন অন্ধকার, কুয়াশায় বাইরের রাস্তা, লোকালয় ঢাকা। বন্ধ জানলার কাঁচে আঁচড় কাটছে সাঁইসাঁই হাওয়া। আজ সকাল থেকে সূর্য ওঠেনি। ঝিপঝিপ একঘেয়ে বৃষ্টি হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডায় রাস্তাতে লোক চলাচল কম। প্রায় নির্জন, ঝকঝকে কালো পিচের ভিজে রাস্তায় হুসহুস করে ছুটে যাচ্ছে একটা দুটো গাড়ি। শীতকাতর শহর যেন গর্তে ঢুকে পড়েছে। সারা সকাল বন্ধুর বাড়ির জানলার সামনে বসে ওভারকোট, দস্তানা, টুপি, মাফলারে মোড়া যে কয়েকজন পথচারীকে পল্লব দেখেছে, তারা যেন কাপড়ে তৈরী জ্যান্ত পুতুল। শুধু আজ নয়, গত সাতদিন সূর্য ওঠেনি। মেঘ, বৃষ্টি, অন্ধকার দেখে দেখে মন খারাপ হয়ে গেছে পল্লবের। বাঁচার ইচ্ছে, সাহস আত্মবিশ্বাস এ আবহাওয়ায় ক্রমশ যেন ফুরিয়ে যাচ্ছে। হাত ঘড়িতে সাড়ে ছ'টা। বিছানা ছেড়ে ধীরে ধীরে উঠে পড়ল পল্লব। পোশাক পরে পাশের ঘরে কলিন্সের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে।

নামী সার্জেনরা নামের আগে কেউ ডাক্তার লেখেন না। লেখেন মিস্টার। কলিন্সও তাই করেন। মুখোমুখি চেয়ারে বসতে পৃথিবীর পাঁচ সেরা

কার্ডিয়াক সার্জেনদের একজন মিঃ কলিন্স বললেন, এই ছোট্ট হৃৎপিণ্ড বছরে দেড় কোটিবার খোলে আর বন্ধ হয়, বিশহাজার মাইল রক্ত লেনদেন করে, এক মুহূর্ত ছুটি নেই। ভেবে দ্যাখো, কি পরিশ্রমই করতে হয়। সুস্থ একটা হৃৎপিণ্ড সারাজীবনে যে পরিমাণ কাজ করে, তা জুড়লে একটা ক্যানাডিয়ান ইঞ্জিন মহাশূন্যে পাঠিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু তোমার হৃৎপিণ্ড জখম, আগে থেকেই অসুস্থ, হৃৎপিণ্ডের দুটো ভালভ্, রজা ফেঁসে গিয়ে শুদ্ধ, অশুদ্ধ রক্ত মিশে যাচ্ছে। এ রোগের নাম মাইট্রাল স্টেনোসিস অ্যান্ড এওটিক্ ইনকম্পিটেন্স……।

কলিন্সের কাটা কাটা ইংরেজী কথার শব্দ ছাপিয়ে পল্লবের মাথায়, বাজছে, তিনহাজার পাউন্ড, তিনমাস সময়। তেইশে মার্চ, মঙ্গলবার। তিন হাজার পাউন্ড। তিন মাস। মিঃ কলিন্সের চকচকে গোলাপী টাকের ওপর থয়েরি ছিটছিট দাগ। ফুলহাতা শার্টের মণিবন্ধে দুটো বড় জ্বলজ্বলে হীরে। ঘরের বাতাসে দামী সিগারের হাল্কা সুগন্ধ। পাশের ঘরে পরীক্ষার সময় বিছানায় শুয়ে কলিন্সের শরীরে এ গন্ধ পেয়েছিল পল্লব। কলকাতা থেকে কলিন্সের জন্যে আনা পল্লবের উপহার, খাদি সিল্কের একজোড়া টাই, রাংতা মোড়া চায়ের প্যাকেট সামনে টেবিলের ওপর পড়ে আছে। হঠাৎ সামনে ঝুঁকে করমর্দনের জন্যে ডান হাত বাড়িয়ে কলিন্স বললেন, গুড বাই। পুষ্ট, লালচে ডাক্তারের হাত যে খুব নরম, ধরেই অনুভব করল পল্লব।

সার্জারি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা দিয়ে ঝিপঝিপ বৃষ্টি, বরফের মত ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাঁপুনি ধরে গেল পল্লবের। জনবিরল, অভিজাত হার্লে স্ট্রিটে একজন মানুষ নেই। বৃষ্টি ধোয়া পিচের রাস্তা। রাস্তার দু'পাশের ফুটপাত ঘেঁসে গাড়ির লাইন, দরজা, জানলা বন্ধ বিশাল সব বাড়ি। দু'একটা বাড়ির পর্দা ঢাকা বন্ধ কাঁচের জানলার ওপাশে আলোর ঝলক। নিস্তব্ধ, নিঝুম পাথরপুরীগুলোর কোথাও মানুষের সাড়া নেই। ফাঁকা রাস্তায় নিজের পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠছে পল্লব। একটু হেঁটেই শ্বাসকষ্ট, হাঁপ ধরছে তার। এটাই তার রোগের প্রধান লক্ষণ। একটানা একশো গজও সে হাঁটতে পারে না। জোর করে হাঁটলে কণ্ঠে জিভ বেরিয়ে আসে। ঝিপঝিপ বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে মাথার চুল, জ্যাকেট। ক্ষুরধার হাওয়া বরফের ফণার মত ক্রমাগত ছোবল মারছে। পল্লবের টুপি নেই, হাতমোজা, ওভারকোট নেই।

একজোড়া হাতমোজা, একটা ওভারকোট আগামীকাল পাওয়ার কথা আ।
ক্লান্তি, অবসাদে ভেঙে পড়া শরীরকে একটু বিশ্রাম দিতে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে পড়ল পল্লব। রাস্তার দুপাশে পাতাঝরা কয়েকটা লম্বা গাছের কঙ্কাল। বৃষ্টি, তুষারে গাছগুলোর শরীরে শ্যাওলার এমন আস্তর পড়েছে যে গাছ বলে চেনা যায় না। এই গাছগুলো কি কোনদিন পাতায়, ফুলে সজীব ছিল, আবার কি এরা বেঁচে উঠবে? দম নেওয়ার জন্যে দাঁড়াতে শীতে যেন জমে গেল পল্লব। এখান থেকে আধমাইল দূরে অক্সফোর্ড স্ট্রিট টিউব স্টেশন যেন অনেক দূর, পৃথিবীর শেষ প্রান্ত, পল্লবের মনে হল স্টেশন পর্যন্ত সে কোনদিন পেঁছিতে পারবে না। ঝড়ের গতিতে দু'একটা গাড়ি রাস্তা দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। দু'জন মানুষ পল্লবকে পাশ কাটিয়ে হনহন করে ওয়েস্টমোরল্যান্ড স্ট্রিটের দিকে চলে গেল। কি স্বাস্থ্যবান মানুষ, কেমন দর্পিত, সাবলীল তাদের হাঁটা! আপার উইমপোল স্ট্রিটের মোড়ে পেঁছে পল্লবের মাথাঘোরা শুরু হল। হৃৎপিণ্ড হাঁসফাঁস করছে শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে সারা শরীর। সামনে কাঁচ ঢাকা একটা টেলিফোন বুথ। আলো জ্বলছে ভেতরে। শীতে আধমরা পল্লব একটু তাপ, উষ্ণতার আশায় বুথে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। বুথের ভেতরটা শুকনো এবং গরম। ট্রাউ-জার্সের পকেট থেকে ঠাণ্ডায় অসাড় দু'হাত বার করে ঘসতে ঘসতে আরামে শ্বাস ফেলল সে। তারপর গভীর একটা নিঃশ্বাস টেনে ফেঁসে যাওয়া হৃৎপিণ্ডে বাতাস ভরে নিতে চাইল। পারল না। পুরো নিঃশ্বাস আজকাল সে নিতে পারে না। তার সব নিঃশ্বাস আধখানা। কণ্ঠনালীর তলায়, ফুসফুসের ঠিক ওপরে একটা কঠিন দেওয়ালে ঘা খেয়ে নিশ্বাসের অর্ধেক বাতাস বেরিয়ে আসে। ছোট বুথের চারপাশের কাঁচ ঘামতে শুরু করেছে। বুথের দরজা খুলে একজন উঁকি দিয়ে পল্লবকে দেখে স্যারি বলে পেছিয়ে গেল দুপা। লজ্জায়, সঙ্কোচে ফোন করার জন্যে যেন বুথে ঢুকেছে প্রমাণ করতে দু'পেনির একটা তামার চাকতির খোঁজে পকেট হাতড়াতে থাকল পল্লব। সম্মান বাঁচাতে যে কোনও একটা নম্বরে সে ফোন করতে চায়। কালো ওভারকোট পরা লোকটা বুথের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে ভয়ে চমকে উঠেছিল পল্লব! বেশ কয়েকবছর আগের একটা ঘটনা তার মনে পড়েছিল। সেদিন শেষ বিকেলে কলকাতায় শিবনারায়ণ দাস লেন দিয়ে ঝামাপুকুরে যাচ্ছিল পল্লব। দিন ফুরোবার আগেই গলির মধ্যে ছায়া

নেমেছে। রাস্তায় মানুষজন কম, হইচই নেই। গলি পথে কিছুটা এগোতে সেই ভয়ংকর দৃশ্যটা নজরে পড়েছিল পল্লবের। পুরানো, নোনা ধরা একটা বাড়ির ইট বার করা পাঁচিলের ওপর সাক্ষাৎ মৃত্যুকে বসে থাকতে দেখেছিল সে। কুচকুচে কালো একটা কাকের ছদ্মবেশে মৃত্যু বসেছিল পাঁচিলের ওপর। কাকটার দেড় দু'হাত দূরে পাঁচিলের ওপর ঘাড় গুঁজে বসে অসুস্থ মুমূর্ষু একটা পায়রা ধুঁকছিল। পালক ঢাকা রুগ্ন পায়রার দুচোখ আধবোজা, লাল। ওড়ার শক্তি হারিয়ে পায়রাটা থরথর করে কাঁপছে। মৃত্যু যে পাশে হাজির টের পেয়েছিল পায়রাটা। নধর, ধূর্ত কালো দাঁড়কাকটা আড়চোখে পায়রার ওপর নজর রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে মুমূর্ষু প্রাণীটার দিকে সরে যাচ্ছে। পায়রার কণ্ঠনালী লক্ষ্য করে একবার ছোঁ মারল কাকটা। রুগ্ন, লোম ওঠা পায়রা বাঁচার জন্যে অনেক কষ্টে ঘাড়সোজা করে দাঁড়াল। কাকের শিকার ফসকে গেল। আবার সে ফিরে এল নিজের জায়গায়। একবার ঘাড় তুলে পায়রাটা ফের ঝিমিয়ে পড়ল। তার গলা, পা শরীরে ঢুকে গেল। পায়রাটার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বসে থাকল কাকটা। তারপর পায়ে পায়ে সরে আসতে লাগল শিকারের দিকে। নিরীহ, অসুস্থ পাখিটার পরিণাম বুঝতে পেরে ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছিল পল্লব। এখন অসুস্থ শরীরে মিশ-মিশে কালো সেই কাকটাকে পল্লব প্রায়ই দেখতে পায়।

পকেট হাতড়ে দুপেনি না পেয়ে বুথের বাইরে এসে দাঁড়াল পল্লব। হিম-শীতল স্রোত ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। ঘনঘোর আকাশে চাপচাপ কালো মেঘ জমে আছে। আকাশে তারা নেই, বিদ্যুৎ চমকায় না, আকাশ যেন স্থির জগদ্দল এক বিরাট কালো পাহাড়। পল্লবের মাথার মধ্যে একটা ভোমরা যেন ঢুকে পড়ছে। সেটা ভোঁ ভোঁ শব্দে উড়ছে। তার ডানার ধ্বনিতে বাজছে, তিন হাজার পাউন্ড। তিন মাস সময়।

পল্লবের হঠাৎ মনে হল, আমার রেহাই নেই। আমাকে মরতেই হবে। আগামী তিন মাস, নব্বই দিন ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগোতে এগোতে মাঝে মাঝে গা ঝাড়া দিয়ে আমি বাঁচার চেষ্টা করব। কিন্তু নিষ্ফল, ব্যর্থ সে প্রচেষ্টা, কেউ বাঁচাতে পারবে না আমাকে।

পল্লবের এখন মনে হয় কাকবেশী মৃত্যু অদৃশ্য থেকে নজর করছে তাকে। সেই অদৃশ্য কাকের গন্ধ পল্লবের নাকে ঢোকে। পল্লব দেখে, তার হাত আর আঙুলগুলো ক্রমশ নীল, নির্জীব হয়ে যাচ্ছে। ঘুম, খাওয়া, শরীরের সব

কাজ এলোমেলো, অনিয়মিত হচ্ছে ধীরে ধীরে। একদিন সব কাজ থেমে যাবে। এর নাম মৃত্যু। মানুষ এভাবেই মরে যায়।

হাওয়ার বেগ একটু কমতে তেড়ে বৃষ্টি নামল। সামনে বাসস্টপের ঢাকা শেড। দুপাশ কাঁচে ঢাকা। শেডের তলায় গিয়ে দাঁড়াল পল্লব। খাঁ খাঁ বাসস্টপে, শেডে একজন মানুষ নেই। শেডের নিচে পল্লব একা। শহরের মানুষ টিউবে, বিশেষ করে শীতের দিনে যাতায়াত পছন্দ করে।

ছেলেবেলা থেকেই এই দুরারোগ্য অসুখে ভুগছে পল্লব। ক্লাস থ্রি বা ফোরে পড়ার সময় একবার প্রবল জ্বর, শরীরের গাঁটে গাঁটে ব্যথা, বেশ কিছুদিন শয্যাশায়ী হয়েছিল সে। বিষণ্ন, ম্লান শৈশবের সেই স্মৃতি, কত দীর্ঘ সকাল দুপুর, বিকেলের দীর্ঘশ্বাস আজও শুনতে পায় সে। বাড়ির সামনে সমবয়সী ভাই, বোন, বন্ধুরা যখন হইহই করে খেলত, বিছানাবন্দী, ব্যথায় কাতর পল্লব তখন ভাবত, আমি কবে সেরে উঠব, খেলব সকলের সঙ্গে?

দিন শেষ হয়ে পৃথিবীতে অন্ধকার নামলে নিঝুম, স্তব্ধ হয়ে যেত চারপাশ। গলা ছেড়ে পড়া মুখস্থ করত ভাইবোনরা। রুগ্ন পল্লব অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে একা শুয়ে থাকত। দৌড়ঝাঁপ, খেলাধুলো, ডানপিটেমির বদলে পল্লবের কাছে ছেলেবেলার স্মৃতি হল অসুস্থতা, কষ্ট, শুয়ে থাকা। শরীর, স্বাস্থ্যে তার দাদা, দিদি ভাই বোনরা যখন ঝলমলে, বাড়ন্ত, পল্লব তখন রোজ ফ্যাকাসে, নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছিল। একটানা এই জ্বর, ব্যথা, যার নাম রিউম্যাটিক ফিভার জখম করে দিল তার হৃৎপিণ্ড। বিছানা ছেড়ে একদিন উঠে দাঁড়ালেও ষোল আনা সুস্থ হল না সে! ডাক্তারের দেওয়া নানা বিধিনিষেধ শুনে পল্লব বুঝে গেল আর পাঁচজন সুস্থ মানুষের মত অবাধ, স্বাভাবিক জীবন তার জন্যে নয়। নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে পল্লব গুমরোতো আর ভাবত, কেন আমার এমন হল, আমার অসুস্থতার জন্যে কে দায়ী?

সেই শিশু বয়সে তার ধারণা হয়েছিল, এসব ভগবানের মারপ্যাঁচ, তাকে মেরে ফেলতে চায় ভগবান। ভগবানের বিরুদ্ধে তখনই বিষিয়ে গেল তার মন। পরে যখন সে জানল ভগবান বলে কেউ নেই, তখন তার রাগ গিয়ে পড়ল বাবা, মার ওপর। অসুস্থ ছেলেকে ভাল ডাক্তার না দেখিয়ে হাতুড়ে, বাজে

ডাক্তারের হাতে সঁপে দিয়ে বাবা, মা দায়িত্ব পালন করেনি। বরং কর্তব্যে অবহেলা করেছে। বাবা, মার বিরুদ্ধে নিঃশব্দ, চাপা রাগে সে তখন বেশ কিছুদিন ফুঁসেছে। তারপর সে রাগও একদিন মুছে গেছে তার মন থেকে। সাতটা ছেলেমেয়ে নিয়ে হিমশিম, নাকাল বাবা, মা, যে কত অসহায় ছিল, পরে বুঝতে পেরেছে পল্লব।

বিরাট মাথার নিচে ছিনে ছিনে হাত পা, রুগ্ন ফ্যাকাসে শরীরে সমবয়সী টগবগে ভাই, বোন, বন্ধুদের দেখে হিংসে হত তার। ভগবান, ডাক্তার, বাবা, মা সকলের ওপর খুব একচোট অভিমান করার পর অভিমান কমলে সে ভাবত, আমার কি করার কিছু নেই, অসুস্থ হলেই কি মানুষ অকেজো হয়ে যায় ?

সুস্থ, নীরোগ হবার জন্যে অদম্য ইচ্ছেতে ছটফট করত সে। আধুনিকতম চিকিৎসার নানা খবর যোগাড় করতে লাগল। তার একটাই জেদ, আমাকে বাঁচতে হবে। বাঁচার এই প্রবল ইচ্ছের জন্যেই বারবার অসুস্থ হয়েও দমে যায় নি পল্লব। বরং রোগে-ভোগে এ ইচ্ছে আরও বেড়ে গেছে। বাঁচা মানে যে দুঃখ, শোক, মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই, যুদ্ধ, ডুয়েল, এরকম এক উপলব্ধি হতে অসুখে সে অভ্যস্ত হয়ে গেল। শারীরিক অসুস্থতা থেকেও মজা নিংড়ে নিতে শিখল।

বেগতিক হাওয়ায় বৃষ্টির ছাট গায়ে লাগতে শরীরের হাড় পর্যন্ত টনটন করছে। কষ্টে বন্ধ হয়ে আসছে শ্বাস। আবছা অন্ধকারে ঢাকা সেই নির্জন বাসস্টপ থেকে পল্লব তবু নড়তে পারল না। এই বাতাস, বৃষ্টি, দুর্যোগে সে যাবে কি করে ? রুগ্ন ছেলেবেলার স্মৃতি তার মাথায় আবার ফিরে এল। অসুস্থতা সত্ত্বেও স্কুল পেরিয়ে কলেজে ভর্তি হল সে। লেখাপড়ার সঙ্গে ছাত্র আন্দোলনে ভিড়ে গেল। একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল তখন। রাজনীতির উত্তেজনা, তাপে অনেক কমে গেল তার অসুখ বিসুখ। পল্লব শিখল, বিস্তর জ্ঞান, শিক্ষার পরেও আজও বহু জিনিস মানুষের জানার, শেখার আছে। জ্ঞানভাণ্ডারের এক হাজারের এক ভাগও এখনও পর্যন্ত মানুষ রপ্ত করতে পারেনি। মানুষের অজ্ঞানতা তার জ্ঞানের চেয়ে বহুগুণ বেশি।

চিকিৎসার জন্যে কলকাতা শহরের অনেক খ্যাতিমান ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ হতে এ সত্য পল্লব বুঝেছিল। ধন্বন্তরি ডাক্তারও শেষ বিচারে

অসহায়। সাময়িক আরাম রোগীকে সে দিতে পারে। জীবন দিতে পারে না। কলকাতার বিখ্যাত কার্ডিওলজিস্ট, হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ এস পি রায়ের উদ্যোগে কলিন্সের সঙ্গে যোগাযোগ হল পল্লবের। ডাঃ রায়ের কাছে পল্লবের বিশ বছর যাতায়াত। পল্লবের বেপরোয়া জীবনযাপন, বাঁচার দুর্দম ইচ্ছে দেখে তার জন্যে কিছু একটা করতে চাইছিলেন ডাঃ রায়। অপারেশন করাবার পরামর্শ ডাঃ রায়ই দিলেন পল্লবকে। সে পরামর্শে পল্লব এককথায় রাজী হয়ে গেল। ডাঃ রায়ের চিঠির জবাবে কলিন্স জানালেন, অপারেশন সম্পর্কে পাকা সিদ্ধান্ত নেবার আগে রোগীকে দেখা দরকার। চেক আপের খরচ আড়াইশো পাউণ্ড সমেত রোগীকে লণ্ডনে পাঠান।

কলিন্সের চিঠি পড়ে কালো হয়ে গিয়েছিল পল্লবের মুখ। আড়াইশো পাউণ্ড মানে কমবেশী পাঁচ হাজার টাকা, যাতায়াতের ভাড়া সাত, আট হাজার টাকা, সব মিলে হাজার পনেরো টাকা লাগবে। এত টাকা আয়োজন করা সহজ নয়। তাছাড়া চেক আপ করাতে যদি পাঁচ হাজার টাকা লাগে, অপারেশনে কত লাগবে? ছাপোষা, চাকরিজীবী পল্লবের মাথায় নানা দুশ্চিন্তা ভিড় করলেও ডাঃ রায় বললেন, চলে যান, ওখানে পৌঁছলে একটা ব্যবস্থা হবে।

ডাঃ রায়ের কথায় ভরসা পেয়েই বিলেত যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়েছিল পল্লব। টাকা, পাসপোর্ট, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ছাড়পত্রের জন্যে রুগ্ন, আধমরা শরীরে দিনের পর দিন ঘুরে নেতিয়ে পড়েছিল পল্লব। রাইটার্স বিল্ডিংস, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, পাসপোর্ট অফিসের দালানে, কাউন্টার, কর্তাদের ঘরের বাইরে টুল বা বেঞ্চে বসে সে কত সকাল গড়িয়ে দুপুর, বিকেল সন্ধ্যে হয়েছে, তার ঠিক নেই। বিদেশ যাবার ব্যবস্থা করার সময়ে হাড়ে হাড়ে পল্লব বুঝেছে যে সাধারণ মানুষকে হেনস্তা, অপমান করা ছাড়া সরকারি প্রশাসন, আইনকানুনের আর কোন কাজ নেই। কোনও সরকারি দপ্তরের করিডরে একটা হুকুমনামা, কাগজের জন্যে চার, পাঁচ, ছ'ঘণ্টা একা বসে থাকার পর গ্লানি, হতাশা, আতঙ্কে ভারি হয়ে উঠত তার মন। সে ভাবত, আমি যদি এখন পাসপোর্ট অফিসার বা স্বাস্থ্য অধিকর্তার ঘরের সামনে মারা যাই, যেতেও তো পারি!

কিন্তু নাহ্, পল্লব মরল না। সরকারি সব কাগজপত্র ধুঁকতে ধুঁকতে

যোগাড় করল সে। বাইরে যাবার জন্যে যখন সে তৈরি, তখনই জরুরী অবস্থা জারী হল দেশে। শয্যাশায়ী, মুমূর্ষু পল্লবের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বেরল। ছাত্রজীবনে বাম রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকলেও অসুস্থ শরীরের জন্যে রাজনীতি থেকে কয়েকবছর আগে সরে এসেছিল পল্লব। সে সরে এলেও পুলিস, প্রশাসন তাকে ছাড়ল না। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে কৃষিমন্ত্রী জগজীবন রাম লোকসভায় একটি বিবৃতি, কেন এই জরুরী অবস্থা পড়ে শোনালেন। বিরোধী দল-গুলির নামে আইনসঙ্গত সরকারকে হিংসাত্মক পথে উচ্ছেদের অভিযোগ এনে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বললেন, এই চক্রান্ত সফল করার জন্যে জয়প্রকাশ নারায়ণ ওয়াশিংটনের সঙ্গে এবং পল্লব মজুমদার পিকিং-এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। কৃষিমন্ত্রীর লিখিত এ বিবৃতি পরদিন সব সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিল। সে বিবৃতি পড়ে থ হয়ে গিয়েছিল পল্লব। দুপুর থেকে শুরু হল নিদারুণ শ্বাসকষ্ট। খবর পেয়ে তাকে দেখতে এলেন ডাঃ রায়। পল্লবের শরীরের শোচনীয় অবস্থা দেখে তাকে সেই বিকেলে ডাক্তার হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন। রাত দুটোর সময় পল্লবকে গ্রেপ্তার করতে তার ফ্ল্যাটে পুলিস এল। অসুস্থ পল্লব হাসপাতালে, একথা বিশ্বাস করল না পুলিস। হাসপাতালে এসে পল্লবকে দেখেও পুলিসের সন্দেহ গেল না। তারা ভাবল গ্রেপ্তার এড়াতে রোগী সেজে হাসপাতালে আশ্রয় নিয়েছে। তার রোগ, অসুস্থতা বানানো, ভাঁওতা। অনেক কাটখড় পুড়িয়ে, নিজের অসুস্থতা প্রমাণ করে শেষ পর্যন্ত একদিন লণ্ডনের প্লেনে উঠল পল্লব। পায়ে হেঁটে নয়, হুইল চেয়ারে করে প্লেন পর্যন্ত পেঁছে দেওয়া হয়েছিল তাকে। হাঁটার শক্তি প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল তার।

বৃষ্টি কমার পর পায়ে হেঁটে অক্সফোর্ড স্ট্রিটে পল্লব যখন পেঁছলো, তখন তার হৃদযন্ত্রে থুড়িলাফ, গলা শুকনো, দাঁড়াতে পারছে না সে। দুর্যোগ, বাদলেও সন্ধ্যের আলো ঝলমল অক্সফোর্ড স্ট্রিটে মানুষ; খুশি, হইচই, জীবন যেন টগবগ করে ফুটছে। ভিড়ে জমজমাট রেস্টুরেন্ট, পাব। ছোট, বড় দোকান, ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলোতে থিকথিক করছে মানুষ। রাস্তার দুধারে ভিক্টোরিয়ান যুগের বিরাট বাড়িগুলোর ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে।

কোনও বাড়ির বন্ধ জানলার আলোকিত কাঁচে পর্দায় মানুষের সিলুয়েট। হিমেল হাওয়া, বৃষ্টি, শীত হার মেনেছে এখানে। খিদে মরে গেলেও এখন সব সময়ে পল্লবের গলা, বুক তেষ্টায় শুকিয়ে থাকে। এই তৃষ্ণাও ল্যাসিক্স খাওয়ার ফল। গলা ভেজাবার জন্যে সাহস করে এই প্রথম দরজা ঠেলে একটা পাবে ঢুকল পল্লব। পাবের ভেতরে গরম, সিগারেট, পারফিউমের সুবাসে ভারি হয়ে আছে বাতাস। স্টিরিওয় বাজছে গান। গমগম আওয়াজ। লম্বা, টানা উঁচু কাউণ্টারে সাজানো সারিসারি বিয়ার মাগ, হুইস্কির গ্লাস। কাউণ্টারের পেছনে পালিশ করা ঝকঝকে কাঠের সেলফে দেওয়ালের হুকে নানা চেহারার হুইস্কি, জিন, রাম, ভোদকা, শেরি, ব্র্যাণ্ডি, শ্যাম্পেনের বোতল দাঁড় করানো, ঝোলানো রয়েছে। পাবের ভেতরে হাল্কা আলোয় কাউণ্টার ঘিরে গ্লাস হাতে মানুষের জটলা। তারা গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে, গল্প করছে। সোফায়, চেয়ারে যারা বসে আছে, তাদের বেশির ভাগ তরুণ-তরুণী চাপা গলায় গল্পে তারা মশগুল। পনের দিন আগে আড়াইশো পাউণ্ড নিয়ে এদেশে আসার পর এখন পল্লবের পকেটে কুড়ি, একুশ পাউণ্ডের বেশি নেই। হার্লেস্ট্রিট ক্লিনিকে একরাত থাকার খরচ দুশো সাতাশ পাউণ্ড দিয়ে ফতুর হয়ে গেছে সে। কলিন্সের মুখে অপারেশন খরচ তিন হাজার পাউণ্ড শোনার পর পকেটের কুড়ি, একুশ পাউণ্ডের জন্যে পল্লবের আর মায়া নেই। কাউণ্টার থেকে এক পাইট ল্যাগার লাইম, এক প্যাকেট কিং-সাইজ সিগারেট আর দেশলাই কিনে পাবের এককোণে একটা চেয়ারে বসল পল্লব। মাগে চুমুক দিয়ে টক মিষ্টি ল্যাগার ঢক ঢক করে অনেকটা খেল। ঠাণ্ডা পানীয়ে গলা ভিজতে আরাম পেল সে।

দুর্বল হাতে ধরা ভারী মাগ কাঁপছে। টেবিলে মাগ নামিয়ে রাখল পল্লব। আজকাল সবসময়ে পল্লবের হাত কাঁপে। কোনও কিছু হাতে তুললে ভয় হয়, এখনই পড়ে যাবে সেটা। আশপাশের টেবিল থেকে দু-একজন চোরা চোখে পল্লবকে দেখছে। না দেখার ভান করে প্রাণবন্ত উচ্ছল নানাবয়সী মানুষদের দেখছিল পল্লব। কি অটুট, সবল স্বাস্থ্য সকলের। চওড়া বুক, সরু কোমর মোটা হাড় কব্জি, এত স্বাস্থ্য মানুষগুলো পেল কোথা থেকে? আমার কেন এ দশা হল? কী অপরাধ করেছি আমি?

তখনই পল্লবের আবার মনে পড়ল, তিন হাজার পাউণ্ড আর তিন মাস সময়ের কথা। তিন মাস মানে তিন মাস, দু-চার দিন কম বেশি হতে পারে,

কিন্তু চার বা পাঁচ মাস নয়। মিঃ লিওনার্ড কলিন্সের কথা অভ্রান্ত, অব্যর্থ, তাঁর হিসেবে কখনও ভুল হয় না। পল্লব ভাবল, তিন হাজার পাউন্ড কোথা থেকে পাব আমি ? তাহলে কি মরতে হবে আমাকে ?

মরার কথা ভাবতেই বাঁচার তীব্র তাগিদে মুচড়ে উঠল তার বুক। নাহ্, আমি মরব না, সে বিড়বিড় করল, আমাকে বাঁচতেই হবে।

ল্যাগারের মাগে চুমুক দিয়ে সাহস, আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে চাইল সে। কিন্তু ভারী নড়বড়ে, দুর্বল হয়ে যাচ্ছে মন। কলিন্সের তিন মাসের হিসেব শোনার আগে থেকেই পল্লব রোজ টের পাচ্ছিল পৃথিবীতে তার গোণাগাঁথা দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি। কালো পোশাক পরা সে গাড়ির চালক পাশেই কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে। এসব মুহূর্তে এক অচেনা আতঙ্ক, ভয় তার শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। মনে হয় অদৃশ্য কেউ এক মস্ত সিরিঞ্জ দিয়ে পৃথিবীর সব অক্সিজেন শুষে নিচ্ছে। তখন তার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট, মাছের মত খাবি খায় সে।

মাসখানেক আগে, তখনও জরুরী অবস্থা আসেনি, এক রাতের ঘটনা মনে পড়ল পল্লবের। রাত এগারটায় ঘুমের দুটো বড়ি খেয়ে দরজায় ছিটকিনি এঁটে সে বিছানায় শুয়ে ছিল। পাতলা, ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুমের মধ্যে প্রচণ্ড শ্বাসকষ্টে মাঝরাতে জেগে উঠল সে। অন্ধকার ঘর। চোখ মেলে কিছু দেখতে পেল না সে। ঘুমের ওষুধের ঘোর কেটে তখন তার কপাল, বুক বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। মাথার ওপর ফুল স্পিডে ঘোরা পাখার হাওয়া তার গায়ে লাগছে না। লাগলেও টের পাচ্ছিল না পল্লব। হৃৎপিণ্ডে দাপাদাপি, যন্ত্রণা, মাংসের ডেলাটা যেন বুক ফেটে বেরিয়ে আসবে। গলা শুকনো কাঠ, জিভ ঢুকে যাচ্ছে মুখের মধ্যে। অন্ধকার, নিঝুম সেই বন্ধ ঘরে মৃত্যু দেখতে পেল পল্লব। ঘরের বাইরে যাবার জন্যে খাট থেকে নেমে বন্ধ দরজা সে খুঁজে পেল না। দেওয়ালে দেওয়ালে মাথা ঠুকে দরজা খোঁজার সময় তার পায়ের ধাক্কায় বিছানার পাশে রাখা টিপয় উল্টে গেল। টিপয়ের ওপর থেকে ঘরের মেঝেতে পড়ে ঝনঝন করে ভেঙে গেল জলভর্তি কাঁচের গ্লাস।

পাশের ঘরে খাটে ছেলে মেয়ে নিয়ে স্ত্রী অনিতা, আর একটা ক্যাম্প খাটে মা ঘুমোচ্ছে।

ভাঙা গলায় পল্লব ডাকল, মা মাগো ?

কেউ সাড়া দিল না।

পল্লব আবার ডাকল, অনিতা, তুমি কোথায় ?

দ্বিতীয় বারেও তার গলার আবছা শব্দ কেউ শুনল না। ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে রাতে একা শুতে তাকে বারণ করেছিল ডাক্তার। কিন্তু অসুস্থতা বাড়ার পর দরজা খুলে রাখলে তার ঘুম হত না। সামান্য খুটখাট শব্দে ঘুম ছুটে যেত। আরও একবার মা, অনিতাকে ডাকতে গিয়ে পল্লব টের পেল, তার গলা বুজে গেছে, শব্দ বেরোচ্ছে না। মেঝের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ার আগেই বন্ধ দরজার বাইরে থেকে কেউ জোরে জোরে ঘা দিল।

মা বলল, পলু, দরজা খোল্।

অনিতা বলল, দরজা খোলো।

বন্ধ দরজায় দুজনের হাতের ধাক্কার শব্দ শুনে দরজা খুঁজে পেল পল্লব। ছিট কিনি খুলে বাইরে এসে দেখল আলো জ্বলছে। মা আর অনিতার মুখের দিকে একপলক তাকিয়ে খাবি খেতে খেতে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল পল্লব। অনিতা ডুকরে উঠল, মা, দেখুন, নিঃশ্বাস নিতে পারছে না ও।

সত্যি তাই। শ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে পল্লবের দু-চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। হইচই, ডাকাডাকিতে আশপাশ থেকে দু-চারজন প্রতিবেশী এসে গেল পল্লবের ফ্ল্যাটে। ফ্ল্যাটের সব আলো জ্বলছে। ধরাধরি করে বিছানায় পল্লবকে শুইয়ে দিয়ে তার মুখের সামনে একটা টেবিল ফ্যান চালিয়ে দেওয়া হল। ফ্যানের হু-হু হাওয়াতেও পল্লবের শ্বাসের সাশ্রয় হল না। একটু বাতাস, অক্সিজেনের জন্যে দু-হাতে ভর দিয়ে কুঁজো হয়ে বসে হাপরের মত সে হাঁপাতে লাগল। ডাঃ রায় কলকাতার বাইরে থাকায় আর একজন বিশেষজ্ঞ বড় ডাক্তারকে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এক প্রতিবেশী ডেকে নিয়ে এল। পল্লবের বাবা, দাদারাও এসে গিয়েছিল। পল্লবের নাকে অক্সিজেন নল গুঁজে একটা পেথিডিন ইঞ্জেকশন দিয়ে গম্ভীর মুখে ডাক্তার বলেছিল, এ রোগের কোনও চিকিৎসা নেই।

করুণ গলায় বাবা বলেছিল, দিন পনের বাদে অপারেশন করাতে ও বিলেত যাবে। সব ঠিক।

পেথিডিনের প্রভাবে মাথা দু-চোখ আচ্ছন্ন হয়ে এলেও, ডাক্তারের জবাব, পনের দিন বাঁচবে কিনা সন্দেহ, শুনতে পেল পল্লব।

ডাক্তারের কথায় ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল অনিতা।

পায়ের কাছে ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে চমকে উঠল পল্লব। কালো

লোমওলা বাঘের মত দুটো কুকুর খুব সন্দিগ্ধভাবে পল্লবকে শুঁকছে। পাবের আলোগুলো কখন আরও ফিকে হয়েছে। ভিড় বেড়েছে কাউণ্টারের সামনে। অল্পবয়সী, সুন্দরী একটা মেয়ে পছন্দের গান শোনার জন্যে যন্ত্রবক্সে পয়সা ফেলে বোতাম টিপল। ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল উদ্দাম বাজনা, গানের কলি, ওহ্, ফ্যাটি বুমবুম, ড্রিংক এ্যা লিটল শ্যামপেন।
বিংগো বাক্সে পয়সা ফেলে জুয়ো খেলছে কয়েকজন। বাক্সের ভেতরে বাইরে মাঝে মাঝে ঝরে পড়ছে খুচরো পয়সার ঝনঝন ধ্বনি। মাগের তলানি লাগার এক চুমুকে খেযে দ্বিতীয পাঁইট কিনতে পল্লব কাউণ্টারে গিয়ে দাঁড়াল। নিজের চেয়ারে ফিরে মাগে চুমুক দিয়ে কুড়িটা সিগারেটের না খোলা প্যাকেটের দিকে পল্লব তাকাল। সিগারেট খাওয়া নিষেধ। প্যাকেট কিনেও তাই এতক্ষণ ফেলে রেখেছিল পল্লব। ছোঁয়নি। ধীরে ধীরে এক বেপরোয়া অভিমান, ক্ষোভ তার বুকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। প্যাকেট খুলে একটা সিগারেট ধরালো সে। তিন চার টান দিয়ে মনে মনে বলল, আর তিনমাস, নব্বই দিন আয়ু, কোন সিগারেট খাব না? পকেটের বিশ, বাইশ পাউণ্ড আর বাকি নব্বই দিন নিজের খুশিমত আমি ফুঁকে দেব।
গান, বাজনা, কথায় পাব সরগরম। লোমশ, কালো কুকুর দুটো আবছা আলোয় টেবিলে টেবিলে ঘুরছে। কলকাতা ছাড়ার দিনটা মনে পড়ল পল্লবের। অনেক যোগাযোগ, তদ্বিরের পর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বাতিল হল। এ কঠিন কাজে খুব সাহায্য করেছেন ডাঃ রায়। মন্ত্রী, পুলিস মহলে চেনা জানার সুবাদে অসাধ্য সাধন করেছিলেন ডাঃ রায়, প্লেন ভাড়া চিকিৎসার খরচ বাবা, দাদারা দিয়েছিল। দুপুরের ফ্লাইটে প্লেন। এক আত্মীয়ের গাড়িতে সকাল দশটায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল পল্লব। টলটলে ঘন নীল আকাশ। অল্প শীত পড়েছে। ফাঁকা ভি আই পি রোড। গাড়ি ছুটেছে এয়ারপোর্টের দিকে। রাস্তার দুপাশে মাটি, ঝোপ, গাছপালায় চেনা গন্ধ, ছোট ছোট নয়ানজুলিতে কচুরিপানা, শালুক, শাপলা। এইসব পরিচিত ছবি, শহর, মা, বৌ, ছেলেমেয়ে, আত্মীয় বন্ধুদের ছেড়ে একটু পরেই ছ-হাজার মাইল দূরে এক অচেনা দেশে চলে যেতে হবে তাকে। তারপর হৃৎপিণ্ডে ছুরি, কাঁচি, অস্ত্রোপচার, কাটাকুটি, বাঁচা, মরা, বাড়ি ফেরা, না ফেরা, কী ঘটবে, কেউ জানে না। সামান্য অন্যমনস্ক, মনমরা হতেই নিজেকে ঝাঁকিয়ে চাঙ্গা করতে চাইল পল্লব। পাশে থমথমে মুখ অনিতার

কানে মুখ লাগিয়ে পল্লব বলল, দুশ্চিন্তা করো না, আমি ঠিক সেরে উঠব, বেঁচে থাকব।

পল্লবের কথা শুনে দু-চোখ ভিজে উঠতে চাইলেও চোখের জল সামলে স্থির হয়ে বসে ছিল অনিতা। কী ঘটছে বুঝতে না পেরে আট বছরের ছেলে বুবাই পল্লবের কাঁধে ঠেস দিয়ে গাইছিল, জননী গো লহ তুলি বক্ষে। বাবার অসুখ, বিদেশ যাওয়া, সব দুঃখ, দুর্যোগ অগ্রাহ্য করে নিজের আনন্দে সে মশগুল। বাবা, মা, বাড়ির প্রায় সকলে, বিমানবন্দরে পল্লবের আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। মুখে আঁচল চেপে মা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। মা বোধহয় বুঝেছিল, ছেলে ফিরবে না। বাবার মুখ শুকনো, ভাই-বোনরা গম্ভীর, খরখরে ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে সহজ, স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছিল পল্লব। কিছু সাহসী কথা মুখে এলেও সবুজ রানওয়ের দিকে তাকিয়ে সে বসে থাকল, বলতে পারল না। দেড়বছরের মেয়ে ফুলির কথা তখন ভাবছিল পল্লব। মেয়েটা ভীষণ ন্যাওটা হয়েছে পল্লবের। বাবাকে প্লেনে উঠতে দেখে ফুলি চেঁচামেচি, কান্না জুড়বে ভেবে তাকে বাড়িতে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছে অনিতা। বাড়ি থেকে বেরোবার আগে ঘুমন্ত মেয়ের দিকে তাকিয়ে এক সেকেন্ড থমকে দাঁড়িয়েছিল পল্লব।

অনিতার মামাতো বোন জয়ার শাশুড়ি, থপথপে, মোটা শরীর মনোরমা পালিত, হাতে বড় পুঁটলি, হন্তদন্ত হয়ে এয়ারপোর্টে এসেছিল। পুঁটলিতে একটা রসগোল্লার টিন আর দু-কেজি ভাজা ইলিশ। বিলেতে, ছেলে বিনয়কে এই মাছ, মিষ্টি মনোরমা পাঠাতে চায়। বিনয়, জয়া অনেক বছর বিলেতে। দু-চার বছর ছাড়া কলকাতায় আসে। পাকাপাকি দেশে ফেরার খুব ইচ্ছে থাকলেও সুযোগ পাচ্ছে না। সোফার ওপর পল্লবের পাশে পুঁটলি রেখে মনোরমা বলেছিল, এটা কিন্তু বিনুকে পৌঁছে দিতে হবে বাবা। ইলিশ মাছ ভাজা আর রসগোল্লা খেতে ছেলেটা যে কি ভালবাসে।

পুঁটলির আকার, ওজন দেখে পল্লবের বাবা, দাদা খুব বিরক্ত হয়েছিল। রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়েছিল অনিতা। এ পুঁটলি প্লেনের লাগেজ রুমে যাবে না, অসুস্থ পল্লবকে নিজের কাছে রাখতে হবে। হুইল চেয়ারে প্লেনে উঠে ছ-হাজার মাইল দূরে যে মানুষ চিকিৎসায় যাচ্ছে, তার ঘাড়ে মনোরমা কোন আক্কেলে এ বোঝা চাপায়, অনিতা বুঝতে পারল না। কিন্তু জয়ার

শাশুড়িকে মুখে কিছু বলল না অনিতা। অসুস্থ স্বামীর দরকারে, তার পাশে চোদ্দ বছর বিলেতবাসী বিনয় হয়ত দাঁড়াবে, এ আশাতেই বোধহয় চুপ করে ছিল সে। টার্মিনাল ভবন থেকে হুইল চেয়ার চেপে প্লেনে ওঠার আগে বুবাই এর কাঁধে হাত রাখল পল্লব। সাংঘাতিক সে স্পর্শ। হাসি, গান ভুলে মুহূর্তে বুবাই বুঝে গেল, তাকে ছেড়ে অনেক দূরে বাবা চলে যাচ্ছে। দু-হাতে পল্লবের হাতটা আঁকড়ে ধরে বুবাই বলল, তোমার সঙ্গে আমিও যাব।

তারপর ভেঙে পড়ল কান্নায়। ব্যথায় ছলছল বুক পল্লবের অনেক কথা বলার ছিল ছেলেকে। বলা হল না। চেয়ার তখন ঠেলা খেয়ে পিচের রাস্তায় এগিয়ে যাচ্ছে প্লেনের দিকে।

ল্যাগার লাইমেও নেশা হয়। পল্লবের অসুস্থ, কমজোরী শরীরও নেশায় আচ্ছন্ন হচ্ছিল। বড় মনোরম, আরামদায়ক, কষ্টহীন এ আচ্ছন্নতা। পাবের বিশাল লাউঞ্জের চার দেওয়ালে লাল, সবুজ, নীল, হলুদ আলোর ছোট, বড় অসংখ্য বিন্দু পাক খাচ্ছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে পল্লব সোজা হয়ে বসল চেয়ারে। যে গানটা যুগবক্সে বাজছে, একটু মন দিয়ে শুনতে গানের কিছু কথা বুঝতে পারল সে। কথাগুলো ভারী সুন্দর। পৃথিবী যখন তরুণ ছিল, রূপকথার মত ছিল প্রতিটি দিন, খুশি, আনন্দে স্বপ্নাতুর সে দিনগুলো আমাকে ফিরিয়ে দাও।

গায়িকার সুরেলা, জোরালো গলা। গানে ডুবে থেকেও গত পনের দিনের কথা ভাবছিল পল্লব। দু হপ্তা আগে লন্ডনে এসে পেঁছলেও আজ প্রথম কলিন্সের সঙ্গে পল্লবের দেখা হল। দুপুর বারটায় কলকাতা থেকে প্লেনে উঠে ষোল ঘণ্টা পরে স্থানীয় সময় রাত পোনে এগারটায় লন্ডনের হিথরো এয়ারপোর্টে পেঁছল সে। ইকনমি ক্লাসের টিকিট কিনে দাদার বন্ধু স্টুয়ার্ট দত্তের সঙ্গে প্লেনে ওঠার সময়ে হঠাৎ দেখা হতে ফার্স্ট ক্লাসে বসার জায়গা পেয়েছিল পল্লব। অসুস্থ পল্লবের জন্যে এ ব্যবস্থা দত্ত করেছিল। প্লেনে ফার্স্ট ক্লাস মানে এলাহি ব্যাপার। বিনি পয়সায় যত খুশি খাবার, পানীয় ফার্স্ট ক্লাসের একজন যাত্রী পেতে পারে। পল্লবের

চোখের সামনে কিছু যাত্রী ষোল ঘণ্টা একনাগাড়ে আপেল, চিজ, ভেড়ার মাংসের রোস্ট, আইসক্রিম ওয়াইন, হুইস্কি, ব্রান্ডি, কফি আবার আপেল, চিজ থেকে শুরু করে যা যা খেয়েছিল, খেয়ে গেল। পল্লবের সিটের ডানপাশে একটা বড় হটপ্লেটে ছাল ছাড়ানো আধখানা, সেদ্ধ ভেড়া মাখনে ভাজা হচ্ছিল। ভুরভুর করে সুবাস ঢুকছিল তার নাকে। কিন্তু তার মুখে স্বাদ পেটে, খিদে নেই। বরং খাবার দেখে গা বমি করছিল তার। ষোল ঘণ্টার আকাশপথে দু-বোতল কোকাকোলা ছাড়া আর কিছু খায়নি পল্লব। তার যাওয়ার খবর, ফ্লাইট নম্বর জানিয়ে কলকাতা থেকে চারদিন আগে কলিন্সকে টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছিল। হিথরো বিমানবন্দরে প্লেন থেকে আবার চাকা লাগানো চেয়ারে তুলে তাকে বাইরে আনা হল। মাথায় বেগুনী আলো ঝকঝকে ক্রিম-রঙা একটা অ্যাম্বুলেন্স অপেক্ষা করছিল তার জন্যে। পল্লবকে দেখে অ্যাম্বুলেন্সের দরজা খুলে অল্পবয়সী ফুটফুটে সুন্দরী এক নার্স মিষ্টি হেসে বলল, হ্যালো।

ধপধপে সাদা পোশাক পরা নার্সের দিকে ক্লান্ত চোখে একপলক তাকিয়ে অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে ঢুকল পল্লব। অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরটা ছোটখাট হাসপাতাল, হিটার, বেসিন, নানা যন্ত্রপাতি, দুধসাদা, নিভাঁজ চাদর পাতা বিছানা এবং আরও কিছু আয়োজন, যা পল্লবের দেখা নেই। পল্লবকে সযত্নে বিছানাতে শুইয়ে দিল নার্স। অ্যাম্বুলেন্স চলতে শুরু করার পর, তার রক্তচাপ, গায়ের তাপ, নাড়ির গতি মেপে একটা নোটবুকে মেয়েটি লিখে রাখল। অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরটা বেশ গরম। নরম আবছা হাসি লেগে ছিল মেয়েটির মুখে। পল্লবকে যে হার্লেস্ট্রিট ক্লিনিকে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে, সে কথা মেয়েটি জানাল। অ্যাম্বুলেন্সের জানলার কাঁচের ওপাশে আলো ঝলমল রাতের নির্জন লণ্ডন শহর, বন্ধ দোকানপাট, দু-একজন পথ-চলতি মানুষ, বৃষ্টি, কুয়াশায় ভেজা কালো পিচ-রাস্তা সরে যাচ্ছে। ক্লান্তি, অবসাদে শরীর ভারী হয়ে থাকলেও অচেনা শহরটার দিকে অবাক চোখে তাকিয়েছিল পল্লব। প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে প্রাসাদের মত বিরাট লাল রঙ একটা বাড়ি, গেটে লেখা হার্লেস্ট্রিট ক্লিনিক-এর সামনে অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়াল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সাদা উর্দি পরা দুই বাহক বিছানাসমেত পল্লবকে গাড়ির বাইরে নিয়ে আসতে পল্লব বুঝল, বিছানার ওপরটা আসলে

স্ট্রেচার। অ্যাম্বুলেন্স থেকে পল্লবকে বার করার আগে তার গলা পর্যন্ত নরম, লাল কম্বলে ঢেকে দিয়েছিল তরুণী নার্স। বাহকদের পায়ের চাপে ক্লিনিকের বন্ধ কাঁচের দরজা নিঃশব্দে দুপাশে সরে গেল। সামনে বড় ছড়ানো লাউঞ্জ, অনেক আলো, মাঝখানে ঝুলছে একটা রাজকীয় ঝাড়লণ্ঠন। লাউঞ্জের বাঁদিকে রিসেপশন, টেলিফোন বোর্ড, ডানদিকে অ্যাকাউণ্ট অফিস। সেণ্ট্রাল হিটিং ক্লিনিকে গরম জামা লাগে না। ক্লিনিকে ঢুকে বেশ গরম লাগতে বুক থেকে কম্বল নিচে নামিয়ে দিয়েছিল পল্লব। পরীর মত সাদা পোশাকে সুন্দরী দু-তিনজন নার্স স্ট্রেচারের দুপাশ দিয়ে চলে গেল। দুই বাহক লাউঞ্জে স্ট্রেচার নামাতে পল্লব নেমে পড়েছিল স্ট্রেচার থেকে। স্ট্রেচারে শুয়ে বিছানায় যেতে সে রাজি নয়। লম্বা করিডোর ধরে কিছুটা এগিয়ে বাঁদিকে অটোমেটিক লিফ্‌ট। দরজা খোলা লিফটের খাঁচায় আলো জ্বলছে। লিফটে ঢুকে পল্লব দেখল উল্টোদিকে একটা ঘর। ঘরের ভেতর হাল্কা আলো। দরজার মাথায় পেতলের হরফে লেখা ক্লিনিক পাব। লিফ্‌ট চালু হতে পাবের মৃদু আলোতে ভেতরে বসা ড্রেসিং গাউন পরা কয়েকজনকে দেখে, তারা যে ক্লিনিকের রোগী, বুঝতে পল্লবের অসুবিধে হল না।

পল্লবকে তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে, আলোর সুইচ, টয়লেট, কলিং বেল দেখিয়ে নার্স প্রশ্ন করল, রাতে কী খাবে ?

খিদে নেই, পল্লব বলল।

গুড নাইট বলে ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল নার্স।

উজ্জ্বল আলোয় ঘর দেখে পল্লব হতবাক, বিহ্বল। ঘরজোড়া পুরু, নরম, দামী কার্পেট, সাদা চাদর ঢাকা গদি মোড়া বিছানায় দুজন শুতে পারে, ওয়ারড্রোব, রঙিন টিভি, বিছানায় চ্যানেল মিউজিকের ওয়াকম্যান। বিছানার পাশে ট্রলিতে জলের ফ্লাস্ক, গ্লাস, লাল টুকটুকে টেলিফোন। এমন সুসজ্জিত ঘর আগে দেখেনি পল্লব। অজানা ভয়ে কেন যেন গুড়গুড় করে উঠল তার বুক। কেন এই ভয়, উদ্বেগ পল্লব বুঝতে পারল না। বোঝার শক্তিও ছিল না তার। দুর্বল, ক্লান্ত শরীর বিছানায় লুটিয়ে পড়তে চাইছিল। নিঃশ্বাস বন্ধ করা কণ্ট, চাপ জমাট বাঁধছিল বুকে। দু-পা টলমল করছে। ঘুমিয়ে পড়তে চাইছিল সে। পল্লবের সুটকেস, হাতব্যাগ ঘরে পৌঁছে দিয়ে, তার দিকে একবারও না তাকিয়ে দশাসই চেহারা, গম্ভীর

মুখ আফ্রিকান পোর্টার ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলে চলে গেল। হাত-ব্যাগে পল্লবের তোয়ালে দাঁত মাজার ব্রাশ, পেস্ট, চিরুনি, কিছু ওষুধের সঙ্গে রসগোল্লা আর ইলিশ মাছ আছে। সুটকেস খুলে পাজামা, পাঞ্জাবি পরার সময়ে বাড়িঘরের গন্ধ পেল সে।

ঘুমের দুটো বড়ি খেয়ে পল্লব যখন শোয়ার জন্যে তৈরি, ঘরে ঢুকল বছর ত্রিশ বয়স এক ইংরেজ ডাক্তার। পল্লবকে স্টেথো দিয়ে পরীক্ষা করে, রক্তচাপ মেপে ডাক্তার বলল, কাল সকাল থেকে তোমার মূল চিকিৎসা শুরু হবে।

মিঃ কলিন্সের কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও পল্লব থেমে গেল। কথা বলার ইচ্ছে, ক্ষমতা ছিল না তার। নিটোল, লম্বা ঘুমে ডুবে যেতে চাইছিল সে। আলো নিভিয়ে নরম বিছানার কম্বলের তলায় ঢুকে কিছু সময় চোখ বুজে শুয়ে থাকার পর তার মনে হল, মনোহরপুকুরে নিজের ফ্ল্যাটে সে শুয়ে আছে। অন্ধকার বিছানায় অনিতার চুড়ির ঠুং-ঠাং শাড়ির খসখস মোলায়েম ধ্বনি সে শুনতে পাচ্ছিল। পল্লবের মনে হচ্ছিল, অন্ধকারে বুবাই-এর গলা, কথা, বাবা, তোমার হাতটা আমার পিঠে দাও, শুনতে পাচ্ছে সে।

পালকের নরম গদির বিছানার আরামেও ঘুম আসছিল না পল্লবের। উসখুস অস্বস্তি, দুর্ভাবনায় আবছা ঘুম বারবার কেটে যাচ্ছিল। কলিন্স যে একজন অভিজ্ঞ, চৌখস সার্জেন, পৃথিবী সেরাদের একজন, তাঁর চিকিৎসা পেলে যে একজন রোগী নিরাপদ, নির্ভয়, এ খবর ডাঃ রায়ের মুখে অনেক-বার পল্লব শুনেছে। কলিন্সের কৃতিত্ব, দক্ষতার কথা শুনে শুনে তাঁর ওপরে অগাধ বিশ্বাস, আস্থা পল্লবের মনে গড়ে উঠেছে। তবু দুশ্চিন্তা, সন্দেহ, তাকে পরীক্ষা করে কলিন্স কী বলবেন, ভেবে অস্থির হচ্ছিল পল্লব। প্রাথমিক পরীক্ষার পর মিঃ কলিন্স যদি তাকে অপারেশন করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন কী হবে? রোগ নির্ণয়ের জন্যে যেখানে আড়াইশো পাউণ্ড লাগে, সেখানে অপারেশন খরচ কী হতে পারে, চিন্তা করতে ভয় পেল পল্লব। দুশ্চিন্তা এড়াতে পল্লব ভাবল, তাকে পরীক্ষার পর কলিন্স নিশ্চয়ই অপারেশন করার কথা বলবেন না। দু-চারটে ইঞ্জেকশন, মামুলি কিছু ওষুধ দিয়ে তাকে সুস্থ করে তুলবেন কলিন্স। রোগ নিরাময়ের চিন্তা, ঘুমের ওষুধের প্রভাবে আচ্ছন্ন পল্লব বিছানায় অসাড় শুয়ে থাকল। কখন যে রাত শেষ, ভোর শুরু পল্লব টের পায়নি। কানের কাছে ফিস ফিস,

মেয়েলি গলা শুনে চোখ খুলে পল্লব দেখল তার মাথার কাছে থার্মোমিটার হাতে হাসিমুখে রাতের সেই নার্স দাঁড়িয়ে আছে। আলো জ্বলছে ঘরে। পল্লব চোখ খুলতে নার্স বলল, গুড মর্নিং।

মুখে থার্মোমিটার পল্লব দেখল, সারা রাত কাজের পরেও তরুণী মেয়েটি একটু ম্লান হয়নি। রাত বারটায় যেমন সতেজ, সুন্দরী ছিল, ভোররাতেও তাই।

টেম্পারেচার নিয়ে নার্স ঘর থেকে চলে যাবার পরের ঘটনাগুলো খুব তাড়াতাড়ি ঘটে গিয়েছিল। দাঁত মেজে, মুখ হাত ধুয়ে পেটভরে ইংলিশ ব্রেকফাস্ট খেয়ে পল্লব বিছানায় শুতেই হাতে একটুকরো কাগজ নিয়ে ঘরে ঢুকল নীল স্কার্ট ব্লাউজ পরা মাঝবয়সী এক ভদ্রমহিলা। কাগজটা পল্লবকে দিয়ে নীল স্কার্ট বলল, আমি ক্লিনিকের অ্যাকাউন্ট্যান্ট, মিসেস স্নো।

স্নোর কথা শুনে কাগজে এক পলক চোখ বুলিয়ে পল্লবের মাথা ঘুরে গেল। কাগজটা ক্লিনিকের পাওনা দুশো সাতাশ পাউন্ডের একটা বিল। বিলে কারো নাম নেই দেখে পল্লব ভেবেছিল, এ বিল ভুল করে তার কাছে এসে গেছে। মুখে কিছু না বলে দ্বিতীয়বার বিলের দিকে তাকিয়ে, বিলের তলায় মিঃ পি মজুমদার, রুম নম্বর তিনশো বারো লেখা দেখে ধড়াস করে উঠল তার বুক। এ যে তারই বিল, ভুল নেই। অশান্তি, আতঙ্কে হাত কাঁপলেও পল্লব বিলটা পড়ছিল। অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া সমেত ক্লিনিকে এক রাত থাকার খরচ দুশো সাতাশ পাউন্ড ছাড়া ক্লিনিকের কশান মানি, জমানত, আরও সাতশো পাউন্ড, মোট ন'শো সাতাশ পাউন্ড এখনি তাকে দিতে হবে। কাগজে টাইপ করা হরফ, সংখ্যার দিকে তাকিয়ে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল তার দৃষ্টি। তার জ্যাকেটের পকেটে আড়াইশো পাউন্ডের ট্রাভেলার্স চেক, কলকাতা বিমানবন্দরে পাওয়া সাড়ে তিন পাউন্ড, সাকুল্যে দুশো তিপান্ন পাউন্ড পঞ্চাশ পেনি আছে। নশো সাতাশ পাউন্ড সে দেবে কোথা থেকে?

তার দিকে তাকিয়ে স্নো দাঁড়িয়ে আছে জেনেও ঘাড় তুলতে পারছিল না পল্লব। স্নো বলল, চিকিৎসার পর জমা সাতশো পাউন্ডের যা বাঁচবে, তুমি ফেরত পাবে। সেরকম বড় একটা হয় না বরং বাড়তি খরচ দিতে হয়। ভয়ে নেতিয়ে পড়েছিল পল্লব। অসহায় গলায় সে বলল, মিঃ কলিন্স

চিঠিতে আড়াইশো পাউণ্ড আনতে বলেছিলেন আমাকে। আমি তাই এনেছি। আড়াইশো পাউণ্ডের বেশি আমার কাছে নেই।

অসুস্থ পল্লবের গলার মিনমিনে আওয়াজ, অশুদ্ধ ইংরেজী উচ্চারণ বুঝতে মিসেস স্নোর সময় লাগল। বেশ কয়েকবারের চেষ্টায় পল্লব নিজের কথাগুলো স্নোকে বোঝাতে পারল। প্রথমে অবাক, তারপর একটু ভয় পেয়ে স্নো প্রশ্ন করল, মিঃ কলিন্সের চিঠিটা কোথায় ?

সুটকেস থেকে বার করে পল্লব চিঠিটা স্নোর হাতে দিতে একঝলক চিঠিতে চোখ বুলিয়ে চিঠি নিয়ে ঝড়ের গতিতে মহিলা চলে গেল। মিনিট পাঁচ বাদে ফাইল হাতে গোলগাল সমবয়সী এক মহিলাকে নিয়ে স্নো ফিরে এল। উত্তেজনা অথবা ধকলে দুজনেই হাঁপাচ্ছিল। ফাইল হাতে ভদ্রমহিলা পল্লবের বিছানার কাছে এসে বলল, গুড মর্নিং, আমি মিসেস হেওয়ার্থ, মিঃ কলিন্সের সেক্রেটারি। এ মুহূর্তে মিঃ কলিন্স ওয়াশিংটনে, ফিরবেন আগামী হপ্তায়। মিঃ কলিন্স লণ্ডন ছেড়ে যাওয়ার পর তোমার টেলিগ্রাম আসায় একটা গোলমাল হয়ে গেছে। টেলিগ্রাম পেয়ে এখানে একটা কেবিন আমি রিজার্ভ করেছিলাম। তোমাকে মিঃ কলিন্সের লেখা আড়াইশো পাউণ্ডের চিঠি তাঁর ফাইলে নেই। চিঠিটা ফাইলে থাকলে এ ঝামেলা হত না।

বাইরে একটা কাক ডাকছিল। ডাক শুনে কুচকুচে কালো সাক্ষাৎ মৃত্যুকে পলকের জন্যে দেখতে পেয়েছিল পল্লব। মিসেস হেওয়ার্থ, মিসেস স্নোর সব কথা পল্লবের কানে ঢুকছিল না। ঢুকলেও তাদের ইংরেজী উচ্চারণ ঠিকঠাক বুঝতে পারছিল না সে। বিপন্ন চোখে দুই বিদেশিনীর দিকে চুপচাপ তাকিয়েছিল পল্লব। হেওয়ার্থ বলল, আগামী হপ্তায় মিঃ কলিন্স ফিরবেন। লণ্ডনে নিশ্চয়ই তোমার বন্ধু আছে। তার কাছে সাতদিন তুমি থাক। ঠিকানা, ফোন নাম্বার এখানে রেখে যাও। মিঃ কলিন্স ফিরলে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব আমি।

এক সেকেণ্ড পল্লবকে নজর করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল দুজন। পল্লবের মাথা ভোঁ-ভোঁ করছিল। পাথর হয়ে গিয়েছিল সে। মিনিট পাঁচ পরে পল্লবের ঘরে একা ঢুকল স্নো। কোনও ভনিতা না করে স্নো বলল, মিসেস হেওয়ার্থের সঙ্গে আশা করি কথা হয়েছে তোমার। সাতশো পাউণ্ড জমা তোমাকে রাখতে হবে না। একদিনের পাওনা দিলেই চলবে।

এক মুহূর্ত চুপ থেকে স্নো বলল, বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত এ ঘরে থাকতে পার তুমি।

সরাসরি ঘাড়ে হাত না দিলেও তাকে যে গলাধাক্কা দিয়ে ক্লিনিক থেকে তাড়ানো হচ্ছে, পল্লব বুঝেছিল। লজ্জায়, অপমানে চুপসে ট্রাভেলার্স চেক সই করে দুশো সাতাশ পাউণ্ড সে তুলে দিয়েছিল স্নোর হাতে।

থ্যাঙ্ক য়ু, বলে স্নো চলে যাবার পর হালকা, পলকা ট্রাভেলার্স চেক বই হাতে গুম হয়ে বসে থাকল পল্লব। চিন্তার ক্ষমতাও লোপ পেয়েছিল। পুরো ঘটনা খতিয়ে বুঝে হতাশায় ভেঙে পড়েছিল। পকেটে মাত্র সাড়ে ছাব্বিশ পাউণ্ড নিয়ে কোথায় যাবে, থাকবে, ভেবে পেল না সে। ওয়ারড্রোব খুলে জ্যাকেটের পকেট থেকে লণ্ডনের গুটিকয় নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার লেখা ডায়েরী বার করে প্রথমে বিনয়কে তার অফিসে ফোন করেছিল পল্লব। তার ভাগ্য ভাল, ফোন ধরল বিনয় নিজে। বিনয়কে ক্লিনিকের নাম, ঠিকানা দিয়ে তার মায়ের পাঠানো রসগোল্লা, ইলিশের কথা বলেছিল পল্লব। মাছ, মিষ্টির খবরে, পল্লবের মনে হল, বিনয় আগ্রহ দেখাল না। শুধু বলল, বিকেলে যাচ্ছি আমি।

লণ্ডনে চেনাজানা দু-একজন থাকলেও নিকট আত্মীয়, ঘনিষ্ঠ বন্ধু, পল্লবের কেউ নেই। পরিচিত দুজনকে লণ্ডনে যাবার খবর কলকাতা থেকে চিঠিতে জানিয়েছিল পল্লব। চিঠি লেখার সময়ে টিকিট, ভিসা পাকা না হওয়ায় বিশদ জানাতে পারেনি। কলকাতায় এক পাঞ্জাবী বন্ধু গুরুমিতের বাড়িতে তার কাকা লণ্ডনবাসী সুন্দরলালের সঙ্গে পাঁচ ছ-বছর আগে পল্লবের আলাপ হয়েছিল। লণ্ডন থেকে এক মাসের জন্যে স্বদেশে বেড়াতে এসেছিল সুন্দর-লাল। কলকাতায় ছিল চারদিন। বামপন্থী বন্ধু পল্লবের সঙ্গে বামপন্থায় বিশ্বাসী কাকার যোগাযোগ করে দিয়েছিল গুরুমিত। ত্রিশ বছরের পল্লবের সঙ্গে পঞ্চান্ন বছরের সুন্দরলাল দুদিন কলকাতায় নানা জায়গায় ঘুরেছিল। দুদিন একসঙ্গে বেড়ানোর সময়ে পল্লবের সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক বহু বিষয়ে আলোচনা করেছিল সুন্দরলাল। দেশে, বিদেশের বিভিন্ন জটিল প্রশ্নে একমত হয়েছিল দুজনে। দৃষ্টিভঙ্গির মিলের জন্যেই দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা, বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তেলেঙ্গানা আন্দোলনের সময়ে সুন্দরলাল যে সেখানে ছিল এবং তারপর পুলিসের তাড়ায় দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়, গল্পগুজবে সে খবরও পল্লব জেনেছিল।

কলকাতা ছাড়ার আগে গিয়র্গ লুকাচের লেখা হিস্টরি অ্যান্ড ক্লাস স্ট্রাগল নামে বিখ্যাত বইটা সুন্দরলাল উপহার দিয়েছিল পল্লবকে। বই এর মলাটের পরের পাতায় ইংরেজীতে লিখেছিল, প্রিয় কমরেড পল্লবকে।
লেখাটা, বিশেষ করে কমরেড শব্দটা পড়ে অভিভূত হয়েছিল পল্লব। সুন্দর-লাল লণ্ডনে ফেরার পরে তার সঙ্গে এক দেড় বছর চিঠিতে যোগাযোগ রেখে-ছিল পল্লব। কিন্তু এয়ার লেটারের যা দাম, পল্লব এঁটে উঠতে পারেনি। নাম্বার ঘুরিয়ে ফোনে সুন্দরলালকে পেয়ে পল্লব পরিচয় দিতে ষাট, বাষট্টি বছরের মানুষটা চিনতে পারল। হার্লে স্ট্রিট ক্লিনিকের নাম শুনে সুন্দর-লাল যে অবাক হয়েছে, বুঝতে পল্লবের অসুবিধে হল না। তারপর এক-রাতের খরচ দুশো সাতাশ পাউণ্ড দিতে হয়েছে শুনে উত্তেজনায় সুন্দরলাল বলল, ওরা ডাকাত, মাফিয়া। আরব তেলওলাদের ঘাঁটি ওই ক্লিনিক।
রাগী গলায় আরও কিছু ঝাঁঝালো মন্তব্য করে সুন্দরলাল বলেছিল, বিকেলে আমি যাচ্ছি।
দু-হাতে মাথা রেখে সারা দুপুর অনাথ, অসহায়, নিঃসঙ্গ পল্লব ঘরে বসে-ছিল। শরীর, মন অসাড়, ভোঁতা, বিস্বাদ মুখ। দুপুরের লাঞ্চও সে খেল না। তার সাহস, বিশ্বাস কয়েক ঘণ্টার জন্যে যেন উবে গিয়েছিল।
দু-পাঁইট ল্যাগার লাইম নিয়ে পাবে যে দেড়ঘণ্টা কেটে গেছে ঘড়ি না দেখেও পল্লব আন্দাজ করতে পারে। রাত যত বাড়ছে, হাসি খুশি, মজায় তত উচ্ছল হচ্ছে পাবের ভিড়। পাবে আসা, যাওয়াও চলছে সমানে। জীবনে যে এত সুখ; আনন্দ, স্বাস্থ্যবান, উজ্জ্বল এই মানুষদের না দেখলে পল্লব জানত না। পল্লব শুধু দেখে, দেখতে থাকে। চেয়ার ছেড়ে তার উঠতে ইচ্ছে করে না। তখনই তার মনে পড়ে তিন হাজার পাউণ্ড আর তিন মাস সময়ের কথা : পল্লব নিঃশব্দে নিজেকে প্রশ্ন করে, তিন মাস পরে এখানে কি আবার আসতে পারব?
কথাটা ভেবে তার বুকের পরতে পরতে কাঁপুনি জাগে।

চার বছরের মেয়ে টুকাইকে নিয়ে সেদিন বিকেল হতেই বিনয়, জয়া হাজির হয়েছিল হার্লে স্ট্রিট ক্লিনিকে। অনিতার সমবয়সী মামাতো বোন জয়া। কলকাতায় বিনয়, জয়ার সঙ্গে কয়েকবার অল্পসময়ের জন্যে দেখা, কথা হলেও

কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়নি পল্লবের। চটপটে, হাসিখুশি মেয়ে জয়া। কথা একটু বেশি বলে। বিনয় অল্পভাষী, গম্ভীর, আত্মকেন্দ্রিক, সরল প্রকৃতির মানুষ। বছরে এক বা দুবার অনিতার সঙ্গে জয়ার চিঠি চালাচালি হয়। তবু ছ-হাজার মাইল দূরে, এই বিদেশে তিন আত্মীয়কে দেখে ভারি আরাম বোধ করল পল্লব।

মুখে, চোখে হাসি ছড়িয়ে ঘরে ঢুকেছিল জয়া। মুখে হাসি না থাকলেও বিনয় ছিল স্বাভাবিক, শান্ত। কিন্তু এক লহমায় পল্লবের শরীর, স্বাস্থ্য দেখে গম্ভীর হয়ে গেল বিনয়। স্বামীর থমথমে মুখ দেখে জয়ার হাসি মিলিয়ে গিয়েছিল। পল্লব বুঝেছিল সব। তার মত আধমরা, মুমূর্ষু আত্মীয়কে নিজের বাড়িতে তুলতে ভয় পাচ্ছে বিনয়। চার বছরের টুকাই অবাক চোখে পল্লবকে দেখছিল। পল্লবের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে থাকলেও ভরসা পাচ্ছিল না।

কয়েক সেকেন্ডের নীরবতার পর বিনয় প্রশ্ন করল, কেমন আছেন এখন?

কিছু না বলে হাসার চেষ্টা করল পল্লব।

জয়া প্রশ্ন করল, কলকাতার সকলের খবর কী?

ঠিক কার খবর জয়া জানতে চাইছে বুঝতে না পেরে পল্লব বলল, ভাল।

কথা যেন ফুরিয়ে আসছিল। কিন্তু আসল কথা, পল্লবকে নিজেদের বাড়িতে থাকার অনুরোধ বিনয়, জয়া, কেউ করল না। পল্লব ভাবছিল, কথাটা ওরা বলবে, এখনই না বললেও একটু পরে নিশ্চয়ই বলবে। তখনই সাবলীল ভঙ্গিতে দরজার ভারী পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকল সুন্দরলাল। সুন্দর-লালের মুখে স্মিত হাসি, দু-চোখে ঝকঝকে প্রসন্ন দৃষ্টি। ঘরে ঢুকে এক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে পল্লবের কাছে এগিয়ে এসে তার দু-কাঁধে দু-হাত রাখল সুন্দরলাল। আলতো চাপ দিয়ে প্রশ্ন করল, হ্যালো ইয়ং ম্যান, কেমন আছো?

কী জবাব দেবে ভেবে না পেয়ে সুন্দরলালের দিকে কাতর চোখে তাকিয়ে ছিল পল্লব। ঘরের আবহাওয়া, পল্লবের চোখের কাতরতা থেকে কিছু আঁচ করে প্রথমেই সুন্দরলাল বলেছিল, আমার বাড়িতে তোমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। তুমি তৈরি হলে ট্যাক্সি ডাকবো।

সুন্দরলালের কথা শুনে জল এসে গিয়েছিল পল্লবের দু-চোখে। ভাঙা গলায় সে বলল, আমি তৈরি।

ফাইন্।

কথাটা বলে ট্যাক্সি ডাকার জন্যে সুন্দরলাল ঘর থেকে বেরোবার আগেই চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে জয়া বলল, সে কী, পল্লব এখন কিছুদিন আমাদের বাড়িতে থাকবে। ওর জন্যে ঘর সাজিয়ে রেখেছি আমি।

হাসি মুখে ঘাড় ঝাঁকিয়ে সুন্দরলাল বলল, ও কে, ঠিক আছে।

পল্লবের বিছানার কাছে চেয়ার টেনে বসে তার দু-হাত ধরে সুন্দরলাল বলল, আমরা থাকতে এদেশে তোমার কোন অসুবিধে হবে না।

সুন্দরলালের আশ্বাস, অভয় পেয়ে পল্লবের মনে হল পৃথিবীতে বেঁচে থাকার চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর নেই। ক্লিনিক থেকে বার করে দেওয়ার অপমান, লাঞ্ছনা ভুলে চাঙ্গা হয়ে উঠল সে।

জয়া আবার একতরফা কথা বলছিল, আমার ধারণা, পল্লবের কোন অসুখ নেই, অপারেশনের দরকার হবে না। কলকাতার হাতুড়ে ডাক্তাররা ভয় পেয়ে অকারণে বিলেতে পাঠিয়ে দিয়েছে ওকে। এসে অবশ্য ভালোই করেছে। এ দেশের খাঁটি দুধ, মাখন, চিজ, ডিম, মাংস খেয়ে শরীর সারিয়ে নিতে পারবে।

হাসিমুখে সুন্দরলাল শুনছিল জয়ার কথা। জয়া বলছিল, পল্লবের চেহারা দেখে আমার মনে হচ্ছে ওর আসল রোগ, ম্যালনিউট্রিশন, অপুষ্টি।

বিশেষজ্ঞর মত গড়গড় করে মতামত দিচ্ছিল জয়া। তার সব কানে না গেলেও কথার টুকরো পল্লব শুনতে পাচ্ছিল। তার মনে হচ্ছিল, জয়ার কথাই ঠিক। সে নীরোগ, সুস্থ। কিন্তু অনাহার, অপুষ্টি তার হওয়ার কথা নয়। ঠিকানা না লেখা লেফাফার মত মুখে বসে ছিল বিনয়।

শেষ বিকেলে একটা ট্যাক্সিতে পূর্বলণ্ডনের ইস্টহ্যামে বিনয়ের বাড়িতে চলে এল পল্লব। বিনয়ের বাড়ি পর্যন্ত সংগী হয়েছিল সুন্দরলাল। ট্যাক্সিতে বসে বিনয়কে সুন্দরলাল বলল, ক্লিনিকে যখন আপনার নাম, ঠিকানা টেলিফোন নাম্বার দেওয়া রইল, তখন মিঃ কলিন্স যোগাযোগ না করা পর্যন্ত আপনার বাড়িতেই পল্লবকে থাকতে হবে। তারপর কলিন্সের সঙ্গে দেখা

হলে, তিনি কী বলেন শুনে আমার বাড়িতে থাকতে পারে পল্লব।

বিনয় বলল, ঠিক আছে।

আমি রোজ ফোন করব একবার।

কথাটা বলে পল্লবের পিঠে হাত রেখে সুন্দরলাল যোগ করল, কোনও দরকার হলে ফোন করো আমাকে। সারাদিন বাড়ি থাকি আমি।

সুন্দরলাল সারাদিন বাড়ি থাকে শুনে এক সেকেণ্ড তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়েছিল জয়া।

বাড়ি ফিরে দোতলার গেস্টরুমে, যেখানে পল্লবের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে, দেখিয়ে দিল জয়া। দরজা, জানলায় পর্দা, মেঝে কার্পেট, গদিআঁটা বড় বিছানা, সুন্দর ঘর। সাজানো ঘর দেখে খুশি হয়েছিল পল্লব। সন্ধ্যে সাতটায় রাতের খাবার খেতে বসল চারজন। মায়ের পাঠানো ইলিশ মাছ ফুড্ পয়জনের ভয়ে বিনয় স্পর্শ করল না। জয়াকেও খেতে দিল না। রসগোল্লার টিন কেটে, জয়াকে দুটো, টুকাইকে একটা দিয়ে বাকি সব বিনয় একা খেল। দুটো রসগোল্লা বিনয় দিতে গেলে পল্লব বলেছিল, মিষ্টি আমি খাই না।

দ্বিতীয়বার অনুরোধ করেনি বিনয়। ঠিক তেরো দিন পরে বিনয়ের বাড়িতে মিসেস হেওয়ার্থ ফোন করে পল্লবকে বলল, কাল বিকেল সাড়ে চারটেয় মিঃ কলিন্স উইমপোল স্ট্রিটের সার্জারিতে তোমাকে দেখবেন।

কলিন্সের সার্জারির ঠিকানা কলকাতা থেকেই জানা ছিল পল্লবের। হেওয়ার্থের কাছ থেকে ফোনে পথের হদিস জেনে নিল সে। বিশেষ কিছু না বুঝেই এক টুকরো কাগজে যা শুনলো, লিখে নিল। তেরো দিন অধীর প্রতীক্ষার পর ডাক্তারের ডাক পেয়ে পল্লব বর্তে গেল। তার মনে হল, এবার আমি সুস্থ হয়ে উঠবো।

একটানা তেরো দিন বিনয়ের বাড়িতে বসে থেকে অধৈর্য, ক্লান্ত হচ্ছিল পল্লব। ক্লিনিকের ঘটনা শুনে ক্ষুব্ধ মিঃ কলিন্স হয়ত চিকিৎসা করবেন না, এমন সন্দেহ, আতঙ্ক জমছিল তার মনে। সবচেয়ে বেশি ভয় পল্লব পেয়েছিল, ওষুধের শিশিগুলো দেখে। কলকাতা থেকে আনা ওষুধ খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে আসছে। ওষুধ ফুরোলে যে কী হবে, ভাবতে পারে না পল্লব।

ফুরোবার আগে অবশ্য জানানো যায় সুন্দরলালকে। কিন্তু লজ্জা, সঙ্কোচ কাটিয়ে ওষুধ শেষ হওয়ার কথা সুন্দরলালকে পল্লব বলতে পারতো কিনা সন্দেহ। কথাটা জয়াকেও বলতে চায়নি পল্লব। আরও এক ভয়ানক আশঙ্কা তার মনের মধ্যে কাজ করছিল। লন্ডনে আসার পর গত তেরো দিনে কলকাতার মত গুরুতর অসুস্থ সে একবারও হয়নি। কিন্তু আরও বড় বিপর্যয়ের সঙ্কেত দিচ্ছিল শরীর। এবার শুলে যে আর উঠতে হবে না, ধরতে অসুবিধে হয়নি পল্লবের। সব মিলে শরীর, মন নাজেহাল, নাকাল। রোজ ফোন করে খবর নিচ্ছিল সুন্দরলাল।

দুর্যোগ, বৃষ্টি, শীতে কাঁপতে কাঁপতে তেরোদিনে ইস্টহ্যামে তিনবার এসে সে দেখে গেল পল্লবকে। নানা কথার ফাঁকে পল্লবের দরকারগুলোও জানতে চেয়েছিল সুন্দরলাল। মুখ ফুটে পল্লব কিছু বলতে পারেনি। শুধু কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়েছিল তার মন।

ইস্টহ্যামে বিনয়ের বাড়িতে আসার তিন, চারদিন পর থেকে, যাকে বলে ইংলিশ উইন্টার, বাঘ তাড়ানো বিলিতি শীত, মেঘ, বৃষ্টি, তুষার, বাতাসে মাখামাখি শুরু হল। কলিন্সের নীরবতা আর প্রকৃতির চেহারা দেখে পল্লবের মনে হয়েছিল, শেষবারের মত মুখ থুবড়ে পড়ার আর দেরি নেই। আতঙ্কে যখন তার চোখের তলায় গভীর কালি, বুকে পাথরের চাপ, তখনই হেওয়ার্থের কাছ থেকে সুসংবাদ এল। কলিন্সকে নিয়ে অবান্তর এলোমেলো চিন্তা করার জন্যে নিজেকে অপরাধী লাগল পল্লবের।

হতাশা, ক্লান্তি, একঘেয়েমি সত্ত্বেও গত তেরোদিনে কাছ থেকে খুঁটিয়ে জয়া বিনয়ের জীবন, সংসার দেখে তাদের জন্যে করুণা বোধ করেছে পল্লব। দম দেওয়া যন্ত্রের মত সকাল ছ'টায় বিনয় যখন অফিসে যায়, পৃথিবী অন্ধকার। সন্ধ্যে সাড়ে পাঁচটা, ছ-টায় যখন সে বাড়ি ফেরে, তখনও আকাশে ছিটেফোঁটা আলো নেই। রাস্তার আলো জ্বলে ওঠে।

জয়া চাকরি করে না। বাড়িতে থাকে। মেয়ে দেখে, সংসার সামলায়। এতো আরাম, সুখের জীবনেও সে সবসময় ব্যাজার, বিরক্ত। নানা কাজের ছলছুতোয় নিজেকে ব্যস্ত রাখতে সে ভালবাসে। দরজা, জানলা বন্ধ ড্রইং-রুমে গনগনে ফায়ার প্লেসের পাশে বসে গত তেরোদিনে জীবনের এক অচেনা নকশা খুঁজে পেল পল্লব। ড্রইংরুমে মাঝে মাঝে জয়া এসে বসেছে। কথা

বলেছে একটানা, অনর্গল। কথা বলতে আজকাল কষ্ট হয় বলে পল্লব শুধু শুনেছে।

সন্ধ্যেবেলায় খাবার টেবিলে বিনয়কে জয়া বলল, মিঃ কলিন্স কাল পল্লবকে ডেকেছেন।

ভাতের প্লেট থেকে মুখ তুলে পল্লবকে বিনয় প্রশ্ন করল, একা যেতে পারবেন?

পারবো।

পল্লবের জবাব শুনে এক মুহূর্ত ভেবে বিনয় বলল, কাল আমার অফিস তা নাহলে।

বিনয়কে কথা শেষ করতে না দিয়ে পল্লব বলল, আপনি একদম ভাববেন না।

রাত আটটায় বিনয়, জয়ার সঙ্গে ড্রইংরুমের সোফায় বসে পল্লব যখন টিভি দেখছে, দরজার বেল বাজল। জয়া দরজা খুলতে একঝলক দমকা হাড় কাঁপানো বাতাসের সঙ্গে কারা যেন ঢুকল। জয়া বলল, আসুন।

আধ ভেজানো ড্রইংরুমের দরজা খুলে জয়ার সঙ্গে ভেতরে ঢুকল অসীম রায়। তার স্ত্রী স্নিগ্ধা। আর ন-বছরের মেয়ে মিলি। অসীম এ পাড়ার লোক, বিনয়ের প্রতিবেশী এবং বন্ধু। তার বৌ স্নিগ্ধার সঙ্গে জয়ার খুব ভাব। গত তেরো দিনে এই পরিবারের কথা বেশ কয়েকবার জয়ার মুখে শুনেছে পল্লব। পুরো পরিবারকে এই প্রথম সে দেখল। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স অসীমের। একহারা লম্বা চেহারা। কথা, চালচলনে সপ্রতিভ, স্মার্ট। তীক্ষ্ন চিবুক, গভীর টানা চোখ স্নিগ্ধা রীতিমত সুন্দরী। তাদের মেয়ে মিলি যেন একটা ডলপুতুল, দেখলে আদর করতে ইচ্ছে হয়।

পল্লবের সঙ্গে আলাপ হওয়ার কিছু পরে অসীম বলল, মিঃ কলিন্সের সার্জারিতে কাল আমি পেঁছে দেব আপনাকে।

কুণ্ঠায় পল্লব বলল, একাই যেতে পারব আমি।

মুচকি হেসে অসীম বলল, তা পারেন। তবে কাল বিকেলে রিজেন্ট স্ট্রিটে কাজ আছে আমার। উইমপোল স্ট্রিটের পাশ দিয়ে যেতে হবে আমাকে।

আপনি সঙ্গে গেলে আমার অসুবিধে নেই। তবে ফেরার সময় একা আসতে হবে আপনাকে।

পল্লব আর কথা বাড়ালো না। এক সেকেন্ড চুপ থেকে অসীম প্রশ্ন করল, আপনার অসুখটা কী?

রোগের পাঁচালি বহুবার বহু লোককে শুনিয়ে অশক্ত ক্লান্ত হয়েও আবার বলতে হল পল্লবকে। কাহিনী শুনে, তার চেনাজানা কজন এ রোগে ভুগছে, এবং ভুগেও তারা যে কী দাপটে বেঁচে আছে, সে গল্প অসীম শোনালো পল্লবকে। রোগে, দুর্ভাবনায় বিধ্বস্ত পল্লবকে বোধহয় সাহস, শক্তি যোগাতে চাইল অসীম। অসীমের গল্প বলার মজলিসী, মজাদার ভঙ্গিতে বিনয়, জয়া খুব হাসছিল। সবচেয়ে বেশি হাসছিল স্নিগ্ধা। তার ফর্সা মুখ, কান লালচে দেখাচ্ছিল। অন্যদের সঙ্গে তাল দিয়ে হাসতে পারছিল না পল্লব। তার মুখে ঝুলে ছিল নিষ্প্রভ, শুকনো হাসি। অসুস্থ শরীরে নিজেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ ভেবে সুস্থদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাসতে তার বিবেকে বাধছিল। উচ্ছল, সপ্রাণ এই আসরে বসে অপরাধী মনে হচ্ছিল নিজেকে।

মিনিট পঁয়তাল্লিশ পরে হাতঘড়িতে সময় দেখে সোফা ছেড়ে ধড়ফড় করে উঠে ব্যস্ত গলায় স্নিগ্ধা বলল, ইস, ভীষণ দেরি হয়ে গেল। বাড়িতে জিমি বেচারী একা।

মাকে দাঁড়াতে দেখে লম্বা সোফার এককোণে গুম হয়ে বসে থাকা মিলি লাফ দিয়ে দরজার কাছে দাঁড়াল। টুকাইকে ঘুমোতে দেখে বাড়ি ফেরার জন্যে এতক্ষণ উসখুস করছিল মিলি। মায়ের সংকেত পেয়ে সে আর দেরি করতে রাজি নয়। সেণ্টার টেবিলে রাখা গাড়ির চাবি তুলে মেয়ে, বৌয়ের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল অসীম।

রাস্তা পর্যন্ত অতিথিদের পেঁছে দিয়ে ঘরে ফিরে জয়া বলেছিল, জিমি জিমি করেই মিসেস রায় গেল। কুকুর নিয়ে এত আদিখ্যেতা আমার ভাল লাগে না।

বিকেল ঠিক চারটেতে বিনয়ের বাড়ি থেকে পল্লবকে গাড়িতে তুলে সাড়ে চারটে বাজার কয়েক মিনিট আগেই কলিন্সের সার্জারিতে পেঁছে দিয়েছিল

অসীম। চোদ্দ দিনে আজ লণ্ডন শহর তৃতীয়বার দেখল পল্লব। গাড়ির কাঁচে চোখ রেখে শহরের রাস্তা, গাড়ি, দোকান বাজার, মানুষ, জাঁকজমক দেখে পল্লব তাজ্জব বনে গেল। গা ছমছম করছিল তার। অসীম না থাকলে মিঃ কলিন্সের সার্জারি হয়ত সে খুঁজে পেত না। ইস্টহ্যাম থেকে উইমপোল স্ট্রিট প্রায় দশ মাইল। কলিন্সের সার্জারির সামনে গাড়ি থেকে পল্লব নামার আগে কীভাবে সে ইস্টহ্যাম ফিরবে, বুঝিয়ে দিয়েছিল অসীম। তবু সে চলে যেতে দীর্ঘ দশ মাইল একা ফেরার কথা ভেবে মুষড়ে পড়ল পল্লব।

পাবের লম্বা কাউণ্টার জুড়ে, ছড়ানো লাউঞ্জে গিজগিজ করছে মানুষ। পোড়া, টুকরো সিগারেটে ভরে গেছে পল্লবের সামনে রাখা অ্যাসট্রে। পল্লবের দু-আঙুলে জ্বলছে নতুন সিগারেট। জ্বলন্ত সিগারেটের সঙ্গে তিন হাজার পাউণ্ড আর তিন মাসের চিন্তা ফুঁকে দিতে চায় সে।

কলিন্সের মুখে তিন হাজার পাউণ্ড আর তিন মাসের কথা শুনে বোবা হয়ে গিয়েছিল পল্লব। ফাঁসির হুকুম হওয়া আসামীর মত সে তাকিয়েছিল কলিন্সের মুখের দিকে। তার ফেঁসে যাওয়া হৃৎপিণ্ডে ড্রাম বাজছিল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সে বলেছিল, আড়াইশো পাউণ্ড নিয়ে আমি এসেছিলাম। দুশো সাতাশ পাউণ্ড ক্লিনিকে খরচ হওয়ার পর এখন আমার পকেটে বিশ, একুশ পাউণ্ড আছে। তিন হাজার পাউণ্ড কোথা থেকে পাব আমি?

পল্লবের কথা শুনে অল্পক্ষণ নীরব থেকে কলিন্স বলেছিলেন, চেক আপে আড়াইশো পাউণ্ড খরচের পর অপারেশন করাতে পাঁচ হাজার পাউণ্ড তোমার লাগত। আমার পারিশ্রমিক দু-হাজার পাউণ্ড আমি ছেড়ে দিলাম। কিন্তু হাসপাতালের খরচ তিন হাজার পাউণ্ড তোমাকে দিতে হবে। হাসপাতাল পাওনা মকুব করবে না।

আমি ছাপোষা, সাধারণ মানুষ। এ টাকা যোগাড় করার ক্ষমতা আমার নেই।

পল্লবের কথা শুনে কলিন্স বললেন, আমার কিছু করার নেই। দুঃখিত।

কী বলবে, পল্লব ভেবে পেল না। তার ফাঁকা মাথায় একটা কথা নেই। তার মুখ দেখে বোধহয় সহানুভূতি হয়েছিল কলিন্সের। তিনি বললেন, এদেশে চিকিৎসার কিছু আইনকানুন আছে। এখানকার যারা নাগরিক,

পুরনো আবাসিক, শুধু তারাই বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পায়। তাদেরও হাসপাতালে যেতে হলে জি পি মানে সরকারি ডাক্তারের অনুমোদন লাগে। নিজের তালিকাভুক্ত রোগী ছাড়া বাইরের কেউ জি পি-র অনুমোদন পায় না। তুমি বিদেশী। কোনও জি পি-র তালিকায় নাম নেই তোমার। তবে যদি কোনও জি পি ধরে।

আরও কিছু বলতে গিয়ে থেমে গিয়েছিলেন কলিন্স। কলিন্স থামলেও বাঁচার জন্যে যে একজন জি পি-র সাহায্য দরকার, পল্লব বুঝেছিল। নব্বই দিনের মধ্যে একজন জি পি ধরে তার খাতায় নাম তুলতে পারলে, সে বাঁচবে। তা না হলে মরতে হবে তাকে। কিন্তু কীভাবে জি পি-র রোগীর তালিকায় নিজের নাম ঢোকাবে সে? জি পি-র খাতায় নাম তুলতে হলে হেলথ ইনসিওরেন্সের কার্ড দেখাতে হয়। এদেশে যারা থাকে, কাজ করে, ট্যাক্স দেয় অথবা যারা ছাত্র, শুধু তাদের ইনসিওর কার্ড আছে। পল্লব এখানকার নাগরিক, আবাসিক বা ছাত্র নয়। ট্যাক্স দেয় না সে। নিখরচায় চিকিৎসার সুযোগ তাই সে পাবে না।

গত তেরো দিনে কয়েকবার বিনয়, সুন্দরলালের কথা, আলোচনা শুনে পল্লব এসব জেনেছে। গল্পের ছলেই এ বিষয়ে সুন্দরলাল, বিনয় আলোচনা করত। টুকটাক মন্তব্য ছুঁড়ে দিত জয়া। আলোচনায় নীরব শ্রোতার ভূমিকায় থাকত পল্লব। আজ থেকে তার ভূমিকা বদলে গেল। সে শুধু নীরব শ্রোতা নয়। বাঁচার জন্যে জি পি ধরার জাল তাকেও ফেলতে হবে। তিন নম্বর পাইটে শেষ চুমুক দিয়ে পল্লব বিড়বিড় করল, জনদরদী, সহৃদয় একজন জি পি, নিশ্চয় আমি খুঁজে পাব। পৃথিবী এখনও শুকিয়ে ঝামা হয়ে যায়নি।

খেতে বসে অন্যদিনের মত গম্ভীর গলায় বিনয় প্রশ্ন করল, জি পি পেলেন?

সুন্দরলাল চেষ্টা করছে।

পল্লবের কথা শুনে খুকখুক করে হাসল বিনয়। বিনয়ের হাসিতে আহত, ব্যথিত হল পল্লব। আর কথা বলল না সে। একটু আগে ড্রাইভিং টেস্ট দেওয়ার জন্যে জয়া বেরিয়ে গেছে। পরপর চারবার গাড়ি চালানোর পরীক্ষায়

ফেল করে এই পঞ্চমবারে পাস করবে ভেবে সকাল থেকে উত্তেজিত হয়ে ছিল জয়া। খাবার ঘরের ডান কোণে নিচু চেয়ার টেবিলে আলাদা খেতে বসেছে টুকাই। কিছুই সে খাচ্ছে না। কাঁটা, ছুরি হাতে চিকেন স্টু পাউরুটি নিয়ে সে খেলা করছে। মেয়ের দিকে কড়া চোখে দু-একবার তাকিয়েও খাওয়ায় ব্যস্ত বিনয় কিছু বলল না। খাওয়া শেষ করে, পল্লব জানে, বিনয় ঝাঁপিয়ে পড়বে মেয়ের ওপরে। ঝাঁপিয়ে পড়া মানে মারধোর, শাস্তি নয়; মেয়েকে খাওয়াতে নানা কসরৎ করবে বিনয়। জয়া থাকলে সেও করত। টুকাইকে খাওয়াতে জয়া যখন হিমশিম খায়, তখন বিরক্ত গলায় বিনয় বলে ছেড়ে দাও, আর খাওয়াতে হবে না ওকে।

আবার বিনয় যখন মেয়েকে খাওয়াতে হইচই জুড়ে দেয়, তখন জয়া বলে, আর চেঁচিও না। দু-একদিন উপোস করলে মেয়ে মরে যাবে না।

জয়ার কথা শুনে বিনয় তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। তারপর স্বামী-স্ত্রীতে তুমুল ঝগড়া লেগে যায়। গত তেরো দিনে এ ছবি কয়েকবার দেখেছে পল্লব। কিন্তু এ মুহূর্তে তার মাথায় বাজছে বিনয়ের খুকখুক হাসি। বিনয় কেন হাসল? কী ভাবছে সে?

কলিন্সের কাছ থেকে ফিরে পরদিন সন্ধ্যেতে তিন হাজার পাউন্ডের কথা বিনয়কে বললেও তিন মাস সময়ের কথাটা পল্লব চেপে গিয়েছিল। তিন হাজার পাউন্ড খরচ শুনে আঁতকে উঠেছিল বিনয়। বিলেতে যারা থাকে, তিন হাজার পাউন্ড যে তাদের কাছেও কম নয়, পল্লব টের পেয়েছিল। টাকার অঙ্ক শুনে বিনয়ের প্রতিক্রিয়া দেখে তিন মাস পরমায়ুর কথা পল্লব আর বলেনি। তিন হাজার পাউন্ডের খবর শুনে বিনয়ের যা দশা, বাকিটা শুনলে হয়ত সে ভিরমি খাবে। তিন মাসের কথা সুন্দরলালকেও পল্লব বলেনি। তিন মাসের বেশি পল্লব বাঁচবে না শুনলে বিনয়, জয়া ভয় পেত। জ্যান্ত পল্লবকে মরা মানুষ ভেবে শুকিয়ে থাকত তাদের মুখ। এখানকার প্রতিবেশী, বন্ধু, এমনকি কলকাতায় অনিতাকেও জানিয়ে দিত খবরটা। রুগ্ন শরীরেও বিচারবুদ্ধি বাঁচিয়ে রেখেছে পল্লব। নিজের বিপদ, সংকটের কথা সে কখনো কাউকে বলেনি, বলতে চায় না। সুখের ভাগ পাঁচজনকে দিলেও দুঃখ, শোক একা সহ্য করেছে। এ নিয়মেই পল্লব অভ্যস্ত। কলিন্সের কাছ থেকে ফিরে টাকা ও সময় নিয়ে অনেক ভেবে পল্লব বুঝেছে যে তিন হাজার পাউন্ড যোগাড়ের মরীচিকার পেছনে না দৌড়ে একজন জি পি ধরা

অনেক সহজ। কেন যে একথা তার মনে হল সে জানে না। বোধহয় মানুষের ওপর বিশ্বাস থেকেই সহৃদয় এক জি পি পাওয়ার বিশ্বাস তার মনে তৈরী হয়েছে। যে কোনও কঠিন সমস্যার মূলে সে পেঁছিতে পারে। জীবন, মৃত্যুর সাঁকোয় দাঁড়িয়ে সমস্যার শেকড়, মূলে পেঁছিতে পল্লবের অসুবিধে হল না। চিকিৎসার সমস্যা সরল করে তিন মাসের মধ্যে একজন জি পি-র কাছে সে পেঁছিতে চাইল। তিন হাজার পাউণ্ডের কথা শুনে বিচলিত বিনয়কে শান্ত করতে পল্লব বলেছিল, একজন জি পি-র সঙ্গে যোগাযোগ হলে টাকার সমস্যা মিটে যায়।

পল্লবের কথাটা মনে ধরেছিল বিনয়ের। বলা যায়, পল্লবের দেওয়া জি পি খোঁজার টোপ বিনয় গিলেছিল। জি পি পাওয়া যে খুব কঠিন হবে না, এ ধারণা বিনয়ের হয়েছিল। জয়া বলেছিল, আমাদের অঞ্জলিদি, মানে ডাঃ অঞ্জলি ব্যানার্জি একজন জি পি। অঞ্জলিদি ব্রিক্সটনে থাকে। প্রায়ই আসে এখানে।

বিনয়, বলেছিল, শুধু অঞ্জলিদি কেন, আমার চেনা আরও কয়েকজন জি পি আছে।

বিনয়, জয়ার কথা শুনে তিন হাজার পাউণ্ডের আতংক যে তাদের কেটেছে, পল্লব বুঝেছিল। জীবনের বাকি তিন মাসের কথা তখন একটু ঘুরিয়ে নরম করে পল্লব বলেছিল, তাড়াতাড়ি একজন জি পি চাই।

তার কথায় সায় দিয়ে জয়া বলেছিল, সে তো বটেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

বিনয় চুপ করে থাকলেও তাড়াতাড়ি একজন জি পি-র কাছে পল্লবকে নিয়ে যাওয়ার কথা সে ভাবছিল। তিন হাজার পাউণ্ড তিন মাসে যোগাড় করার দুঃসাধ্য দায়িত্বকে তাড়াতাড়ি একজন জি পি খোঁজার সরল, নিরীহ কর্মসূচীতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল পল্লব। সে কর্মসূচীতে, পল্লব যা চেয়েছিল বিপদ বা মৃত্যুর মত কোনও গন্ধ, আভাস ছিল না। বিনয়, জয়া অন্তত সেরকম কিছু পায়নি। শরীর, মনের ভাঙন, কষ্ট, দ্রুত ফুরিয়ে যাওয়ার সব লক্ষণ টের পেয়েও বিনয়, জয়া এবং তাদের সংসারে দুশ্চিন্তা, দুর্যোগের আঁচ যাতে না লাগে, সে বিষয়ে সতর্ক ছিল পল্লব। নিজেকে নিংড়ে চারপাশ স্বাভাবিক রাখতে প্রচণ্ড ধকল, চাপ পড়ছিল তার ওপর। আসন্ন,

অনিবার্য মৃত্যু ভারি উদার করে দিয়েছিল তাকে। ব্যক্তিগত অশান্তি, চাপ সে গায়ে মাখল না।

খাওয়া প্রায় শেষ হতে বিনয় বলল, কাল অফিসে যাচ্ছি না আমি। ছুটি নিয়েছি। রমুলেতে আমার বন্ধু ডাক্তার সমীর মজুমদারের কাছে কাল যাব। সমীর একজন জি পি। ভারতীয় ডাক্তার অ্যাসোসিয়েশনের সে সেক্রেটারি। আমার বিশ্বাস, সমীর একটা ব্যবস্থা করতে পারবে।

সুন্দরলাল জি পি যোগাড় করতে পারেনি শুনে কেন সমীর খুক খুক করে হেসেছিল, বুঝতে পারল পল্লব। ব্যর্থ সুন্দরলালের পাশে বিনয় নিজের সফলতার তৃপ্তি, অহমিকার সুড়সুড়িতে বিনয় হেসেছিল। বিনয়ের হাসিতে পল্লবের মনে যে অভিমান, ক্ষোভ জমেছিল, তা মজে গেল। কৃতজ্ঞতায় মুগ্ধ পল্লব তাকিয়ে থাকল বিনয়ের দিকে। বিনয় আর কোন কথা বলল না। বাঁচার সোনালী দিগন্ত আবার চোখের সামনে ঝলমলিয়ে উঠতে লাগল নতুন প্রেরণায়, যেন নীরোগ বেঁচে থাকার রোমাঞ্চে খাবার টেবিলে স্থির বসে থাকল পল্লব।

কলিন্সকে দেখানোর পর সুন্দরলালের বাড়িতে যাওয়ার কথা থাকলেও পল্লব যায় নি। বাড়ি বদলের শ্রম, অনিশ্চয়তা তার অসুস্থ শরীর সহ্য করতে পারছে না, পল্লব বুঝেছিল। তাছাড়া অল্পভাষী, আত্মকেন্দ্রিক বিনয়ের কথা শুনে পল্লবের মনে হয়েছিল, বিনয়ের চেনা জি পিরা হয়ত কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারে। পল্লবের বিশ্বাস মিলে গেছে। বিনয়ের কথায় পল্লব বুঝেছে যে ডাক্তার সমীর মজুমদারের রোগীর ফর্দে তার নাম ঢোকাতে বিনয়ের অসুবিধে হবে না। থৈথৈ আশা, আনন্দে পল্লবের হতাশা, বিষাদ কেটে গেল।

গত তিন, চার দিন পল্লব ভেবেছে, জীবনে এমন সংকট, বিপন্নতা আসে, যখন মানুষের কিছু করার থাকে না। তার ইচ্ছে, অনিচ্ছে, প্রয়াস উদ্যম বিফল হয়ে যায়। এ ক'দিন শুধু নিয়তি, অদৃষ্টের কথা ভেবেছে সে। একটা দিন শেষ হলেই সে হিসেব করতো আর উননব্বই দিন, আটানব্বই দিন, সাতানব্বই, ছিয়ানব্বই, পঁচানব্বই দিন বাকি। রোজ, প্রতি মুহূর্তে উল্টো গণনা, ব্যাকওয়ার্ড কাউন্টিং করেছে সে। দিন কমে যাচ্ছে, তিন হাজার

প্যাউণ্ডের খরচ কমছে না, একজন জিপি পাওয়া যাচ্ছে না। মৃত্যুর দিকে লম্বা পায়ে হেঁটে চলেছে সে। এগিয়ে যেতে বাধা হচ্ছে। বিনয়ের ড্রইংরুমে ফায়ার প্লেসের পাশে বসে টেলিভিশনের রঙিন ছবির দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দ কান্নায় গুমরে উঠে গত এক হপ্তা সে শুধু ভেবেছে, কেন আমি বাঁচতে চাই? আমার জীবন কি খুব দামী, আমার বেঁচে থাকা কি খুব জরুরী? শুধু বসার ঘরে কেন, দু'তিনটে ঘুমের বড়ি খেয়ে রাতে অন্ধকার বিছানায় শুয়ে নানা প্রশ্ন, দুশ্চিন্তায় ছটফট করেছে সে। অন্ধকার ঘরে বিছানায় উঠেছে, বসেছে, আলো জেলেছে, নিভিয়েছে, বাথরুমে গেছে, ফিরে এসেছে, ঘড়িতে একটা, দুটো, তিনটে বাজার ঘণ্টা শুনেছে, ঘুমোতে পারেনি। শেষ রাতে দু-তিন ঘণ্টা পাতলা, ছেঁড়া ঘুম, দুঃস্বপ্ন, বুকচাপা, দমবন্ধ অস্বস্তিতে চমকে জেগে উঠে শুনেছে বাইরে কাকের ডাক, কুচকুচে কালো সাক্ষাৎ মৃত্যু তার জন্যে-ওত পেতে আছে।

বিনয়ের আশ্বাস পেয়ে পল্লবের মনে হল অনেক দিন পরে আজ রাতে আরামে ঘুমোবে সে। খাওয়া শেষ করে টুকাইকে নিয়ে পড়েছে বিনয়। কাঁটায় মাংসের টুকরো বিঁধে টুকাই-এর মুখে গুঁজে দিচ্ছে নরম, কড়া, অনেক কথা বলছে বিনয়। চার বছরের আদুরে টুকাই বাবা, মার দুর্বলতা জানে। ঠোঁট টিপে নানা ফ্যাচাং করছে সে।

ঝড়ের গতিতে ঘরে ঢুকে জয়া ডুকরে উঠল, হল না, আজও ফেল।

হতাশায়, রাগে বিধ্বস্ত, আলুথালু দেখাচ্ছে জয়াকে। তার কথা বিনয়ের কানে গেল না। গেলেও মেয়েকে খাওয়াতে নাজেহাল বিনয় জয়ার দিকে চোখ তুলল না। রাগে ফোঁস ফোঁস করতে করতে টিভি-র ঘরে গিয়ে বসল জয়া। সেখানে এসে পল্লবও সোফায় শরীর ছেড়ে দিল। টিভিতে ল্যাটিন আমেরিকার একটা ছবি দেখানো হচ্ছে। টিভির শব্দ বন্ধ করে রেকর্ড প্লেয়ারে রবীন্দ্রসঙ্গীত চালিয়ে-দিয়েছে জয়া। নীরব টিভি, সশব্দ প্লেয়ার গায়ে গায়ে চালু রয়েছে। বাদামী রঙের পাহাড়, ঢেউখেলানো উপত্যকার দৃশ্য। পাহাড়ের আড়াল থেকে শত্রুদের লক্ষ্য করে কাউবয় নায়ক স্টেনগান চালাচ্ছে। শব্দহীন স্টেনগান, বাজছে রবীন্দ্রসঙ্গীত, আমার মিলন লাগি তুমি আসছো কবে থেকে।

নৃশংস, নিষ্ঠুর শত্রুরা ঘিরে ধরেছে নায়ককে, তার স্টেনগানে গুলি শেষ, বেপরোয়া, সাহসী নায়ক দাঁতটিপে ঝোলাঝুলি হাতড়ে বারুদ খুঁজছে।

তখনই উদ্ধতযৌবন, রূপসী নায়িকা তেজী ঘোড়ার পিঠে চেপে ছুটে এক উপত্যকায়, প্লেয়ারে রবীন্দ্রসঙ্গীত, মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, রোজ দেখা কেন পাই না।

জয়ার কোলের ওপর ড্রাইভিং শেখার একটা বই। বই, টিভি, গান কিছুতে তার মন নেই। পনি টেল্ করা চুল, টসটসে আঙুরের মত সুখী চেহারা, কলকাতার চড়াই পাখি জয়া বিলিতি আরামে নধর কাকাতুয়া হয়ে গেছে। জয়া হঠাৎ বলল অনেক হল, আর পরীক্ষা দেব না। লেসন্ নিতে পাঁচশো পাউন্ড খরচ হয়ে গেল। এ টাকায় সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি হয়ে যেত একটা। টুকাইকে নিয়ে ঘরে ঢুকল বিনয়। মেয়েকে বিনয় খাওয়াতে পেরেছে কিনা পল্লব বুঝতে পারল না। ডাক্তার সমীর মজুমদার সম্পর্কে বিনয়ের মুখে আরও কিছু শোনার জন্যে মুখিয়ে থাকল পল্লব। বিনয় গম্ভীর, কিছু ভাবছে। তার হাতে তাজা ফলের রস, লাল রাইবিনা ভর্তি গ্লাস। টিভি, গান, জয়া, পল্লব, কারও দিকে তার নজর নেই। চুকচুক করে রাইবিনা খাচ্ছে সে। ঘর থেকে বেরিয়ে দোতলায় গিয়ে পোশাক বদলে ফিরে এল জয়া। টেডি বিয়ার বুকে জড়িয়ে টুকাই ঘুমিয়ে পড়েছে। জয়া ফিরতে ঘুমন্ত টুকাইকে শোয়াতে দোতলায় চলে গেল বিনয়।

রেকর্ড প্লেয়ার বন্ধ করে টিভির সাউন্ড নব ঘুরিয়ে দিল জয়া। টিভির পর্দায় একঝাঁক তরুণ, তরুণী গান গাইছে, ডায়মন্ড ফর্ এভার।

অন্ধকার রাস্তার চলন্ত গাড়ির আলো লেগে মাঝে মাঝে ঝলসে উঠছে জানলার বন্ধ কাঁচ। বাইরে থেকে ভেসে আসছে তুমুল বৃষ্টি আর গাঁক গাঁক ঝোড়ো হাওয়ার শব্দ। জয়া বলল, একটা গাড়ি থাকলে বাজার, হাট করার কত সুবিধে। মেয়েটাকে নিয়ে একটু বেড়ানো, বন্ধু-বান্ধব, সামাজিকতা রাখতেও একটা গাড়ি দরকার।

এসব কথা রান্নাঘরে, বাগানের গ্রীন হাউসে, যেখানে অনেক টমেটো ফলেছে, ড্রইংরুমে বসে জয়ার মুখে অনেকবার শুনেছে পল্লব। গত বাইশ তেইশ দিন এ বাড়িতে থেকে জয়ার চরিত্রের সব খুঁটিনাটি পল্লবের কাছে এখন ঝকঝকে স্লেটের মত পরিষ্কার। রোজ দুপুরে জয়া যখন বিনয়কে ফোন করে, তখন ঠিক একটা বেজেছে, ঘড়ি না দেখেও পল্লব বলতে পারে। ফোনে বিনয়কে যে কথাগুলো জয়া বলে, লাঞ্চ খেয়েছো, কী খবর, কটায় ফিরছো, আজ কি খুব কাজ, তারপর কী খবর, সাবধানে এসো, বাই, মুখস্থ হয়ে

গেছে পল্লবের।

রিসিভার রেখে একমুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে তারপর জয়া বলবে, এদেশে আবার খবর

নিজের মনে কথাটা বলে ঘরে ফিরে রবীন্দ্রসঙ্গীত চালিয়ে দেবে জয়া। ফাঁকা ঘরে প্লেয়ারে লঙ প্লেয়িং রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড বাজবে, টিভিতে মারদাঙ্গা টেক্সাস ছবি চলতে থাকবে আর খাবার ঘরে তখন কৌটো থেকে বার করা গরম মিল, ওমলেট প্লেটে সাজিয়ে লাঞ্চের আয়োজন করবে জয়া। লাঞ্চ খেয়ে বসার ঘরে ফিরে পাশের ঘরে মা, মেয়ের ধস্তাধস্তি শুনবে পল্লব। টুকাইকে খাইয়ে দুপুর শেষ করে ড্রইংরুমে ফিরবে জয়া। প্লেয়ারে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের নতুন রেকর্ড চাপিয়ে মেয়েকে খাওয়ানোর ধকলে হাঁপাতে থাকবে সে। যে জয়া হিন্দি, ইংরেজী গান ছাড়া কলকাতায় কিছু শুনতো না, এখন তার ভাঁড়ারে রবীন্দ্রসঙ্গীতের লেটেস্ট্ রেকর্ড, ক্যাসেট দেখে অবাক হয়েছিল পল্লব। বিলেতে এসে রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া আর কোন গান জয়া শোনে না।

টুকাইকে দোতলায় তার ঘরে শুইয়ে রেখে বিনয় যখন বসার ঘরে ফিরল, টিভিতে খবর হচ্ছে। খবর পড়ছে মাঝবয়সী, টাকমাথা এক ভদ্রলোক। এক বিধ্বংসী ভূমিকম্পে আজ সকালে তেহরানে প্রায় চার হাজার লোক, মারা গেছে। শেষ রাতে যখন ভূমিকম্প হয়, তেহরানের তিয়াত্তর মাইল দূরের সেই শহর তখন ঘুমিয়েছিল। ঘুমের মধ্যেই চার হাজার মানুষ মারা যায়। বহু মানুষ নিখোঁজ, আড়াই লক্ষ গৃহহীন, শহর প্রায় ধ্বংসস্তূপ শ্মশান।

খবরের সঙ্গে টিভির পর্দায় দেখাচ্ছিল, মৃত মানুষের শরীর, মুখ, ভাঙা বাড়ি, তছনছ শহরের টুকরো অংশ। খবর শুনে, ছবি দেখে চলকে উঠল পল্লবের বুকের রক্ত। শরীর আড়ষ্ট, কাঠ। ভূমিকম্পে কয়েক মিনিটে যেখানে চার হাজার সুস্থ মানুষ মরে যায়, সেখানে তার মত অসুস্থ মানুষের বাঁচার কথা ভাবা মূর্খামি, বাতুলতা। বাঁচার আকুলতা, আকাঙ্ক্ষার জন্যে লজ্জায় গুটিয়ে গেল পল্লব। খবর শুরু হওয়ার পর তাকে দু-একবার আড়চোখে দেখেছে বিনয়। খবর শুনে পল্লবের মুখের প্রতিক্রিয়া বিনয় বোধহয় দেখতে চাইছে। বাঁচার জন্যে পল্লবের হ্যাংলামি দেখে বিনয় হয়ত মনে মনে খুকখুক করে হাসছে এখন।

গ্লাসের রাইবিনা প্রায় শেষ করে এনেছে বিনয়। খাওয়ার ব্যাপারে বিনয়ের খুব বাছবিচার। ওর প্রিয় খাবার দুধ, মধু, কিসমিস্। তুমুল বৃষ্টির সঙ্গে খ্যাপা হাওয়া জানলার কাঁচে কিড়মিড় করে আঁচড় কাটছে। ড্রাইভিং পরীক্ষায় ফেল মেরে ম্রিয়মাণ জয়া বিড়বিড় করল, ছোটলোকের দেশ, শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি। পাগল হয়ে যাব আমি।

বন্ধ সদর দরজায় টুকটুক করে তিন চারবার টোকা পড়তেও বিনয়, জয়া কেউ উঠল না। তারা জানে, পল্লব দরজা খুলবে। গত তিন হপ্তায়, এ বাড়িতে পল্লব আসার পর থেকে দরজা খোলার অলিখিত এ আইন কীভাবে চালু হল, পল্লব জানে না। কিন্তু কেউ এলে এখন পল্লব দরজা খুলে দেয়। পল্লব উঠে গিয়ে দরজা খুলতে বিরাট এ্যালসেসিয়ান, জিমিকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল স্নিগ্ধা। স্নিগ্ধার হাতে গাড়ির চাবি। বাড়ির সামনে ফুটপাতের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে অসীম রায়ের নীল রঙের নতুন ডাট্সন গাড়ি। এ গাড়িতেই কলিন্সের সার্জারিতে গিয়েছিল পল্লব। আজ গাড়িতে স্নিগ্ধা একা। নিজেই গাড়ি চালিয়ে এসেছে সে।

স্নিগ্ধা ঘরে ঢুকতে জয়া প্রশ্ন করল, মিঃ রায় কোথায়?

কলেজে।

জয়ার সামনে কাঁচের সেণ্ট্রাল টেবিলের ওপর গাড়ির চাবি রেখে স্নিগ্ধা বসতে জয়া প্রশ্ন করল, মিলিকে আনলেন না কেন?

জবাব না দিয়ে মুচকি হাসল স্নিগ্ধা। মিলি যে কোন ভারতীয় বাড়িতে যেতে চায় না স্নিগ্ধা বলেছে জয়াকে। টেবিল থেকে গাড়ির চাবি তুলে নিয়ে জয়াকে স্নিগ্ধা প্রশ্ন করল, আজ ড্রাইভিং টেস্ট ছিল তো আপনার, কী হল? হালকা হাসিতে ফিকে লাল লিপ্স্টিক্ রাঙানো স্নিগ্ধার পাতলা ঠোঁট তির তির করে কাঁপছে। সে হাসি দেখে জয়ার চিবুক কঠিন, মুখ থমথমে হল। জয়া বলল, হল না।

এক মুহূর্ত চুপ থেকে জয়া প্রশ্ন করল, গাড়ি চালিয়ে সে খবরটা নিতে এলেন?

খুব চটে আছেন দেখছি, হাসিমুখে বলল স্নিগ্ধা। তারপর পল্লবকে প্রশ্ন করল, কেমন আছেন!

পল্লব হাসল। জিমি ঘরে ঢুকতে সোফায় সিঁটিয়ে গেছে বিনয়।

বিনয়কেই খুব মন দিয়ে শুঁকছে জিমি। ঘরের আবহাওয়া বেশ ভারী, অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে। রাইবনার খালি গ্লাস ঠক করে টেবিলের ওপর রেখে দিল বিনয়। সোফা থেকে উঠে স্নিগ্ধা বলল, চলি।
জিমিকে নিয়ে স্নিগ্ধা চলে যেতে রাগে ফেটে পড়ে জয়া বলল, কি ছোটলোক, অভদ্র মেয়েছেলে। কারও ক্ষতি হলেও এরা আনন্দ পায়। রূপের দেমাকে-ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। আমিও মজা দেখাবো ওকে।
পল্লবের সায়, সমর্থনের পরোয়া না করে জয়া বলল, নিজের দোষে পস্তাচ্ছে ও। ইঞ্জিনিয়ার ভেবে যে অসীমের সঙ্গে স্নিগ্ধার বাবা, মা মেয়ের বিয়ে দিল, একমাস বাদে জানা গেল, সে ইঞ্জিনিয়ার, না ঘোড়ার ডিম, কারখানার কুলি। ইঞ্জিনিয়ার ছেলে শুনে বাপ মা'র এমন পারিবারিক কালচার যে গলে গেল। ছেলে সম্পর্কে খোঁজখবরও করল না। জীবনে ইঞ্জিনিয়ার না দেখলে যা হয় আর কি! এম এ পাস মেয়েকে একটা কুলির হাতে গছিয়ে দিল। মেয়েও সেরকম। নামে এম এ পাস। কুলি পেয়েই খুশিতে আটখানা। স্বামীকে এ-লেবেল পাস করাতে কলেজে পাঠিয়ে পাঁচজনকে বলছে, অসীম পি এইচ ডি করছে।
পরনিন্দার মজা হল, যে করে, তার হতাশা, ব্যর্থতা কেটে যায়। স্নিগ্ধাকে একচোট গাল পেড়ে জয়ার মুখের ক্লান্তি, বিষাদ, মুছে গেল। এবার বিনয় মুখ খুলল। বলল, অসীম কিন্তু হোটেল মালিক। অনেক টাকা করেছে। টাকা ধুয়ে খাক, জয়া বলল।
বাইরের করিডোরে ফোন বাজতে জয়া গিয়ে ধরল। খুশির ধমকে এমন চেঁচিয়ে জয়া কথা বলছে যে পল্লব বুঝল ফোন করেছে জয়ার কলকাতার বান্ধবী। পাঁচ দিন হল লন্ডনে রিনি বেড়াতে এলেও এখনও তার সঙ্গে জয়ার দেখা হয়নি। কিন্তু ফোনে দুই বন্ধুর দীর্ঘ আলাপ হাসি, মস্করা রোজ শুনতে পায় পল্লব। রিকস্‌টনে ডাঃ অঞ্জলি ব্যানার্জি'র বাড়িতে রিনি উঠেছে।
ফোন রেখে পনের মিনিট পরে ঘরে ঢুকে জয়া বলল, রিনির সঙ্গে দেখা করতে কাল রিকস্‌টনে যাব আমি। তোমার সঙ্গে যাবার জন্যে বসে থাকলে রিনির সঙ্গে দেখা হবে না আমার।
গাড়ি চালানোর পরীক্ষায় ফেল করে জয়া এমন তেতে আছে যে তার সব কথায় ঝগড়াটে ভঙ্গি। এক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বিনয় বলল ডাক্তার

সমীর মজুমদারের সঙ্গে দেখা করতে কাল আমি ব্রমলেতে যাব। তুমি বরং পরশু যাও।

নাহ্, কালই যাব।

বিনয় চুপ দেখে জয়া প্রশ্ন করল, অফিস থেকে সমীর মজুমদারের কাছে গেলে বাড়ি ফিরবে কখন?

অফিসে কাল যাব না।

অফিস কামাই করার কী দরকার?

জয়ার প্রশ্নে ছ্যাঁৎ করে উঠল পল্লবের বুক। প্রশ্নের জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকল বিনয়। জয়ার প্রস্তাবে অনিশ্চয়তা, আতঙ্কে, পাকা ঘুঁটি কেঁচে গেল ভেবে, পল্লব কাঁপছে। বুকের মধ্যে চাপ, শ্বাসকষ্ট। আর একাশি দিন তার হাতে আছে। যে আরাম, প্রশান্তিতে একটু আগে শরীর জুড়িয়ে গিয়েছিল, জয়ার কথায় তা মুছে গেল। জি পি যোগাড়ের সরল-তম কর্মসূচিটাও কেঁচে যাওয়ার আশঙ্কায় অস্থির বোধ করল সে।

ব্রিক্সটনে যাওয়ার বাস রাস্তা বিনয় বলে দিচ্ছে জয়াকে। তার মানে জয়া কাল ব্রিক্সটনে যাচ্ছে। ব্রমলেতে বিনয় যাবে কিনা বুঝতে পারছে না পল্লব। মনে নৈরাশ্যের হাহাকার, ঘুমে জড়িয়ে আসছে দু'চোখ। এখন ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লে ঘুম হবে না জেনেও সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল পল্লব। একটু একা থাকতে চায় সে। ঘুমের দুটো বড়ি খেয়ে মাথার তলায় চারটে বালিশ রেখে আধশোয়া, আধবসা ভঙ্গিতে সে ঘুমোয়। ঘুম না হলেও শ্বাসকষ্ট এড়াতে এভাবে তাকে শুতে হয়। বিছানায় শুয়ে জমাট, নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে, চোখের সামনে বাদামী রঙের অসংখ্য ফুল ফোটা, মিলিয়ে যাওয়া দেখতে দেখতে সে ভাববে তাড়াতাড়ি একজন জি পি যোগাড় করার প্রস্তাবটা আরও কত সরল, সহজ ভাষায় বলা যায়। তিন হাজার পাউন্ড, তিন মাস সময়কে পরিচিত জনের ভয় কাটাতে নিরীহ সহজ তাড়াতাড়ি জি পি যোগাড়ের সরল বাক্যে দাঁড় করাবার পরেও আরও সহজ, সরল কথা খুঁজবে পল্লব। বিছানায় শরীর এলিয়ে সরলতম একটা বাক্যের খোঁজে ক্লান্ত হল সে।

আবছা তন্দ্রার মধ্যে পল্লব স্বপ্ন দেখল, দিক চিহ্নহীন নীল জল এক সমুদ্রের পাশে ছুঁচালো চূড়া এক পাহাড়। গম্বুজের মত লম্বা পাহাড়ে দাঁড়াবার জায়গা নেই। পাহাড়ের এক পাশে অতল খাদ, আর এক পাশে সমুদ্র। পাহাড়ের চূড়া জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে সে। থরথর করে চূড়াটা এমন কাঁপছে যেন ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায় পল্লবকে। ভয়ে, আতঙ্কে চূড়া আঁকড়ে ধরা পল্লবের হাতের মুঠো আলগা হয়ে যাচ্ছে। জ্বালা করছে হাতের পাতা। এখনই অন্ধকার গভীর খাদে অথবা অনেক নিচে উন্মাদ ঢেউ ভাঙা সমুদ্রে সে খসে পড়বে। দারুণ কষ্টে ঘুম ভেঙে গেল পল্লবের। শ্বাসকষ্টে ধড়ফড় করছে বুক। কত রাত খেয়াল করতে পারল না পল্লব। সারা বাড়ি নিঃশব্দ। পাশের ঘরে বিনয়, জয়া ঘুমোচ্ছে।

আজ সকালে কলকাতা থেকে অনিতার চিঠি এসেছে। সংসারের নানা খবর দিয়ে অনিতা লিখেছে বুবাই-এর জ্বর, গলায় ব্যথা।

এটুকু লিখে পল্লবকে চিন্তামুক্ত করতে অনিতা যোগ করেছে, এমন কিছু নয়, ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে বুবাই-এর।

অনেকক্ষণ জেগে থাকার পর ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুমের মধ্যে পল্লব দেখল, গলায় একরাশ টুকরো কাগজ আটকে গিয়ে কষ্টে ছটফট করছে বুবাই। তার শ্বাসনালী কাগজের টুকরোয় আটকে গেছে। শ্বাস নিতে পারছে না।

দারুণ ঝাঁকুনিতে ঘুম ভেঙে গেল পল্লবের। জানলার ভারী পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে এক টুকরো কালো আকাশ। আর ঘুম হল না। বাকি রাত জেগে কাটল পল্লবের। পরদিন সকালে অন্য দিনের মত অফিসে চলে গেল বিনয়। অনেক তোড়জোড় করেও ব্রিক্সটনে যাওয়া বাতিল করে জয়া ফোন করল রিনিকে। বলল, আজ যেতে পারছি না। উইক্-এন্ডে যাব। যা বাজে আবহাওয়া, রাস্তায়, ট্রেনে বাসে আইরিশদের বোমাবাজি, নানা এলোমেলো কারণ দেখিয়ে রিসিভার রেখে দিল জয়া। তারপর ঠিক একটায় বিনয়কে ফোন করে জয়া বলল, আজ আর গেলাম না। লাঞ্চ খেয়েছো, কী খবর, কটায় ফিরছো, আজ কি খুব কাজ; তারপর কী খবর, সাবধানে এসো। বাই।

ছুটির দিনে, শনি রবিবার এদেশে বারটার আগে সকাল হয় না। বিছানার লেপ, কম্বলের পাহাড়ের মধ্যে গর্তের পোকার মত মানুষ ঢুকে থাকে। সহজে বেরোতে চায় না। আজ শনিবার। ঘুম থেকে উঠে বিনয়, জয়ার ব্রেকফাস্ট সারতে বেলা প্রায় একটা বাজল। জয়া, টুকাইকে ব্রিকস্টনের বাসে তুলে দিয়ে আজ ব্রমলেতে ডাক্তার সমীর মজুমদারের বাড়ি যাবে বিনয়। ফ্যাকাসে রোদ উঠছে আকাশে। বাড়ি থেকে ওরা যখন বেরোল, বেলা প্রায় দুটো। শরীর আরও খারাপ হয়েছে পল্লবের। দু হাতের আঙুলের ডগাগুলো আবছা নীল হয়েছে। তবু আজ পল্লব দারুণ খুশি। সুদিন আসছে, জি পি ধরে এবার তার অপারেশন হবে। সদর দরজার একটা ডুপ্লিকেট চাবি জয়া দিয়ে গেছে পল্লবকে। বাড়ির পেছনের বাগানে রোদে বসে অচেনা দুটো পাখি ডাকাডাকি করছে। রোদ উঠলেও বসার ঘরের জানলার কাঁচ দিয়ে পল্লব দেখল, সাঁইসাঁই হাওয়া বইছে। হাওয়া যে বরফের মত ঠাণ্ডা ঘর থেকে টের পেল পল্লব। ফাঁকা বাড়িতে অদ্ভুত সব শব্দ হচ্ছে। জ্বলন্ত ফায়ার প্লেসের মধ্যে কঁকিয়ে কেঁদে উঠল কেউ। একটু নজর করে পল্লব দেখল, ফায়ার প্লেসের ভেতর থেকে যে পাইপ ছাতে গেছে, সেই পাইপের খোলা মুখ দিয়ে ভেতরে বাতাস ঢুকে শব্দ তুলছে।

বিনয়, জয়া বেলা পর্যন্ত ঘুমোলেও অনেক ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছিল পল্লব। টুকাইও জেগে গিয়েছিল। সকাল থেকে বাড়ির কথা আজ পল্লবের বারবার মনে পড়েছে। অনিতা, বুবাই, ফুলিকে আবার কি দেখতে পাব, সে ভেবেছে। নিজের সংসার, চাকরি, আত্মীয় বন্ধুদের মধ্যে আর কি ফেরা হবে। নব্বই দিনের মধ্যে তেরো দিন কেটে গেল। আর সাতাত্তর দিন, কম বেশি দেড় মাস হাতে আছে। তারপর যদি সে বেঁচে থাকে, ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাববে, ভাবার অধিকার পাবে। তার আগে নয়। বিনয়ের দেওয়া পুরানো ওভারকোট, হাত মোজা পরে আড়াইটে নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল পল্লব। ওভারকোটটা খুব ভারী। কোটের ওজনে পল্লব প্রায় বেঁকে গেল। একটু হেঁটে হাঁপ ধরতে আকাশের দিকে মুখ তুলে জোরে জোরে শ্বাস টানল পল্লব। ছিটেফোঁটা শীতল বাতাস নাকে ঢুকলেও বুকের গভীরে গেল না। ঝকঝকে রোদের মধ্যে

দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পল্লবের মনে হল, জোলো রোদ, তাপ নেই এ রোদে। ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা ওভারকোট, জ্যাকেট, কার্ডিগান ফুঁড়ে শরীরে ঢুকছে। শীতে কাঁপুনি লাগছে পল্লবের। দুশো গজ হেঁটে হাঁপিয়ে উঠে ফুটপাতে পাতা একটা বেঞ্চে বসে জিরিয়ে নিতে চাইল পল্লব। বেঞ্চে সাদা চামড়ার এক বৃদ্ধ বসে আছে। পল্লব বসতে যেতে বৃদ্ধ এমন কটমট করে তাকালো যে পল্লব বসল না, সরে গেল। হইহই করে জেব্রা ক্রসিং দিয়ে রাস্তা পেরোচ্ছে একদল বাচ্চা। তাদের সঙ্গে রাস্তা পার হয়ে বাসস্টপে এসে দাঁড়াল পল্লব। কলিন্সের সার্জারি থেকে তেরোদিন আগে রাত এগারোটায় বাড়ি ফিরে তার সাহস, আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে। নম্বর কী, কোথায় যাচ্ছে, না জেনেই বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থাকা একটা বাসে উঠে বসল পল্লব। তিন, চারটে স্টপ গিয়ে ইস্টহ্যাম বাজারে নেমে পড়ল সে। দুপাশে সারি সারি কাঁচ লাগানো দোকান, ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর, মার্ক্স অ্যাণ্ড স্পেন্সার, সি এণ্ড এ, ব্রিটিশ হোম ইণ্ডাস্ট্রিজ, সেলফ্রিজ, উলওয়ার্থ। রাস্তায় থিকথিক করছে মানুষ। রোদ উঠতে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে সকলে। কাঁচের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ঝকঝকে অ্যালুমিনিয়ম ট্রেতে নানা জাতের মাংস, পর্ক, বিফ, হ্যাম, ল্যাম্ব, চিকেন, থরে থরে সাজানো। কেকের দোকানে একশো রকম কেক। ফ্রেশ ক্রিমের গন্ধে ভুরভুর করছে বাতাস। পাশের ফলের দোকান থেকে ভেসে আসছে টাটকা আপেল, ন্যাসপাতি, পিচ, চেরির মিঠে গন্ধ। জামা কাপড়, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, ঘড়ি, জুয়েলারির দোকানে ঝুলছে সেলের বিজ্ঞাপন। ছুটির দিনে সংসারের সাতদিনের বাজার কিনতে ছোট ঠেলাগাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে গৃহিণীরা। খাবার, প্রাচুর্য, স্বাস্থ্য, হাসি উপচে পড়ছে। অসুস্থ, শরীর, ফেঁসে যাওয়া হৃৎপিণ্ড, রোগা হাত পা নিয়ে সজীব মানুষের এই স্রোতের মধ্যে পল্লব সিঁটিয়ে গেল।

হঠাৎ রোদ নিভে কালো হয়ে গেল আকাশ। মেঘ জমেছে আকাশে। রোদ মুছে যেতে হাওয়ার বেগ বেড়ে গেল। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় তরোয়ালের ধার। হাওয়া লেগে পল্লবের শরীরের হাড় পর্যন্ত ঝনঝন করতে থাকল। সামনে একটা সিনেমা হলের দেওয়ালে তিনটে এক্স মার্কা ছবির পোস্টার সাঁটা। টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হতে এক পাউণ্ডের একটা টিকিট কিনে হলে ঢুকল পল্লব। আর কিছু না হোক ঠাণ্ডা হাওয়া আর বৃষ্টি থেকে বাঁচা

যাবে। হলের ভেতরে বেশ গরম। সিনেমা শুরু হয়ে গেছে। তাতে কোন ক্ষতি নেই। একবার টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকলে হল বন্ধ হওয়া পর্যন্ত বসে থাকা যায়। টিকিটে সিট নাম্বার নেই। যার যেখানে খুশি বসে। প্রায় সব হলের মত এখানেও পরপর তিনটে ছবি দেখানো হচ্ছে। অন্ধকার হলে পেছনের একটা সিটে বসে পড়ল পল্লব। হল প্রায় ফাঁকা, অল্প কিছু দর্শক হলের নানা জায়গায় ছড়িয়ে বসে আছে। রুপোলি পর্দায় নিষ্ঠুর, ভয়ংকর এক ছবি। নগ্ন, সুন্দরী এক যুবতী চেয়ারে পিছমোড়া করে বাঁধা। ধারালো ছুরিতে তার পিঠ, পেট, হাত, মরাল গ্রীবা, ফালাফালা করে দিচ্ছে একজন লোক। মেয়েটির মুখের মধ্যে তুলো ভরা, চেঁচাতে পারছে না সে। যুবতীর মুখ, বুক, উরু রক্তে ভেসে যাচ্ছে। আরও কয়েকটা সুন্দরী মেয়ের ক্ষতবিক্ষত, উলঙ্গ দেহ ঘরের মধ্যে পড়ে আছে। একই কায়দায়, ছুরির আঁচড়ে মারা হয়েছে তাদের। চেয়ারে বাঁধা মেয়েটার দু চোখ আতংকে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স খুনী লোকটার মুখে হিংস্র, শব্দহীন হাসি।

সিনেমার পর্দায় এমন বীভৎস ছবি পল্লব আগে দেখেনি। মেয়েটার শরীরে ছুরির প্রতি টানের সঙ্গে কুঁকড়ে যাচ্ছে তার হৃৎপিন্ড। ভোঁ ভোঁ করছে মাথা। বুকের মধ্যে দলাপাকানো কষ্টে দুচোখ বুজে ফেলে পল্লব। প্রথম ছবি শেষ হতে দ্বিতীয় ছবির আগে হলের আলো জ্বলে উঠল। পেছনের সিটে বসে পল্লব ভাবল, ভালই হয়েছে। দ্বিতীয় ছবির শুরুটা দেখে ভাল না লাগলে হল থেকে বেরিয়ে যাবে। হলের দর্শকদের বেশির ভাগ বুড়ো লোক। পল্লব শুনেছে, এ দেশের গরিব, নিঃসঙ্গ বয়স্করা বাড়ি গরম করার ব্যবস্থা না থাকার জন্যে সিনেমা হলে ঢুকে বসে থাকে।

নতুন ছবি শুরুর আগে দেখানো হচ্ছে বিজ্ঞাপন। হুইস্কির বিজ্ঞাপন, কুকুরের জন্যে টিনের খাবার কমলালেবুর স্কোয়াশ, চকোলেটের বিজ্ঞাপন। হালকা, মৃদু আলোয় হলের মাঝখানের একটা সিটে নজর পড়তে পল্লব চমকে উঠল। সিটে বসে আছে বিনয়। হ্যাঁ বিনয়ই। চেয়ারের ওপর জেগে থাকা বিনয়ের ওভারকোটের ফারের ফলার দেখে চিনতে পেরেছে পল্লব। বিনয়ের লাইনে বাঁ দিকের সিটে চারজন কমবয়সী ছেলে-মেয়ে বসেছে। তাদের দিকে একবার তাকালেও পেছনে ফিরল না বিনয়। চেয়ারের ওপর ওভারকোটের চকোলেট রঙ ফারের কলারের দিকে তাকিয়ে

মাথা ঘুরছে পল্লবের। দুটো লাইন আগে ডান দিকের সিটে বসা একটা লোককে দেখে পল্লব চমকে উঠল। লোকটা চেনা। কুঁতকুঁতে, ঠাণ্ডা চোখে সে একবার পল্লবকে দেখল। ভয়ে হিম হয়ে গেল পল্লবের বুক, এ সেই লোক। একটু আগে এ লোকটাই ছুরি হাতে পর্দায় মেয়েদের ফালা-ফালা করছিল। তখনই নিভে গেল হলের আলো। দ্বিতীয় ছবি শুরু হতে চুপিসারে হল থেকে বেরিয়ে এল পল্লব। বিস্ময়ে, ভয়ে তার শরীর কাঁপছে। ছবি দেখতে এসে অনেক উঁচু থেকে শান বাঁধানো রাস্তায় সে যেন আছড়ে পড়েছে।

কালো মেঘ আরও ঘন, জমাট হয়েছে আকাশে। ইলশে গুঁড়ির চেয়ে একটু বড়ো দানার বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে একনাগাড়ে। বৃষ্টি নয় যেন ছুঁচের ধার বরফকণা, পল্লবের মাথা-মুখ ফুটো করে দিচ্ছে। বরফের মত বৃষ্টি হিম-শীতল ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে ফাঁকা ফুটপাত ধরে হেঁটে চলেছে পল্লব। উঁচুনিচু রাস্তার খাড়াই ভাঙতে বেশ কষ্ট হচ্ছে তার। কিন্তু বৃষ্টি, বাতাসে, দুর্যোগ, শ্বাসকষ্ট, কিছুতে তার হুঁশ নেই। তার মাথায় শুধু একটা ছবি, অন্ধকার হলে সিটের ওপর উঁচিয়ে থাকা চকোলেট রঙ ফারের কলার। ডাক্তার সমীর মজুমদারের বাড়িতে না গিয়ে বিনয় সিনেমা দেখছে। বিনয় কেন এটা করল? পল্লবের রোগ অসুস্থতার কথা কি বিনয় বিশ্বাস করেনি? বিশ্বাস করেও গুরুত্ব দেয়নি?

বিনয়ের আচরণের কোন ব্যাখ্যা পেল না পল্লব। স্যাঁতসেতে, ভিজে রাস্তায় হাঁটতে পারছে না সে। বিনয় কেন এরকম করল, ধোঁকা দিল আমাকে? একটা প্রশ্ন তার বুক কুরে কুরে খাচ্ছে। দরজা খুলে ফাঁকা বাড়িতে দোতলায় নিজের ঘরে ফিরে এলো সে। তারপর জুতো, মোজা, ভিজে ওভারকোট নিয়ে লুটিয়ে পড়ল বিছানায়। তার শরীর কাঁপছে, ফুটো হৃৎপিণ্ড উথালপাথাল, বিকট শব্দে ফেটে পড়তে চাইছে। পল্লব ভাবল, আমার বাঁচার কোনও আশা নেই দরকারও নেই বোধহয়।

জানলার ভারী পর্দার বাইরে ধূসর, অন্ধকার হচ্ছে পৃথিবী। ফায়ার প্লেসের চিমনিতে বন্দী হাওয়ার হাহাকার, রাস্তার গাড়ির শব্দ, টুকরো কথা শুনে পল্লবের মনে হল তাকে ঘিরে অদৃশ্য কিছু মানুষ চাপা গলায় বলছে, পৃথিবীতে কেউ বাঁচে না, বাঁচবে না।

ঘুমের বড়ির নেশায় বুঁদ, দুচোখের ভারী পাতা মেলতে পারল না পল্লব।

বিনয়ের অদ্ভুত আচরণের এক আবছা ব্যাখ্যা হঠাৎ পল্লব খুঁজে পেল। বার বছর বিলেতে থেকে অনেক বদলে গেছে বিনয়। গত পাঁচ বছর কলকাতায় ফেরার জন্যে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সে বিফল হয়েছে। এখানে সে ভাল চাকরি করে, মোটা মাইনে পায়, জমানো টাকাও কিছু আছে। কিন্তু শান্তি নেই তার মনে। রাস্তায় আতঙ্ক, বাড়িতে অশান্তি। সাদা চামড়ার দেশে সে যে দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক, অবাঞ্ছিত, যে কোনও সময়ে অপমানিত, লাঞ্ছিত হতে পারে, ধোলাই খেতে পারে, সে জানে। তার চেনা ভারতীয়দের শতকরা আশিজন, তাদের মধ্যে অনেকে একাধিকবার রাস্তায়, পাবে সাদা চামড়ার মানুষের হাতে মার খেয়েছে। মারা গেছে দুজন। টেলিফোনে প্রায়ই ইংরেজীতে নোংরা গালাগাল, হুমকি উড়ে আসে। দিন ফুরোলে রাস্তায় থাকতে সাহস পায় না সে। কখন কী ঘটবে বলা মুশকিল। এ দেশে থাকার জন্যে লজ্জা, সঙ্কোচ গ্লানিতে মন তেতো হয়ে আছে সবসময়। তাছাড়া বাড়িতে জয়ার অস্থিরতা, ছটফটানি, অভিযোগ শুনে বিনয় জেরবার। এ মুহূর্তে কলকাতায় ফিরে যেতে চায়। কলকাতায় গিয়ে কোথায় থাকবে, কী খাবে না জেনেও জয়ার জেদ প্রায় পাগলামির পর্যায়ে পৌঁছেছে। অন্ধকার শীতের সময়ে জয়ার পাগলামি বাড়ে। তখন বাড়িতে বসে একা একা সে কাঁদে। বলে, এবার বিষ খাব।

কলকাতা যে ভূস্বর্গ নয়, নানা অসুবিধে, সমস্যায় সে শহরও যে খাবি খাচ্ছে, দু-চার বছর ছাড়া কলকাতায় গিয়ে বিনয় জয়া তা দেখে এসেছে। বেঁচে থাকার সাধারণ আয়োজন করতে সে সহরে যে জিভ বেরিয়ে যায়, ভেজাল, জোচ্চুরি, দুর্নীতি অব্যবস্থায় সারা দেশ তছনছ, ছ'হাজার মাইল দূরে থেকেও সে খবর বিনয় জানে। তবু সেখানে ফিরতে হবে। সাদা, কালোর বৈষম্য অন্তত সেখানে নেই। তাছাড়া টুকাই বড় হচ্ছে, বড় হবে, তার ভবিষ্যতের কথা ভেবে জয়া বেতাল হয়। টুকাই-এর ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা বিনয়ও করে। কিন্তু সুরাহা, বিহিতের পথ খুঁজে পায় না। সুখে থেকেও বিনয়ের মনে তাই চাপা হতাশা, নৈরাশ্য, হয়ত হিংসেও জমেছে। ছ-হাজার মাইল দূর থেকে এসে এদেশের চিকিৎসার সুবিধে ভোগ করে অসুস্থ পল্লব নীরোগ শরীরে কলকাতায় বাড়ি ফিরে যাবে, ছুটিয়ে সংসার, চাকরি করবে, আত্মীয়, বন্ধুদের স্নেহ, সঙ্গ পাবে, আর বিনয় সপরিবারে এখানে পচবে, শেষ হয়ে যাবে, এই সরল সত্য মেনে নিতে পারছে না বিনয়। জলে পড়া

জন্তুর যন্ত্রণা নিয়ে সে বেঁচে আছে। অসুস্থ পল্লবের উপকার করার কথা ভেবেও তাই পেছিয়ে এসেছে বিনয়। রাস্তায় বেরিয়ে হয়ত সে ভেবেছে, তার জন্যে কেউ যখন কিছু করে নি, কেন অন্যের জন্যে খামোকা সে ছুটো-ছুটি করবে? পল্লবের জন্যে ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বেরিয়ে বিনয় তাই সিনেমা হলে ঢুকে বসে আছে।

বিনয়ের ব্যবহারের যুক্তিসঙ্গত একটা ব্যখ্যা পেয়ে, ব্যাখ্যাটা ঠিক না ভুল, খতিয়ে দেখার উৎসাহ বোধ করল না পল্লব। তার মস্তিষ্ক কাজ করছে না। একতলায় অনেক গলার কোলাহল শুনে চোখ খুলে পল্লব দেখল অন্ধকার ঘরে সে শুয়ে আছে। একটা দামী দিন অনেক আগে শেষ হয়ে গেছে। জয়ার তীক্ষ্ন গলা, অচেনা মেয়েলি হাসি শুনে বিছানা থেকে উঠে ঘরের দেওয়ালের হুকে ওভারকোট ঝুলিয়ে একতলার ঘরে ঢুকল পল্লব। জয়া, টুকাই ছাড়া একদঙ্গল অচেনা মানুষে গমগম করছে বসার ঘর। সোফা-গুলো প্রায় ভর্তি। পল্লবের সঙ্গে প্রথমে রিনির, তারপর ডাঃ অঞ্জলি ব্যানার্জি, অঞ্জলির স্বামী, সতুমামা, তাদের ছেলে বাবলুর পরিচয় করিয়ে জয়া বলল, গ্রেট সতুমা. র রিনির মামা, আপন মামা না হলেও তার চেয়ে অনেক বেশি। পনের-ষোল বছরের বাবলু এসব খেজুরে আলাপে কান না দিয়ে টিভিতে রাগবি খেলা দেখছে।

বিনয় ফেরেনি?

পল্লবকে প্রশ্ন করে জয়া বলল, ব্রমলে কি এখানে, অনেক দূর। ব্রিকস্টনে ফোন করে বিনয় জানিয়েছে ফিরতে তার দেরি হবে।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে পল্লবের রোগের কথা অঞ্জলিকে বলতে শুরু করল জয়া। মন দিয়ে জয়ার কথা শুনছে অঞ্জলি। অঞ্জলির বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ, ছেচল্লিশ, কাকের পালকের মত কুচকুচে কালো ববচুল, গায়ের রঙ ঘোর শ্যাম, বন্নাশার লাগানো লালাভ মুখ, ঘন খয়েরি লিপস্টিক ঠোঁট উপছে নেমে এসেছে। অঞ্জলি ব্রিকস্টনের জেনারেল ফিজিসিয়ান, জি পি। তাকে দেখে আশায়, আবেগে ধড়াস ধড়াস করছে পল্লবের বুক। সিনেমা হলে বিনয়কে আবিষ্কার করে পল্লবের মনে যে নৈরাশ্য, ব্যর্থতা জমেছিল, ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে। চোখের সামনে একজন জ্যান্ত জি পি দেখে, তার মনে হল, আর ভয় নেই। দুঃখের দিন এবার শেষ হবে। জয়ার কথা শেষ হলেই অঞ্জলি হয়ত বলবে পল্লবের চিকিৎসা, হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা, সব আমি

করে দেব।
পল্লবের রোগের বিবরণ শেষ করল জয়া। কান খাড়া করে অভয়, আশার কথা শোনার জন্যে অঞ্জলির মুখের দিকে ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে আছে পল্লব। জয়াকে অঞ্জলি প্রশ্ন করল, এদিকের পাকিস্তানী দোকানে ভাল মাছটাছ পাওয়া যায়?
পল্লবের রোগের কাহিনী বলতে শুরু করে জয়া একটু বিরত হয়েছিল। প্রসঙ্গ ঘুরতে একলাফে মাছের বাজারে চলে গেল সে। বলল, ইস্টহ্যামে ইয়াসীনের দোকানে দেশী সব মাছ, টাটকা ইলিশও পাওয়া যায়।
রিনির মুখে আবছা হাসি। তার দিকে তাকিয়ে সতুমামা মুচকি হাসল। পল্লব দু-চোখ বুজল।
পল্লবকে সতুমামা প্রশ্ন করল, কোন পাড়ায় থাকেন?
পল্লব নাম বলতে লাফিয়ে উঠে সতুমামা বলল, আমিও ও পাড়ার ছেলে।
পাড়ার একগাদা লোকের নাম বলে তাদের খবর জানতে চাইল সতুমামা। সে সব নামের একজনকেও পল্লব চিনতে না পারায় সতুমামা বলল, আমি বলছি চল্লিশ বছর আগের কথা।
পল্লব বুঝল, তার জন্মের অনেক আগের কাহিনী শোনাচ্ছে সতুমামা। সতুমামার চেহারা, মুখ, দামী স্যুট দেখে বয়স অনুমান করতে না পারলেও মানুষটা যে অঞ্জলির চেয়ে বয়সে বড়, মনে হল না পল্লবের।
সতুমামা প্রশ্ন করল, গলির মোড়ে সেই উড়ের হোটেলটা আছে? ঘুড়ির দোকান?
কোনও উড়িষ্যাবাসীর হোটেল অথবা ঘুড়ির দোকান, পাড়ায় দেখার কথা পল্লব মনে আনতে পারল না। তাতে সতুমামার কিছু এসে যায় না। ছেলেবেলা, কৈশোরের গল্পে সতুমামা মশগুল। প্রতিবেশীর জ্যান্ত হাঁস মেরে খাওয়ার গল্প, দাঙ্গার সময় নিজের হাতে মুসলমান কাটার কাহিনী অবলীলায় গড়গড় করে বলে যাচ্ছে। হাসি, গল্পের মধ্যে সতুমামা যে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে, পল্লব নজর করল। আচ্ছা, গল্পের তলায় সতুমামার মনে যেন দুশ্চিন্তার চোরা স্রোত বয়ে যাচ্ছে।
অঞ্জলি বলল, এবার উঠবো। পেশেন্ট আসবে, সময় দেওয়া আছে।
অঞ্জলি উঠলেও স্মৃতির জাবর কাটায় বিহ্বল সতুমামা খেয়াল করল না। খুব মন দিয়ে সতুমামার কথা কেউ না শুনলেও পল্লব শুনেছিল। সতুমামার

কথা শোনার সঙ্গে পল্লব নিঃশব্দে প্রার্থনা করছিল, আপনার স্ত্রীকে আমার বিপদের কথা একবার বলুন। কলকাতায় যে পাড়ায় আপনি থাকতেন, সেখানে আমার বৌ, ছেলে-মেয়েকে একা ফেলে প্রাণের দায়ে ছ-হাজার মাইল দূরে এই বিদেশে ছুটে এসেছি। আমি মরে গেলে তাদের দেখার কেউ নেই। দুটো নাবালক শিশু অনাথ হবে। আর সাতাত্তর দিন আমি বাঁচবো। তারপর ? দয়া করে আপনি বাঁচান, আপনার ডাক্তার স্ত্রীকে একটু কৃপা করতে বলুন আমাকে।

সারাদিনের দৌড়ঝাঁপে ক্লান্ত টুকাই টেডি বিয়ার বুকে জড়িয়ে কার্পেটের ওপর ঘুমোচ্ছে। ঘরে ঢুকল বিনয়। একপলক টুকাইকে দেখে হাসি মুখে অঞ্জলিকে বলল, সারাটা দিন ডাক্তার সমীর মজুমদারের বাড়িতে কেটে গেল।

এক সেকেন্ড চুপ থেকে তারপর প্রশ্ন করল, সমীর মজুমদারকে চেনেন ?

নাম শুনেছি, আলাপ নেই, অঞ্জলি জবাব দিল। বিনয় আসতে ভদ্রতার খাতিরে আবার বসতে হল অঞ্জলিকে। নতুন করে শুরু হল আড্ডা। বিদেশে পাঁচজন বাঙালীর আড্ডা মানেই কলকাতার আলোচনা, কলকাতা দিয়ে শুরু কলকাতায় শেষ, মাঝখানে পাঁচমিশেলি কিছু বিষয়। গত বছর কলকাতায় গিয়ে কী দেখেছে বিনয় বলছে সে কাহিনী। বিনয়ের মতে ধুলো, নোংরায় ভরা কলকাতা মানুষের থাকার অযোগ্য। এসপ্লানেডের রাস্তায় মাথায় লাল টুপি পরা ঝাঁকঝাঁক কুষ্ঠরোগী, ভিখিরী। বিনয় বলল, পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে একটা ষাঁড় একদিন এক ভদ্রমহিলার শাড়ির আঁচল খেয়ে নিল।

বিনয় যে এমন বৈঠকী গল্পে ওস্তাদ, পল্লব জানতো না। তার কথায় ঘরে হাসির ধুম পড়ে গেল। হাল্কা থেকে ক্রমশ গম্ভীর হল আলোচনা। ভারতের রাজনীতি, অর্থনীতি সম্পর্কে মতামত দিয়ে দেশটা যে গোল্লায় যাচ্ছে, এ বিষয়ে একমত হল সকলে। সোফা থেকে উঠে অঞ্জলি বলল, আর নয়, এবার যেতেই হবে।

অঞ্জলির সঙ্গে বাবলু, সতুমামা উঠে দাঁড়ালো। বসার ঘরের খোলা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে জয়া, রিনি চাপা গলায় কথা বলছে। সতুমামার ব্যাজার মুখ দেখে বোঝা গেল, আরও কিছুক্ষণ আড্ডা দেওয়ার ইচ্ছে ছিল তার। রিনির দিকে একবার তাকিয়ে চোখ নামাল সতুমামা। একটা নামী এয়ারলাইন্স-

এর কলকাতা অফিসে চাকরি করে রিনি। মাঝে মাঝে বিদেশে যাওয়ার টিকিট পায়। এবার নিয়ে তৃতীয় দফায় লণ্ডনে এল সে। রিনির বয়স সাতাশ, আটাশ, এখনো অবিবাহিতা। সতুমামার সঙ্গে রিনির চোখাচোখি, দৃষ্টি চালাচালি দেখে ধাঁধা খেল পল্লব। সোফায় বসা বিনয়, দরজায় দাঁড়ানো জয়াকে লক্ষ্য করেও পল্লব অবাক হল। যার দিকে তাকাচ্ছে, তার মস্তিষ্কের কলকব্জা, চিন্তা, কাজ, ঢাকা খোলা ঘড়ির মত দেখতে পাচ্ছে পল্লব। আজ বিকেল থেকে মানুষকে দেখার নতুন ক্ষমতা পেয়েছে সে। সব মানুষই জটিল যন্ত্র, চামড়া ঢাকা কলকব্জার বাণ্ডিল। না চাইতেও এই অসহ্য ভয়ানক ক্ষমতা, দিব্যদৃষ্টি পেয়ে শিউরে উঠল পল্লব। একজন মানুষের ভেতরের সবটা দেখা যে উচিত নয়, দেখলে বাঁচা যায় না, জেনেও দেখার নেশায় মজে গেল পল্লব। হঠাৎ তার মনে হল, মৃত্যুর আগেই বোধ-হয় মানুষ এভাবে দেখতে পায়। তার মানে সে মরতে চলেছে।

অতিথিরা চলে যেতে বসার ঘর খালি। জ্বলন্ত ফায়ার প্লেসের মধ্যে কেশর নাড়ছে লাল আগুন। ডাঃ সমীর মজুমদারের সঙ্গে কথাবার্তার বিবরণ পল্লব, জয়াকে শোনাচ্ছে বিনয়। সমীর মজুমদার বলেছে, পল্লবের চিকিৎসার জন্যে যা করার সে করবে।

বিবরণ শেষ করে পল্লবকে ঠেস দিয়ে বিনয় বলল, সুস্থ হয়ে আপনি দেশে ফিরে যাবেন আর আমরা এখানে পড়ে থাকব, পচবো।

সন্ধ্যেবেলায় বিছানায় শুয়ে বিনয়ের আচরণের যে ব্যাখ্যা পল্লব করেছিল, এখন মনে হল, তা ঠিক, বিনয়কে চিনতে ভুল হয়নি তার।

কলিন্সের সার্জারি থেকে রাতে পল্লব একা ফিরেছে শুনে খুব রাগ করল সুন্দরলাল। বলল, তোমার দরকার হবে ভেবেই রোজ ফোন করি আমি। অথচ দরকারে তুমি ডাকলে না আমাকে।

সুন্দরলাল ক্ষুণ্ণ হয়েছে, বুঝতে পেরে পল্লব বলল, অসীমবাবু পৌঁছে দিলেন, তাই আর ব্যস্ত করি নি আপনাকে।

অন্যায় করেছো, সুন্দরলাল বলল, আর কর়ো না।

হাসিমুখে পল্লব বলল, ঠিক আছে। ষাট বছরের সুন্দরলালকে নিজের প্রয়োজনে খাটাতে অস্বস্তি হচ্ছিল পল্লবের। তাই কলিন্সের ফোন পাওয়ার

কথা সুন্দরলালকে জানিয়ে পল্লব বলেছিল, বিনয়ের বন্ধু অসীম তার গাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে।
কথাটা শুনে সুন্দরলাল ভেবেছিল, কলিন্সের সার্জারিতে পল্লবের যাতায়াতের দায়িত্ব নিয়েছে অসীম। বিনয়ের বাড়ি এসে আজ সে জানল যে, ঘটনা আলাদা। অসীমের গাড়িতে গিয়ে রাত এগারোটায় সার্জারি থেকে একা বাড়ি ফিরেছে পল্লব। খবর শুনে কয়েক সেকেণ্ড তাজ্জব, বোবা হয়ে গেল সুন্দরলাল।
ট্রেতে তিন কাপ কফি, বিস্কুট নিয়ে ঘরে ঢুকল জয়া। একটু আগে বিনয় ফিরেছে অফিস থেকে। আধঘণ্টার মধ্যে সে খেতে বসবে। খাবার আগে কফি খেতে বিনয় রাজি নয়। তাই সুন্দরলাল, পল্লব আর নিজের জন্যে কফি করেছে জয়া। কফির কাপে চুমুক দিয়ে সুন্দরলাল বলল, একজন জি পি ধরতে আমার চেনা সাতজন ভারতীয় জিপির বাড়িতে ধর্না দিয়েছি। তোমাকে পেশেণ্ট করার অনুরোধ ছ-জন সোজা নাকচ করেছে, একজন বলেছিল, এক হপ্তার মধ্যে জানাবে। এক হপ্তা হয়ে গেল। জানায়নি। ব্লাডি কাওয়ার্ডস, সব ভীতুর দল। দামী পোশাক, নতুন গাড়ি, লম্বা-চওড়া কথা, কিন্তু কেউ মানুষ নয়, ভেড়া, হ্যাঁ ভেড়া।
রাগে, ক্ষোভে গলগল করে কথা বলছে সুন্দরলাল, আমাকে শোনালো আইনের কথা। হেল্‌থ্‌ সার্ভিসের আইনে নাকি একজন বিদেশীকে রোগী হিসেবে নেওয়া নিষেধ। কীসের আইন, কার আইন? অসুস্থ মানুষের চিকিৎসায় দেশী-বিদেশী প্রশ্ন উঠবে কেন? দুশো বছর ধরে ভারত থেকে কোটি কোটি পাউণ্ড লুট করে আনার সময় দেশ বা বিদেশের প্রশ্ন এই ইংরেজরা একবারও ভাবেনি। কোন্ আইনে একটা দেশের সম্পদ অন্য দেশে পাচার হয়, এ প্রশ্ন ওই কাঁপুরুষ ডাক্তাররা না করলেও আমি করব। কথার তোড়ে গলায় শ্লেষ্মা জমতে খকখক করে কাশতে লাগল সুন্দরলাল। বলল, ব্লাডি কোল্ড, কী ঠাণ্ডা, বাতে কাহিল হয়ে আছি।
জি পি না পেলেও হতাশ হওয়ার মানুষ নয় সুন্দরলাল। কফিতে চুমুক দিয়ে গলা ভিজিয়ে সুন্দরলাল, জি পি-র খোঁজে গত পনেরদিন ছুটোছুটি করে মনে হচ্ছে, জি পি না মিললেও ভয় পাবার কারণ নেই। চিকিৎসা পাওয়ার আরও অনেক রাস্তা আছে। কোনও একটা কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র হয়ে ঢুকতে পারলে, এ দেশে বিনা খরচে চিকিৎসা করানো

যায়। আর একটা উপায় হল, কোথাও একটা চাকরি জোটানো। চাকরি করলে এ দেশে ট্যাক্স দিতে হয়। যারা ট্যাক্স দেয়, সরকারি নিয়মে তাদের চিকিৎসার দায়িত্ব সরকার নেয়। তোমাকে এখনই হয় ছাত্র হতে হবে, অথবা একটা চাকরি যোগাড় করতে হবে। চাকরির বাজার খুব খারাপ। সাদারাই বেকার, তুমি পাবে কোথা থেকে ? স্কুল অব ওরিয়েণ্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজে খোঁজ করে জানলাম, সেখানে অক্টোবর মাসে শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়। ছাত্র ভর্তি শুরু হয় আগস্ট, সেপ্টেম্বর মাসে। ভর্তির খরচ পাঁচশো পাউণ্ড। পাঁচশো পাউণ্ড অনেক টাকা। তবে তিন হাজার পাউণ্ডের চেয়ে কম। ধার দেনা করে পাঁচশো পাউণ্ড যোগাড় হত, কিন্তু সময় চলে গেছে।

সুন্দরলালের কথার মধ্যেই অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল পল্লব। সে ভাবছিল, পাঁচ, সাত মিনিট টানা হাঁটলে আমার শ্বাসকষ্ট হয়, জিভ বেরিয়ে আসে। কীভাবে কলেজে যাব, চাকরি করবো আমি ?

সুন্দরলালের কথা শুনে জয়া মজা পাচ্ছে। খেতে বসার জন্যে উসখুস করছে সে। টুকাই হাঁ করে দেখছে সুন্দরলালকে। পকেট থেকে টাইপ করা একটা কাগজ বার করে সুন্দরলাল বলল, বিনাখরচে চিকিৎসা পাওয়ার প্রার্থনা জানিয়ে মহারানীর কাছে লেখা আবেদনপত্র এটা। পড়ে সই কর তুমি।

চিঠি না পড়ে কাঁপা হাতে সই করল পল্লব। সুন্দরলাল বলল, বাঁচার জন্যে সবগুলো পথে এগোতে হবে।

বিনয়ের মুখ দেখে, সে কী ভাবছে বোঝা মুশকিল। ঠিক মুশকিল নয়। একটু খুঁটিয়ে বিনয়কে দেখলে খোলা ঘড়ির মত তার মাথার কলকব্জা, ঘিলু চিন্তা পল্লব দেখতে পারে। কিন্তু সে দেখতে চায় না। দেখা মানেই কষ্ট। নিজের কষ্টেই সে খাবি খাচ্ছে। বাড়তি কষ্ট ডেকে এনে কী লাভ ?

আবেদনপত্র ভাঁজ করে পকেটে রেখে সুন্দরলাল বলল, নাইট ডিউটি চলেছে ডরোথির। বাড়িতে মুমু একা, আমাকে এখন উঠতে হবে। সুন্দরলালের স্ত্রীর নাম ডরোথি। ডরোথির বয়স সুন্দরলালের অর্ধেক। ত্রিশের বেশি নয়। লণ্ডনে যে বামপন্থী সংগঠনের সঙ্গে সুন্দরলাল আছে, ডরোথি সেই সংগঠনের একজন সদস্য। ছ-বছর আগে ডরোথিকে বিয়ে করেছে সুন্দরলাল

ওদের সাড়ে চার বছরের মেয়ের নাম মুমু। ফুলের মত ফুটফুটে, সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে বিনয়ের বাড়িতে একদিন এসেছিল সুন্দরলাল। সেদিন টুকাই, মুমু খুব খেলা করেছে। সোফা থেকে ওঠার সময় কোমরে হাত দিয়ে সুন্দরলাল ককিয়ে উঠল, মাই গড্ কী ব্যথা!

বয়স্ক মানুষটার জন্যে কষ্ট হল পল্লবের। তার জন্যেই এই বৃষ্টি ঠাণ্ডায় হ্যাম্পস্টেড থেকে এতটা পথ আসতে হয়েছে সুন্দরলালকে।

পাশের ঘরে খাবার টেবিল সাজিয়ে ড্রইংরুমে ঢুকে সুন্দরলালকে জয়া বলল, খেয়ে যান আপনি।

থ্যাঙ্ক ইউ, আজ নয়।

সুন্দরলাল চলে যেতে খেতে বসল সকলে। প্রতি সন্ধ্যের মত চুপচাপ, শব্দহীন খেয়ে যাচ্ছে তিনজন। নিচু চেয়ার, টেবিলে বসে কাঁটা চামচে দিয়ে টুকাই ভাত-তরকারি ঘাঁটছে। মুখে তুলছে না খাবার। করিডোরে ফোন বাজতে চমকে উঠে খাওয়া ছেড়ে ছুটে গেল জয়া। ফোনে জয়ার কথা শুনতে পাচ্ছে পল্লব। জয়া বলল, নাহ্, রিনি এখানে আসেনি।

এক মুহূর্ত চুপ থেকে জয়া বলল, সতুমামাও আসেনি। হ্যাঁ, বাড়িতে আমরা আছি। আপনি চলে আসুন। বাই।

রিসিভার রাখার শব্দ শুনল পল্লব। জয়া ফিরছে না। একটু অবাক হয়ে করিডোরের দিকে চেয়ে বিনয় হাঁক দিল, কী হল?

পা টেনে টেনে জয়াকে ঘরে ঢুকতে দেখা গেল, তার মুখ রক্তহীন, ফ্যাকাসে। চেয়ারে বসে আধগ্লাস জল এক চুমুকে খেয়ে জয়া বলল, রিনিকে পাওয়া যাচ্ছে না।

সে কি?

বিস্ময়ে চেয়ারে সোজা হয়ে বসল বিনয়।

সতুমামাও নিখোঁজ, ফিসফিস করে জয়া বলল।

আধখাওয়া মুরগির ঠ্যাং হাতে চেয়ারে প্রায় কাত হয়ে পড়েছে বিনয়। স্থির, স্তব্ধ বসে পল্লব ভাবছে, সেদিন ওদের দেখেই আমি বুঝেছিলাম কিছু ঘটবে। আরও অনেক কিছু ঘটনা আগাম টের পাচ্ছি আমি। সব ঘটবে নাকি?

জয়া, বিনয়ের দিকে আড়চোখে তাকাতে গিয়েও চোখ ঘুরিয়ে নিল পল্লব। শেষ পর্যন্ত মামার সঙ্গে।

কথাটা বলে ফোঁস করে শ্বাস ফেলল বিনয়। নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে জয়া। সে বলল, আপন নয়, পাড়াতুতো মামা।

বিনয় আবার খেতে শুরু করেছে। তার কপালে চিন্তার রেখা।

জয়া বলল, দেশে ফেরার জন্যে সতুমামা একাজ করল।

বিনয় কথা বলল না।

অল্প পরে জয়া বলল, চলো, দেশে ফিরে যাই। এ দেশে থাকতে ভয় করছে আমার।

বিনয় নিঃশব্দ। সামনে খাবারের প্লেট রেখে না খেয়ে বিনয়ের দিকে তাকিয়ে আছে জয়া। হঠাৎ সে বলল, পাগল হয়ে যাব আমি।

কাঁটা চামচে দিয়ে ভাত, মাংস ঘেঁটে চলেছে টুকাই। খাবারে তার অরুচি। বাবা, মা আজ খেয়াল করছে না দেখে টুকাই খুব খুশি। চাপা গলায় জয়া বলল, আমি পালালে তোমার খুব মজা। আমি কিন্তু ছাড়ছি না তোমাকে। থমথমে গলায় বিনয় বলল, কী বাজে বকছো। বিনয়ের কথা গায়ে না মেখে জয়া বলল, আমার অবস্থা সতুমামার মত। দেশের জন্যে বুক জ্বলে যাচ্ছে। জয়া শেষ করতে বিনয় বলল, কিন্তু আমি বাজী ধরতে পারি যে কলকাতায় গিয়ে তিনমাসের বেশি থাকতে পারবে না তুমি।

জয়ার মুখ কালো হয়ে গেল। কলকাতায় ফিরে কতদিন থাকতে পারবে, এ নিয়ে তারও সন্দেহ আছে। কলকাতার সঙ্গে মিশে আছে তার আইবুড়ো, নিঃসঙ্গ জীবনের তিক্ত স্মৃতি। বয়স বাড়ছে, শরীর ভাঙছে, বিয়ে হচ্ছে না। ঘরে, বাইরে দূর ছাই শুনে অল্প চেনা বিনয়ের কাছে লণ্ডনে চলে এসেছিল সে। দশ বছর আগে দেওয়া কথা রেখেছিল বিনয়। বিয়ে করেছিল জয়াকে। কলকাতার নরক ছেড়ে আসার সময় এমন টসটসে ভরপুর জীবনের কথা জয়া ভাবতে পারেনি। এ জীবন ছেড়ে চলে গেলে শেষ পর্যন্ত কী ঘটবে ভেবে মাঝে মাঝে ভয়ে গুটিয়ে যায় জয়া।

খাওয়া শেষ করে বিনয়, জয়ার সঙ্গে বসার ঘরে ফিরে এসেছে পল্লব। ঘরের কোণে মাথায় টুপি-পরা একপেয়ে লম্বা আলোটা জ্বলছে। ফায়ারপ্লেসের মাথায় শ্বেতপাথরের কার্নিসে ছোট ছোট লাল, সবুজ, হলুদ টবে অর্কিড, লতানে গাছ। সিলিং-এর আলো না জ্বলায় ঘরে ফিকে অন্ধকার। টিভিতে এক আফ্রিকান তরুণ, ঝকঝকে সাদা দাঁত, জবড়জঙ্গ পোশাকে নেচে নেচে গান গাইছে। গায়কের মজবুত স্বাস্থ্য, দরাজ গলা। টিভির দিকে

সংগঠিত

চোখ রেখে বিনয়, জয়া কিছু ভাবছে। এক অচেনা বিষাদ, হীনতা জড়িয়ে ধরছে পল্লবকে। সে ভাবছে, বাচার জন্যে কি খুব হ্যাংলামি করছি আমি? এই আবেদন, তম্বির, ধরাধরি, অন্যের আশ্রয়ে মৃতের মত পড়ে থেকে বাঁচার আগেই কি আমি শেষ হয়ে যাচ্ছি না? কীভাবে এত অধঃপতিত হলাম আমি? আমার হল কী?

তার মনে পড়ল, আর অল্প কিছুদিন, খুব বেশি সত্তরদিন সে বাঁচবে। সত্তরদিন পরে তেইশে মার্চ মঙ্গলবার, চব্বিশে মার্চ বুধবার, পঁচিশে মার্চ বৃহস্পতিবার। তারপর মার্চ মাস শেষ হয়ে শুরু হবে এপ্রিল। এপ্রিল মাস, ত্রিশ দিন। পুরো এপ্রিল মাস দেখার সুযোগ তার হবে কিনা সন্দেহ।
টিভিতে টাকমাথা লোকটা, যে তেহরানে চার হাজার মানুষের ভূমিকম্পে মৃত্যুর খবর দিয়েছিল, এখন খবর পড়ছে। ব্রিটেনে পশুরক্ষা সপ্তাহ চলেছে। পোষা কুকুর, বেড়ালের খাবার তৈরিতে এ-দেশে বছরে যে তেরো মিলিয়ন পাউন্ড খরচ হয়, সে খরচ পৃথিবীর সমস্ত শিশুর বাৎসরিক ব্রেকফাস্টের খরচের সমান।

বুকে চাপা অস্বস্তি নিয়ে টেলিভিশনের সংবাদপাঠককে মনে মনে পল্লব বলল, ভাই, প্রাণ বাঁচাতে আমার তিন হাজার পাউন্ড দরকার। টাকাটা না পেলে আমি মরে যাব। পোষা কুকুর, বেড়ালের জন্যে তোমাদের এত মমতা, খরচ, আমাকে বাঁচাবে না?
বিনয়, জয়া দুজনে কারও প্রতীক্ষায় টানটান বসে আছে। বিনয়ের সামনে টেবিলের ওপর গরম জলে মেশানো রাইবিনার ভর্তি গ্লাস। রক্তের মত লাল পানীয় থেকে সরু ধোঁয়া বেরচ্ছে। বক্সিং-এর আন্তর্জাতিক খেতাবের জন্যে মহম্মদ আলি, জো ফ্রেজিয়ারের লড়াই আজ রাতে মায়ামিতে হবে। খেতাবজয়ী পাবে দু-মিলিয়ন ডলার, প্রায় এক কোটি ষাট লক্ষ টাকা, বিজিত পাবে এক অর্ধেক।
টাকমাথা সংবাদপাঠকের বদলে টিভি-র পর্দায় ভেসে উঠল মহম্মদ আলি। আলির মুখে শিশুর সরল হাসি। সে হাসি দেখে মুগ্ধ পল্লব মনে মনে বিড়বিড় করল, এতো টাকা নিয়ে তুমি কী করবে আলি?

বন্ধ সদর দরজার দুটো মৃদু টোকা পড়তে জয়া উঠে গেল। সিলিং-এর আলো বিনয় জেবলে দিতে ঝলমল করে উঠল ঘর। অঞ্জলিকে দেখে চমকে গেল পল্লব। কাকের পালকের মত অঞ্জলির কুচকুচে কালো চুল রাজহাঁসের পালকের মত সাদা। অঞ্জলির মুখে বাশার, ঠোঁটে পালিশ নেই। টগবগে যৌবন অঞ্জলি কয়েক ঘণ্টায় যেন জরতী, বুড়ি হয়ে গেছে। ধপ করে সোফায় বসে অঞ্জলি বলল, বেইমান, আনগ্রেটফুল লোক। রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে স্বামীর মর্যাদা দিয়েছিলাম, সইলো না। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে অঞ্জলি বলল, কী দিতে বাকি রেখেছি? স্যাভিল রোর দর্জির তৈরি সবচেয়ে দামী স্যুট, সেরা সিগার, সব দিয়েছি, কোনও অভাব রাখিনি। চাকরি ছেড়ে পাঁচ বছর বসে আছে, আমার ঘাড়ে ভর করে খাচ্ছে, একটা কথা বলিনি। ছোকরা সেজে লোকটা তোফা কাটিয়ে দিল। মাঝখান থেকে খেটে খেটে বুড়ি হয়ে গেলাম আমি।

দু-হাতের পাতায় মাথা রেখে চুপ করল অঞ্জলি। পাঁচদিন আগের সেই জাঁদরেল, তেজী মহিলা আজ একদম কাদা হয়ে গেছে। অঞ্জলির জন্যে কষ্ট এবং সতুমামার ওপর রাগ হল পল্লবের। লোকটার কোনও আক্কেল নেই। জয়ার মুখে পল্লবের অসুখের বিবরণ শুনে পাকিস্তানী দোকানের মাছের খোঁজ করলেও এ বাড়িতে কয়েকবার আসা-যাওয়ার পর রুগ্ন পল্লবের মুখ দেখে হয়ত করুণা হত অঞ্জলির। পল্লবকে বাঁচাতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত সে। এখন পল্লবের জন্যে অঞ্জলি আর কিছু করবে না। জীবন্ত এক সম্ভাবনা মাঠে মারা যেতে পল্লব কষ্ট পেল। অঞ্জলিকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে জয়া বলল, আমার ধারণা সতুমামা ফিরে আসবে।

সে আমি জানি, অঞ্জলি বলল, তার সুখের শরীর। দামী পোশাক, সিগার, ভাল খাবার, পকেটে টান পড়লেই সুড়সুড় করে হাজির হবে সে। দেশের জন্যে আদিখ্যেতা লাটে উঠবে।

রুমালে মুখ মুছে অঞ্জলি বলল, কিন্তু এ স্ক্যাণ্ডাল, নোংরামি জানাজানি হলে ঢি ঢি পড়ে যাবে। আমার একটা সামাজিক মর্যাদা আছে।

একটু বসুন, চা খান।

জয়ার অনুরোধে অঞ্জলি বলল, নাহ্, রাতে গাড়ি চালানো অভ্যেস নেই আমার। জেদের বশে চলে এসেছি। এখনই ফিরতে হবে।

এক সেকেণ্ড থেমে অঞ্জলি বলল, লোকটা না ফেরা পর্যন্ত গাড়ি চালানো

নিয়েও ঝামেলা হবে।

অঞ্জলিকে গাড়িতে তুলে বিনয়, জয়া ঘরে এসে সোফায় বসল।

পল্লব ঠিক করল, কাল সে সুন্দরলালের বাড়ি চলে যাবে। দিন ফুরিয়ে আসছে, আর দেরি করা যায় না। গা ঝাড়া দিয়ে শেষবার দাঁড়াতে চেষ্টা করবে সে।

হ্যাম্পস্টেড হিলের গায়ে বনু-বেরি রোডে পুরনো, ছোট একটা দোতলা বাড়ির একতলার ফ্ল্যাটে সুন্দরলাল থাকে। ফ্ল্যাটে দুটো ঘর, রান্নাঘর, বাড়ির পেছনে বাগানে টয়লেট, স্নানের ঘর নেই। ডরোথি, মুমুকে নিয়ে সুন্দরলালের সংসার। অস্ট্রেলিয়ার মেয়ে ডরোথি কাজের খোঁজে লণ্ডনে এসে এখানে থেকে গেছে। ওর বাবা, মা, ভাই, বোন অস্ট্রেলিয়ায় থাকে। তিরিশ পেরলেও চাপা, টলটলে লাবণ্যের জন্যে পঁচিশের বেশি মনে হয় না। ডরোথিকে। ছবিতে দেখা কুমারী মেরীর মত ডরোথির গোল মুখে স্নেহ, করুণা, দু-চোখের তারায় বুদ্ধির দীপ্তি। সুন্দরলালের পাশে ডরোথিকে মেয়ে বলে বলে হয়। মনে হওয়া আশ্চর্য নয়। ঠিক সময়ে সুন্দরলাল বিয়ে করলে তার মেয়ের বয়স ডরোথির চেয়ে হয়ত একটু বেশি হত। কিন্তু এ নিয়ে সুন্দরলাল, ডরোথির কোনও মাথাব্যথা নেই। এ'দেশে এরকম বিয়ে আকছার হয়। সুন্দরলাল বেকার, চাকরি নেই, চাকরি করার ইচ্ছেও নেই তার। বেকার ভাতা যা পায়, তা খুব কম নয়। ফ্লিট স্ট্রিটে একটা সংবাদপত্রের অফিসে চাকরি করে ডরোথি। ওদের সংসারে অভাব নেই, প্রাচুর্যও নেই, শান্তি আছে। আপেলের মত গাল, টুকটুকে লাল পাতলা ঠোঁট, নীল চোখ, সোনালী কোঁকড়া চুল, সাড়ে চার বছরের মুমুর রূপ যেন ফেটে পড়ছে। পাড়ার এক নার্সারী স্কুলে ছ-মাস হল মুমু ভর্তি হয়েছে। চব্বিশ ঘণ্টায় পল্লবের সঙ্গে মুমুর বন্ধুত্ব হয়ে গেল। টুকাইকে দেখে যেমন হয়েছিল, মুমুকে দেখেও তাই হল। বাড়ির কথা বুবাই, ফুলির দুটো কচি মুখ তোলপাড় করল তার স্মৃতি। ফুলির কথা ভেবেই বেশি কষ্ট হল পল্লবের। সে মারা গেলে আট বছরের বুবাই হয়ত ভবিষ্যতে স্মৃতি হাতড়ে বাবার আবছা মুখ মনে আনতে পারবে। দেড় বছরের ফুলি পারবে না। তার স্মৃতিতে কোনও ছাপ থাকবে না বাবার। শুধু দু-অক্ষরের ধোঁয়াটে

বাবা শব্দে সে বেঁচে থাকবে মেয়ের কাছে। তাছাড়া বাবার দায়িত্ব পালনের সুযোগও সে পেল না। ছেলেমেয়েকে মানুষ করার, তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা না করে শরীরে কালরোগ থাকতেও সে বিয়ে করল কেন? বড় হয়ে বুবাই, ফুলি তাদের বাবাকে হয়ত স্বার্থপর, হৃদয়হীন ভাববে। মৃত বাবার বিরুদ্ধে সারাজীবন ক্ষোভ, অভিমান পুষে রাখবে মনে। অনিতা বেঁচে থাকবে। সে হয়ত ছেলেমেয়েকে বলবে যে, যে কোনও সুস্থ মানুষের চেয়ে তাদের বাবা গুণে, মাপে অনেক বড় ছিল। যতদিন বেঁচে ছিল, জেনেশুনে কোন অন্যায় করেনি।

কাকে যেন ফোন করে রিসিভার রেখে সুন্দরলাল বলল, ছুটি শেষ করে কাল আমার জি পি ডাক্তার উইলিয়াম স্মিথ সার্জারিতে ফিরছে। ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান স্মিথ ভারতীয় ডাক্তারদের মত ভীতু নয়, সাহস আছে তার। স্মিথের কাছে গেলে আমার বিশ্বাস, সে তোমাকে পেশেন্ট করে নেবে। তা যদি হয়, সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসার সব সুযোগ তুমি পাবে।

এক মুহূর্ত চুপ থেকে সুন্দরলাল বলল, মহারানীর কাছে তোমার আবেদনপত্র আজ পাঠিয়ে দিয়েছি।

কাগজে তামাক পাকিয়ে সিগারেট ধরালো সুন্দরলাল। মন দিয়ে সুন্দর-লালের কথা শুনে শান্ত হেসে ডরোথি বলল, একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

নির্ভরতা, আশ্বাসের মোহময় কথা শুনে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় পল্লবের। কিন্তু, গত একমাস মেঘ, বৃষ্টি, তুষার, কুয়াশার সঙ্গে হতাশা, অবিশ্বাসে ছেয়ে গেছে তার মন। উৎসাহ, উদ্যোগ একঝলক রোদের মত বারবার উঁকি মেরে হারিয়ে যাচ্ছে। চাপ, টেনশনে পল্লব যেন গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। জি পি খুঁজতে নব্বই দিনের পঁচিশ দিন কেটে গেল। জি পি মেলেনি। তিনমাস শেষ হতে আর পঁয়ষট্টি দিন বাকি। হয়ত তার আগে দুশ্চিন্তা, উদ্বেগে সে মারা যাবে। কিন্তু যতক্ষণ বেঁচে আছে, মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়াই করবে সে। হাল ছাড়বে না। হাঁটুর তলা পর্যন্ত ঢাকা চামড়ার জুতো, ওভার-কোট চাপিয়ে এ হপ্তার শেষ নাইট ডিউটি করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল ডরোথি। সারাদিন মেঘ, বৃষ্টির পর শেষ বিকেলে হঠাৎ একঝলক ম্যাড়মেড়ে আলো ফুটেছে আকাশে। পাশের ঘরে মুমু ঘুমোচ্ছে।

একটা বিশাল পিয়ানো, বিস্তর বই, আসবাবে ঠাসা সুন্দরলালের বসার ঘরে সাতদিন হয়ে গেল পল্লব এসেছে। পিয়ানো খুব ভাল বাজায় ডরোথি।

সুন্দরলালও বাজাতে পারে। কোনও এক ছুটির দিনে, ডরোথি কথা দিয়েছে, পিয়ানো শোনাবে পল্লবকে। ঘরের দেওয়ালে গাঁথা ফায়ার প্লেসে বেলচা ভরে কয়লা দিল সুন্দরলাল। পুরনো এ বাড়ির সব ব্যবস্থাই প্রাচীন। ফায়ার প্লেসের সামনে মান্ধাতা আমলের রঙজ্বলা কার্পেটের ওপর কয়লার গুঁড়ো জমে আছে। কয়লার আগুন ছাড়াও এ ঘরে রাতে একটা প্যারাফিন হিটার জেবলে দেয় সুন্দরলাল। দরজা, জানলা বন্ধ ঘরের বাতাস কেরোসিনের গন্ধে ভারী হয়ে আছে। জানলার কাঠের ফ্রেম আর দেওয়ালের জোড় খুলে ঘরের রাস্তার দিকের জানলাটা আলগা হয়ে গেছে। ফ্রেম আর দেওয়ালের ফাটল সেলোটেপ মেরে ঢাকার চেষ্টা হলেও দুরন্ত হাওয়া সেলোটেপ ফুঁড়ে ঘরে ঢোকে। তাই দুটো হিটার জেবলেও ঘর গরম থাকে না। রাত বাড়ার সঙ্গে ঘরের ঠাণ্ডা বেড়ে যায়।

রাস্তার আলো জ্বলেছে একটু আগে। সুন্দরলাল বলল, চল, বিয়ার খেয়ে আসি।

হ্যাম্পস্টেড হিলের নির্জন, বিরাট বাগান, প্রান্তরের পাশে সাজানো গোছানো হোয়াইট হর্স পাব। সুন্দরলালের বাড়ি থেকে পাব দু-মিনিটের পথ। পাবে লাউঞ্জ, সেলুন দুটো ভাগ আছে। কাউন্টার থেকে এক পাঁইট বিয়ার, এক পাঁইট ল্যাগার লাইম নিয়ে পাবের সেলুনে মুখোমুখি দুটো চেয়ারে সুন্দরলাল, পল্লব বসল। শরীর এলিয়ে মেজাজী বসার ভঙ্গি সুন্দরলালের। কাউন্টারের উল্টোদিকে লালবৃত্ত আঁকা একটা কাঠের বোর্ড। লাল বৃত্তগুলো বড় থেকে ক্রমশ চোখের মণির মত ছোট হয়েছে। রঙবেরঙের পালক আঁটা ছোট ছোট তীর নিয়ে তিনজন তরুণ বোর্ডের কয়েক হাত দূর থেকে লক্ষ্যভেদ চর্চা করছে। চোখের মণির মত সবচেয়ে ছোট বৃত্তে বিঁধতে হবে তীর। সেলুনের বাতাসে পাক খাচ্ছে সিগারেট, চুরুটের ধোঁয়ার কুণ্ডলী। পুরনো দিনের কথা বলছে সুন্দরলাল। ষাট বছর আগে যে দেশে জন্মেছিল, সুন্দরলালের কাছে সে ভারতবর্ষ আজ সুদূর। সুন্দরলাল বলল, তোমার বয়সে এ-দেশে এসেছিলাম আমি। দেখতে দেখতে আটাশ বছর হয়ে গেল। অথচ দেশের কথা ভুলতে পারি না, সেখানে ভাল, মন্দ কিছু হলে ভারী উদ্বেগ বোধ করি।

বিয়ার মাগে লম্বা চুমুক দিয়ে সুন্দরলাল বলল, উনিশশ আটচল্লিশে কম্যুনিস্ট

পার্টি যখন নিষিদ্ধ হল, আমি তখন পার্টির পুরো সময়ের কর্মী, হোলটাইমার। ছেচল্লিশ সালেই পাঞ্জাব ছেড়ে অন্ধ্রের তেলেঙ্গানায় চলে গিয়েছিলাম। কাঁধে বন্দুক নিয়ে তখন চোরের মত পালিয়ে বেড়াচ্ছি। নেহরু সরকারের কাছে নতি স্বীকার করল পার্টি। পার্টির কাছ থেকে বন্দুক জমা দিয়ে সারেন্ডার করার নির্দেশ পেলাম। আমার মত অনেক বন্দুকধারীর মাথা সে নির্দেশ শুনে গরম হয়ে গেল। পার্টির হুকুম অমান্য করে নেতাদের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিলাম আমরা। পার্টি নেতৃত্ব ট্রটস্কিপন্থী ছাপ মেরে দিল আমাদের নামে। পার্টি-বিরোধী ট্রটস্কিপন্থীদের নেহরু সরকার গুলি করে মারার হুকুম দিল পুলিসকে।

সুন্দরলাল থামল। সিগারেট পাকিয়ে ঠোঁটে গুঁজে আগুন দিল। ধোঁয়া ছেড়ে বিয়ার-মাগ বোঝাই নতুন পাইটের ফেনার দিকে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, সাংঘাতিক জেদী ছিলাম আমি। প্রতিজ্ঞা ছিল আত্মসমর্পণ করব না, নো সারেন্ডার। আমার বিবেক, শহিদ কমরেডদের মুখ, আঁকড়ে ছিল আমাকে। কী করে তাদের ভুলি? তাদের কি ভোলা যায়? বন্দুক লুকিয়ে রেখে গা ঢাকা দিলাম। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বোম্বেতে আত্মগোপন করে বছর দেড়েক থাকার পর নাম ভাঁড়িয়ে বিলেতের জাহাজে চেপে বসলাম একদিন।

গোলাপী ফুলতোলা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে সুন্দরলাল যেন জাহাজ দেখছে। আটাশ বছর আগের একটি দিনের স্মৃতি কুয়াশার মত তার দু-চোখের জমিতে ঝুলে আছে।

একচুমুক বিয়ার খেয়ে সুন্দরলাল বলল, দেশে ফেরার কথা কত ভেবেছি, পারিনি। মাঝে মাঝে মনে হয়, একজন কম্যুনিস্টের আবার দেশ কি? যতদূর আকাশ, যতদূর মাটি, গোটা পৃথিবী তার দেশ, মাতৃভূমি। সে আন্তর্জাতিক। এ কথা হয়ত তত্ত্ব হিসেবে ঠিক, কিন্তু পাঞ্জাবের জলন্ধর জেলার ছোট একটা গ্রাম; মানুষদের যে ভুলতে পারি না। লণ্ডনের রাস্তায়, ফুলের দোকানে হঠাৎ দেশী ফুলের গন্ধ পেলে শরীর অবশ হয়ে যায়। এর নামই বোধহয়, ডায়ালেকটিক্স।

দুম করে কথা থামিয়ে সুন্দরলাল প্রশ্ন করল, তোমায় কি বোর করছি? বিরক্ত হচ্ছো?

নাহ্, পল্লব বলল।

এখন মনে হয়, দেশ ছেড়ে আসা ভুল হয়েছিল। ভুল শোধরাবার আর সময় নেই। বুড়ো হয়ে গেছি।

প্রথম পাইট তাড়াতাড়ি খেলেও দ্বিতীয়টা সময় নিয়ে, ধীরে ধীরে খাচ্ছে সুন্দরলাল। প্রতি চুমুকের মাঝখানে অনেকটা সময় কিছু ভাবছে। রাস্তার দিকে বিশাল কাঁচ ঢাকা পাবের দেওয়ালে দু-পা তোলা ঘাড় বাঁকানো, গলায় কেশর, একটা তেজী ঘোড়ার ছবি। পোড়ামাটি রঙ-এর ঘোড়া। কাঁচের দেওয়ালের ওপর, ঘোড়ার মাথার কাছে জোরালো একটা সার্চ লাইট দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলছে, নিভছে। আলো, জ্বলা-নেভার সঙ্গে তাল রেখে পাবের বিশাল কাঁচ যেন গলে যাচ্ছে। গলে যাওয়া কাঁচের ফ্রেম থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছে পোড়ামাটি রঙ, তেজী উদ্ধত সেই ঘোড়া।

বাত, হাঁপানি, ডায়াবিটিস এবং আরও নানা রোগে সুন্দরলাল ভুগছে। এই শীতে গাঁটে গাঁটে বাতের ব্যথায় সে কষ্ট পাচ্ছে। আচমকা নড়াচড়া করতে গিয়ে প্রায়ই যন্ত্রণায় সে ককিয়ে ওঠে। কিন্তু সুন্দরলালের মনের জোর, উদ্দীপনা সীমাহীন। নর্থ গোয়ার স্ট্রিট ডাঃ স্মিথের সঙ্গে পাঁচটায় দেখা করার জন্যে সাড়ে চারটের আগেই সুন্দরলাল ফিটফাট, তৈরী। তাকে ওভার-কোট পরতে সাহায্য করল পল্লব। বিনয়ের ভারী ওভারকোট রয়েছে পল্লবের গায়ে।

বুর্বোর রোড থেকে বাসে নর্থ গোয়ার স্ট্রিট পেঁছিতে দশ মিনিট লাগে। কিন্তু একটু আগেভাগে সাড়ে চারটেতে পল্লবকে নিয়ে বাসস্টপে এসে দাঁড়াল সুন্দরলাল। ওরা দুজন ছাড়া বাসস্টপে লোক নেই। ইস্টহ্যাম যেমন মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত, গরিব, বিশেষ করে বাংলাদেশী আর বাঙালীদের পাড়া, হ্যাম্পস্টেড সেরকম নয়। এ হল অভিজাত, ধনী খাস ইংরেজ এলাকা। গাড়ির মসৃণ শব্দ ছাড়া এ পাড়ায় বিশেষ কোন আওয়াজ নেই। ভারী নিস্তব্ধ, ছিমছাম এ অঞ্চল। বাসস্টপে দাঁড়িয়ে সুন্দরলাল বলল, স্মিথকে দিয়ে কাজ না হলে আমার মাথায় এক মোক্ষম চাল আছে। সেটা চালাব।

দু-চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে পল্লব চোখ তুলতে সুন্দরলাল বলল, এখনই সে

চালের কথা বলব না তোমাকে।

কুয়াশা না থাকলেও ঘন মেঘে ঢাকা পৃথিবী ঝিম মেরে আছে। এক নজর আকাশ দেখে সুন্দরলাল বলল, বরফ পড়বে।

বাস ধরে পাঁচটা বাজার দশ মিনিট আগে স্মিথের সার্জারিতে সুন্দরলালের সঙ্গে পল্লব পেঁছে গেল। সার্জারিতে রোগী বোঝাই। বেশিরভাগ কালো, আফ্রিকান, দু-তিনজন সাদা পেশেন্টও বসে আছে। বসার জায়গা না থাকায় দাঁড়িয়ে আছে চার-পাঁচজন রোগী। ঘরে ঢুকেই পল্লবকে দেখিয়ে হার্টের রোগী, হার্টের রোগীকে একটু বসতে দিন, বলে হইচই জুড়ে দিল সুন্দরলাল।

একজন জায়গা ছেড়ে দিতে সসংকোচে সেখানে বসল পল্লব। খুব লজ্জা করছে তার। কিন্তু বাস রাস্তা থেকে সার্জারি পর্যন্ত এক ফার্লং হেঁটে তার দাঁড়াবার শক্তি নেই, শ্বাসকষ্টে কণ্ঠনালী, বুক ফেটে যাচ্ছে। পল্লব মুখে কিছু না বললেও, তার কষ্ট টের পেয়েছে সুন্দরলাল। শরীরে কষ্টের সঙ্গে, স্মিথের সঙ্গে দেখা করার তীব্র উত্তেজনাতেও ধড়ফড় করছে পল্লবের বুক। চেয়ারে বসে পল্লব ভাবছে, কী হবে স্মিথ কি রোগী করবে আমাকে? নিশ্চয়ই করবে। আফ্রিকানরা খুব সাহসী। ইংরেজদের সঙ্গে তাল ঠুকে এ-দেশে তারাই সমান মর্যাদায় বেঁচে আছে। কালোদের সঙ্গে বেয়াদপি করে সাদারা এঁটে উঠতে পারে না। তাছাড়া ডাক্তার স্মিথ শুধু চিকিৎসক নয়, সমাজসেবী হিসেবে এ শহরে তার সুনাম আছে। জনসেবার নানা প্রতিষ্ঠানে জড়িয়ে আছে স্মিথ।

গত কয়েকদিনে সুন্দরলালের মুখ থেকে স্মিথ সম্পর্কে নানা তথ্য জেনেছে পল্লব। না দেখেও স্মিথের চেহারা, চরিত্রের একটা ধারণা পল্লব করেছে। স্মিথের ওপর আস্থা, ভরসা গড়ে উঠেছে পল্লবের মনে। ভরসার সঙ্গে ভয়ও আছে। তাকে রোগী করতে স্মিথ রাজি না হলে, কী হবে? সার্জারিতে বসে উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা পল্লবের হৃৎপিণ্ড ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দ্রুত দুলতে থাকে। পল্লবকে বসিয়ে রেখে সার্জারির পেছনের দরজা দিয়ে স্মিথের রোগী দেখার ঘরে ঢুকেছে সুন্দরলাল। বসার ঘরে প্রতীক্ষায় থাকা রোগীরা পল্লবকে দেখছে। আড়চোখে নজর করে পল্লব বুঝল, যারা বসে আছে, সকলে রোগী নয়, রোগীদের আত্মীয়, বন্ধুও কয়েকজন আছে। কিন্তু স্বাস্থ্যবান, হাসিখুশি মানুষগুলোকে দেখে কে রোগী কে নয়, বুঝতে পারল

না পল্লব। রোগী, নীরোগ, সকলে সমান তাজা, উজ্জ্বল। এ জটলায় পল্লবকে দেখেই ধরা যায় যে, সে অসুস্থ, রোগী, তার হৃৎপিণ্ড ফেঁসে গেছে। পল্লবের মত অসুস্থ কেউ এঘরে থাকলেও পল্লবের মত সে অসহায়, অবাঞ্ছিত বেওয়ারিশ নয়। তার হৃৎপিণ্ড ফেঁসে গিয়ে শ্বাসকষ্ট হলেও তার হাতে তিন মাস সময়, মাথায় তিন হাজার পাউণ্ডের বোঝা নেই। ছ-হাজার মাইল দূরে দুই নাবালক, অনাথ শিশু আর বউ রেখে সে এখানে আসেনি। টাকার অভাবে বিনা চিকিৎসায় মরার ভয়ে সারাক্ষণ সে কাঁপছে না। তার রোগ, তার জীবনেরই অংশ। ফলে সে নির্ভয়, হাসিখুশি, মুখ দেখে তাকে রুগ্ন ভাবার উপায় নেই।

পল্লব ভাবল, আমি শুধু জলে পড়েছি। জল নয়, সমুদ্র, ঠিকানাহীন অকূল সমুদ্রে আমি ভেসে যাচ্ছি।

স্মিথের ঘর থেকে একজন বেরতেই দরজার ফাঁক দিয়ে পল্লবকে ডাকল সুন্দরলাল। চেয়ার থেকে উঠে মাথা নিচু করে স্মিথের কামরাতে ঢুকল পল্লব। ছ-ফুট লম্বা, দশাসই চেহারা, হাল্কা সবুজ সার্জের স্যুট পরা স্মিথ হাসিমুখে পল্লবের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, হ্যালো!

কালো মানুষটার উষ্ণ, বড় পাঞ্জার মধ্যে হাত রাখতে পল্লবের কব্জি পর্যন্ত ডুবে গেল। দু-চোখে তিরতির হাসি, পুরু, কালো ঠোঁটের তলায় দু-পাটি নিখুঁত, ঝকঝকে সাদা দাঁত ডাক্তার প্রশ্ন করল, তোমার কী হয়েছে?

ডাক্তারের হাসি, ভরাট গলার কথার শব্দে গমগম করছে ছোট ঘর। সাদা চাদর পাতা, গদি মোড়া উঁচু বিছানায় শুয়ে পল্লব তার অসুখের কাহিনী সংক্ষেপে বলল স্মিথকে। কয়েকটা সরু রেখা স্মিথের কপালে জেগে মিলিয়ে গেল। পল্লবের বুকে স্টেথো লাগিয়ে গভীর মনোযোগে তার বুকের শব্দ শুনছে স্মিথ। কালো পশমের স্প্রিং-এর মত চুল, স্মিথের বড়, চৌকো মাথা পল্লবের ঠিক নাকের ওপর। পল্লবের সঙ্গে চোখাচোখি হতে ডাক্তার একটা চোখ টিপলো। পরীক্ষা শেষ করে নিজের জায়গায় ফিরে টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা সাদা কার্ড বার করল স্মিথ। কার্ডের মাথায় ছাপা হরফে লেখা, ন্যাশনাল হেলথ্ সার্ভিস, শব্দ তিনটে পড়তে পারল পল্লব। কার্ডে পল্লবের নাম, ঠিকানা লিখছে স্মিথ। কু ঝিকঝিক, কু ঝিকঝিক, ট্রেনের হুইসিল বাজছে পল্লবের বুকে। এই একটুকরো অমূল্য কাগজের জন্যে গত ত্রিশ দিন অপেক্ষা করছে পল্লব। স্মিথের কলমের আঁচড়ে ভরে ওঠা কার্ডের

দিকে তাকিয়ে চোখ বুজল পল্লব।

কার্ড তৈরি করে নিজের লেটারহেডে ঘসঘস করে একটা চিঠি লিখে খামে ভরে পল্লবের হাতে দিয়ে স্মিথ বলল, চিঠি লিখে দিলাম মিঃ কলিন্সকে। কাল অথবা পরশু গাইজ হাসপাতালে গিয়ে কলিন্সের সঙ্গে দেখা করে এ চিঠি তাকে দেবে। যা ব্যবস্থা করার তিনি করবেন।

চিঠি, কার্ড নিয়ে পল্লব ঘর ছেড়ে বেরোবার আগে তার কাঁধে হাত রেখে স্মিথ বলল, ভয় পেও না, টেক ইট ইজি, সব ঠিক হয়ে যাবে।

নিষ্পাপ গোরিলার মত স্মিথের বিরাট, চৌকো মুখের ডানপাশে টেবিল ল্যাম্পের আলো পড়েছে। কৃতজ্ঞ চোখে স্মিথের দিকে তাকিয়ে সুন্দরলালের সঙ্গে পল্লব ঘরের বাইরে এল। ন্যাশনাল হেলথের সাদা কার্ড, কলিন্সকে লেখা স্মিথের চিঠি হাতে পেয়ে পল্লবের মনে হল, সে দিগ্বিজয় করেছে। নর্থ গোয়ার স্ট্রিট ছেড়ে গোয়ার স্ট্রিট ধরে ইউস্টনের দিকে সুন্দরলাল, পল্লব পাশাপাশি হাঁটছে। স্মিথের কাছে যেন জীবনের চাবি পেয়ে গেছে পল্লব। হাঁটতে কষ্ট হলেও গায়ে মাখছে না সে। ইউস্টনে অসীম রায়ের তাজমহল রেস্টুরেণ্টে পল্লব এখন যাবে। দরকারী কি কথা বলার জন্যে অসীম গতকাল সুন্দরলালের বাড়িতে ফোন করেছিল পল্লবকে। বিনয়ের কাছ থেকে সুন্দরলালের ফোন নাম্বার যোগাড় করেছিল অসীম। নর্থ গোয়ার স্ট্রিট স্মিথের সঙ্গে পাঁচটায় পল্লব দেখা করবে শুনে অসীম বলেছিল, ওখান থেকে আমার রেস্টুরেণ্ট পায়ে হেঁটে পাঁচ মিনিট। চলে আসুন।

রাজি হয়েছিল পল্লব। অসীমের সঙ্গে সুন্দরলালের আলাপ না থাকলেও তাজমহল রেস্টুরেণ্ট সে চেনে। তাজমহলের ভারতীয় খাবারের সুনাম আছে। ডরোথি, মুমুকে নিয়ে সুন্দরলাল দু-তিনবার তাজমহলে খেয়েছে। গোয়ার স্ট্রিট ধরে হাঁটতে হাঁটতে সুন্দরলাল বলল, এতদিনে তোমার চিকিৎসার একটা হিল্লে হল।

রাস্তার হলুদ আলো জ্বলে উঠেছে। সাঁ-সাঁ করে ছুটে যাচ্ছে গাড়ি। ঝিম-লাগা আবহাওয়া বদলে গিয়ে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। এখনই হয়ত বরফ পড়বে না। ইউস্টন এলাকা হল ক্ষুদে ভারতবর্ষ। এখানে অনেক ভারতীয়, মুদি, মিষ্টি, শাড়ি, সব্জির অনেক ভারতীয় দোকান। সব্জি দোকানের কাঁচের জানলা দিয়ে বেগুন, পটল, কুমড়ো, এমনকি উচ্ছেও দেখল পল্লব। সুন্দরলাল বলল, এসব তরিতরকারির গন্ধ নাকে ঢুকলে হোমসিক,

গৃহকাতর হয়ে পড়ি আমি।

পল্লব কথা বলল না। তার স্মৃতি, চেতনাও টালমাটাল। স্মিথের কাছ থেকে সাদা কার্ড পেয়ে আনন্দের সঙ্গে আবছা সন্দেহ, বিষাদ জেগেছে তার মনে। সহজে কার্ডটা পেয়ে, এ কার্ডে কাজ কতটা হবে, পল্লব ভাবছে।

সুন্দরলাল বলল, রোজগারের একটা পথ পেলে ভারতবর্ষে ফিরে যেতাম আমি। এদেশে থাকলে, আমি জানি, আমার বাত, হাঁপানি কখনও সারবে না। আমার দরকার ট্রপিকাল দেশের রোদ, নীল আকাশ। কন্যাকুমারিকা বা কোবালামের সমুদ্রের ধারে বাকি জীবন যদি কাটাতে পারতাম।

পল্লব কী বলবে, ভেবে পেল না। নিজের মনে সুন্দরলাল বলল, এই ভিজে, স্যাঁতসেঁতে শীতের দেশ ছেড়ে আমার আর ভারতে ফেরা হবে না। এখানেই মাটির তলায় শুয়ে থাকতে হবে আমাকে।

অর্ধেক রাস্তা হেঁটে হাঁপিয়ে যেতে পল্লবের মনে হল, পথ যেন ফুরোবে না। তার হৃৎপিণ্ড ধরে কেউ এমন ঝাঁকাচ্ছে যে ফুসফুসে না পৌঁছে গলায় আটকে যাচ্ছে বাতাস। কাশির চাপে গলা খুসখুস করছে। পঁচিশ, ত্রিশ গজ দূর থেকে তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিয়ন সাইন দেখে পল্লব দাঁড়িয়ে পড়ল। তার শরীরের অবস্থা টের পেয়ে সুন্দরলালও দাঁড়াল। আকাশের দিকে হাঁ-মুখ তুলে কয়েকবার জোরে শ্বাস টানল পল্লব। মাথা ঝিমঝিম করছে। তবু আবার পা বাড়াল রেস্টুরেন্টের দিকে।

তাজমহল রেস্টুরেন্টে ঢুকে চোখ ধেঁধে গেল পল্লবের। গদিমোড়া চেয়ার টেবিল, সোফা, কার্পেট, ঝাড়লণ্ঠনে সুসজ্জিত এরকম রেস্টুরেন্ট পল্লব আগে দেখেনি। জানলায় দামী ভেলভেটের পর্দা, চমৎকার ওয়ালপেপার লাগানো দেওয়ালে খাজুরাহোর আয়না হাতে নারীর পাথরে তৈরি স্থাপত্য, কালীঘাটের পট, ব্রোঞ্জের বুদ্ধমূর্তি। চাপা, নরম আলোয় তাজমহলের ভেতরটা মায়াবী হয়ে আছে। দু-তিনজন খদ্দের বসে খাচ্ছে। রেস্টুরেন্ট প্রায় খালি। ভিড়ের সময় এখনও হয়নি। রেস্টুরেন্টের কোণে একটা সোফায় বসে অসীম সিগারেট টানছিল। পল্লবকে দেখে হাসিমুখে এগিয়ে এল সে। মাঝখানে টেবিল, মুখোমুখি দুটো সোফায় তিনজন বসল। সুন্দরলালের সঙ্গে অসীমকে পরিচয় করিয়ে দিল পল্লব।

দারুণ সাজিয়েছেন। আপনার রুচি আছে।

পল্লবের প্রশংসা শুনে অসীম বলল, পকেটে মাত্র সাড়ে তিন পাউন্ড আর হাতে একটা সুটকেশ নিয়ে এদেশে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে এসেছিলাম। পড়তে পড়তেই মনে হল, কেন এই লেখাপড়া ? নিজের প্রশ্নের জবাবও নিজে দিলাম, টাকা রোজগারই একমাত্র লক্ষ্য। যদি তাই হয় তাহলে বেশি টাকা রোজগার করা ভাল। টাকা রোজগারের জন্যে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার দরকার নেই। লেখাপড়া ছেড়ে শুরু করলাম ব্যবসা। নানা ঘাটে ঘুরে শেষ পর্যন্ত রেস্টুরেন্টে নোঙর ফেলেছি।

অসীম আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। তাকে থামাতে সুন্দরলাল বলল, উফ্, কী বাজে আবহাওয়া।

কোনও আলোচনায় প্রসঙ্গ বদলাতে হলে ইংরেজরা আবহাওয়ার কথা তোলে। বিষয় বদলের এটা সাহেবী কায়দা। যে কথা বলছিল, ইঙ্গিত বুঝে সে থেমে যায়, অথবা অন্য কথা শুরু করে। অসীম বুদ্ধিমান। সে বলল, এত খারাপ শীত গত পাঁচ বছর দেখিনি

ব্লাডি কোল্ড অ্যান্ড ড্রাফ্‌ট, শেষ করে দিল আমাকে।

সুন্দরলাল বিড়বিড় করতে তাকে এক লহমা দেখে পল্লবকে অসীম প্রশ্ন করল, কেমন আছেন ? কবে ভর্তি হচ্ছেন হাসপাতালে ?

পল্লবের সমস্যা, সংকট অসীম জানে না। পল্লব বলল, ঠিক নেই।

সুন্দরলালের সঙ্গে গল্প জমে গেছে অসীম। ইংল্যান্ডের অর্থনীতি এবং এদেশের অশ্বেত যারা, তাদের সম্পর্কে ওরা আলোচনা করছে। সুন্দরলাল, অসীমের মধ্যে মতের মিল আছে, পল্লব বুঝতে পারল।

কলিন্সকে লেখা স্মিথের চিঠি পল্লব পড়েছে। পল্লবের গুরুতর অসুস্থতার কথা জানিয়ে তাকে তাড়াতাড়ি অপারেশন করার অনুরোধ জানিয়েছে স্মিথ। আন্তরিক, অকপট চিঠি। কিন্তু এ চিঠিতে কতটা কাজ হবে, পল্লব জানে না। তার শরীরের হাল স্মিথের চেয়ে কলিন্স ভাল জানেন। কলিন্সও সহৃদয় মানুষ। কিন্তু হাসপাতালে ভর্তির নিয়মকানুন ভেঙে তিনি কিছু করবেন না। ওয়েটিং লিস্টে যারা অপেক্ষায় আছে, হাসপাতালে ভর্তির সুযোগ আগে পাবে তারা। সে তালিকায় পল্লব নেই।

সুন্দরলালের সঙ্গে কথার ফাঁকে পল্লবকে অসীম বলল, আপনার জন্যে

একটা চমক আছে।

কী চমক না বুঝে অসীমের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে পল্লব চেয়ে থাকল। অসীম বলল, একটু অপেক্ষা করলে জানতে পারবেন।

চমক, ধাঁধা, হেঁয়ালি শুনলে অসুস্থ পল্লব বিপন্ন বোধ করে। তার শ্বাস-কষ্ট হয়। অসীমের কথা, রহস্যময় হাসিতে পল্লবের বুক হাঁসফাঁস করছে। এক সেকেণ্ড তাকে দেখে কিছু অনুমান করে অসীমকে সুন্দরলাল প্রশ্ন করল, ব্যাপার কী?

শান্তাকে চেনেন?

মুচকি হেসে অসীম প্রশ্ন করতে সোফায় সোজা হয়ে বসল পল্লব। স্মৃতির ভাঁড়ারে অসংখ্য নাম, মুখের মধ্যে শান্তাকে পল্লব খুঁজে বার করতে চাইল।

আপনার ক্লাসমেট, সহপাঠিনী, অসীম বলল।

বিদ্যুৎ চমকের মত শান্তাকে মনে পড়ল পল্লবের।

চিনতে পারছেন?

অসীম প্রশ্ন করতে পল্লব বলল, হ্যাঁ।

শান্তাকে আমি অনেকদিন চিনি, অসীম বলল, কলকাতায় থাকতে স্নিগ্ধার বন্ধু ছিল শান্তা। এখানে আবার যোগাযোগ হল। কাল বিকেলে শান্তা এখানে এসেছিল। কথার মধ্যে আপনার নাম উঠতে শান্তা চিনল আপনাকে। শুধু চেনা নয়; খুব গুণগান করল আপনার। আপনার স্ত্রীর নাম বোধহয় অনিতা। শান্তা তাঁকেও চেনে।

হাতঘড়ি দেখে অসীম বলল, আপনার সঙ্গে দেখা করতে দশ মিনিটের মধ্যে, ঠিক সাড়ে ছ-টায় শান্তা এখানে আসবে।

রেস্টুরেন্টের উর্দিপরা এক কর্মচারী তিন কাপ কফি দিয়ে গেল টেবিলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু রোগা, ফর্সা, নরম স্বভাবের একটা মেয়ের মুখ পল্লবের মাথায় ভেসে উঠেছে। শান্তার সঙ্গে আরও একঝাঁক মেয়ে, কয়েক-জন ছেলে, বেশ বড় একটা দলের কথা মনে পড়ল পল্লবের। বসন্ত কেবিনে, শীতের দুপুরে কলেজ স্কোয়ারের ঘাসে গোল হয়ে বসে কত আড্ডা যে তারা মেরেছে। ছাত্র ফেডারেশনের সভা, মিছিলে দু-তিনজন বাদে এই দলের সব ছেলেমেয়ে যেত। শান্তাও গেছে অনেকবার। সে সব দিন যে কোথায়

ভেসে গেল। আজ সে অসুস্থ, বিপন্ন, শরীর নির্জীব, এগিয়ে চলেছে মৃত্যুর দিকে, এই অশুভ মুহূর্তে সে কী বলবে শান্তাকে? শান্তা নিশ্চয় আখতারকে বিয়ে করেছে। সুখে ঘরসংসার করছে দুজন। একটা বা দুটো ছেলেমেয়ে হয়েছে। শান্তার সঙ্গে আখতারও আসবে। কীভাবে পুরনো দু-বন্ধুর মুখোমুখি হবে পল্লব?

অসীমকে পল্লব প্রশ্ন করল, শান্তার সঙ্গে ওর স্বামী, মানে আখতার আসবে তো?

এক সেকেন্ড চুপ করে থেকে অসীম বলল, না।

কেন?

শান্তার সঙ্গে আখতারের বিয়ে হয়নি। আখতার এখন নিউইয়র্কে থাকে।

সে কী?

অবাক পল্লবের প্রশ্নের জবাবে অসীম বলল, ওদের ছাড়াছাড়ির কারণ, দায়িত্ব কার বলা মুশকিল, তবে দুজনেই ভয় পেয়েছিল।

কীসের ভয়?

পল্লবের প্রশ্নে আবছা হেসে অসীম বলল, যেখানে জাতপাতের ভয়, সেই কলকাতা শহরে প্রেম করে, যেখানে এসব সংস্কারের বালাই নেই, সেই লন্ডনে এসে ওরা কুসংস্কারে কাবু হয়ে পড়ল। দুজনের বিয়ে না করার আর কোনও কারণ থাকলে জানা নেই আমার। তবে…।

অসীম হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। তারপর দরজার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, হ্যালো।

গোলগাল, ফর্সা, শাড়ি পরা এক ভদ্রমহিলাকে সোফার দিকে পল্লব এগিয়ে আসতে দেখল। আপেল, মাখন চটকে বানানো শরীর, ঝকঝকে মসৃণ চামড়া, রঙ করা মুখ, কামানো ভ্রূ পেন্সিলে আঁকা, অচেনা এই মহিলার মধ্যে এক যুগ আগের শান্তাকে খুঁজতে লাগল পল্লব। কোনও মিল নেই। সোফার সামনে এসে শান্তা হাসতে তাকে চিনল পল্লব। হ্যাঁ সেই হাসি। এমন ঠোঁট টেপা, আধ ফোটা মিষ্টি হাসি শান্তার মুখে অনেকবার পল্লব দেখেছে। কয়েক সেকেন্ড খুঁটিয়ে পল্লবকে দেখে সোফায় অসীমের পাশে বসল শান্তা। সামনের সোফায় পল্লব, সুন্দরলাল পাশাপাশি। শান্তার দু-চোখের তারায় এক যুগ আগের কৌতুক, প্রীতি জেগে উঠেছে। পল্লবকে শান্তা বলল, তোমাকে দেখে হিংসে হচ্ছে। বার বছর পরেও তোমার বয়স

বাড়েনি, আগের মত আজও তুমি তরুণ।
শান্তার নিষ্পাপ, সুরেলা গলা শুনে তার মুখের আদলও ধীরে ধীরে মনে পড়ছে পল্লবের। হাসি ফুটছে তার মুখে। নিরীহ, নরম যে শান্তা ছলচাতুরি জানত না, যা বলত, সেটুকুই বোঝাত, তাকে খুঁজে পেল পল্লব। রেস্টুরেন্টে ভিড় বাড়ছে। পাশের টেবিলে একজোড়া ইংরেজ তরুণ তরুণী বসে কষা মাংস, পরোটা খাচ্ছে। ঝালের চোটে তাদের মুখে হুসহাস শব্দ দু-জোড়া চোখে জল। নিজেদের দিকে তাকিয়ে তারা খুশিতে হাসছে।
কফি শেষ করে সুন্দরলাল চুপচাপ বসে আছে। সুন্দরলাল ক্ষুণ্ণ, বিরক্ত হতে পারে ভেবে পল্লব প্রশ্ন করল, তোমার কি বাড়িতে ফেরার তাড়া আছে?
সেরকম কিছু নয়, সুন্দরলাল বলল।
কলকাতার দু-চারটে খবর পল্লবের মুখে শুনে শান্তা বলল, অসীমদার মুখে শুনলাম, হার্ট অপারেশন করাতে তুমি লণ্ডনে এসেছ। কী হয়েছে তোমার?
অসুখের একঘেয়ে বিবরণ শান্তাকে শোনাতে ইচ্ছে নেই পল্লবের। সে হাসল। করুণ, ম্লান হাসি।
শান্তা বলল, ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময়ে প্রায়ই শুনতাম, তুমি অসুস্থ, বাড়িতে শুয়ে আছ। অসুখটা কী, জানার ইচ্ছে থাকলেও সুযোগ হয়নি। দু-একজন বন্ধুর কাছ থেকে ভাসা ভাসা শুনেছিলাম, হার্টের অসুখ আছে তোমার। বার বছর পরে এখনও সেই অসুখ। কী হয়েছে তোমার?
শান্তার চাপে কথা বলতে বাধ্য হল পল্লব। তার রোগ, সংকট, এমনকি কলকাতায় ফেলে আসা অসহায় সংসারের খবরও সে শোনাল শান্তাকে। কথা বলতে দম ফুরিয়ে, গলা বসে যাচ্ছে তার। শ্বাস ছোট হয়ে আসছে। পল্লবের কষ্ট, অসুবিধে দেখে সুন্দরলাল বলে দিচ্ছে কিছু কথা। ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে শান্তার মুখ। টেবিলের ওপর ঝুঁকে অসীমও গিলছে পল্লবের কথা। তিনমাস সময়ের কথা না বলে বাঁচার জন্যে যে তার তিন হাজার পাউণ্ড দরকার, পল্লব গোপন করল না। তিন মাসের খবরটা সুন্দরলালকে দু-তিনবার বলতে গিয়েও থমকে গেছে পল্লব। গলা বুজে গেছে তার। খবরটা শুনে সুন্দরলাল খুব ব্যথা পাবে। বয়স্ক এক বন্ধুকে অযথা ব্যস্ত করে কী লাভ? তেইশে মার্চ তারিখটা পল্লব নিজেও ভুলতে চায়। আগেভাগে নিজের মৃত্যুদিন জানা এক কঠিন ঝকমারি। এ খবর

যে জেনে যায়, চারপাশের সুস্থ মানুষ তাকে ভয় পায়। মৃত্যুর আগেই মৃত বলে ধরে নেয় তাকে। ঠিক মৃত নয়, আবার জ্যান্তও নয়, সে তখন ভূত, প্রেতাত্মা, অমঙ্গলের প্রতীক। ভয়ংকর এক বিপদ থেকে বাঁচার জন্যেই তিন মাস সময়ের কথাটা সকলের কাছে পল্লব চেপে গেছে। এখন আর তিন মাসও নেই। একটার পর একটা, মোট ত্রিশ দিন, এক মাস কেটে গেছে। আর ষাট দিন, দু-মাস হাতে আছে তার। তারপর আসবে তেইশে মার্চ, মঙ্গলবার। জীবন, মৃত্যুর ফয়সালা তার আগে না হলে পল্লবের জীবনে হয়ত এটাই শেষ তেইশে মার্চ, শেষ মঙ্গলবার।

আসন্ন মৃত্যুর কথা না বললেও তাকে দেখলেই সে যে মুমূর্ষু, মরছে, আত্মীয় বন্ধু, চেনা লোকেরা টের পায়। পল্লবের সন্দেহ, তার শরীর থেকে মৃত্যুর গন্ধ বেরোচ্ছে।

মিনিট পাঁচ, সাত হল রেস্টুরেন্টের কাউন্টারে বসেছে অসীম। পল্লবের চিকিৎসা নিয়ে সুন্দরলাল, শান্তা কথা বলছে। এখানে চিকিৎসা পাওয়ার জন্যে একজন বিদেশীর সামনে কতগুলো রাস্তা খোলা আছে, সে বিষয়ে আলোচনা করছে দুজন। কলিন্স আর স্মিথের নামও কয়েকবার কানে গেল পল্লবের। সুন্দরলাল বলল, সবকটা পথের কথা পল্লবকে বলেছি। এখন দেখা যাক।

নিচু গলায় কিছু বলে বেশ শব্দ করে হাসল সুন্দরলাল। কথাটা পল্লব শোনেনি। সে দেখল, শান্তার লালাভ ফর্সা মুখ আরও লাল হয়েছে। কলিন্সকে লেখা স্মিথের চিঠির কথা সুন্দরলাল বলছে শান্তাকে।

পল্লব ভাবছে ছাত্রজীবন, কলেজ, ইউনিভার্সিটির কথা। পল্লবের সঙ্গে একই ক্লাসে পড়ত শান্তা আর আখতার। চোখা নাক, টানা চোখ, পালিশ করা তামার মত গায়ের রঙ আখতারের শরীরে ছিল লক্ষ্নৌ, কলকাতার দুই বনেদী মুসলমান পরিবারের রক্ত। কলকাতায় ছিল তার পিতৃকুল। বাংলার সঙ্গে তুখোড় উর্দু বলত আখতার। ইউনিভার্সিটির অবাঙালীপ্রধান ক্লাস-গুলোতে ছাত্র ফেডারেশনের হয়ে বক্তৃতা করার দায়িত্ব ছিল আখতার। শায়ের, রসিকতা জুড়ে বক্তৃতা করে আখতার মাতিয়ে তুলত শ্রোতাদের। প্রায়ই বিকেলে ইউনিভার্সিটির পর, কলেজ স্কোয়ারের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে শান্তা, আখতার ফুচকা খেত। এম এ পাস করে প্রথমে আখতার, দু-মাস পরে শান্তা বিলেত চলে গেল।

আমার বাড়ি কবে আসছ ?

শান্তার প্রশ্ন শুনে চমকে সজাগ হল পল্লব।

আপনিও আসুন, সুন্দরলালকেও নেমন্তন্ন করল শান্তা।

যাব, সুন্দরলাল বলল, পল্লবকে নিয়ে যাব।

গোল্ডার্স গ্রিনের বাড়ির ঠিকানা একটা কাগজে লিখে সুন্দরলালকে শান্তা বলল, আপনার বাড়ির খুব দূরে নয়।

জানি, সুন্দরলাল হাসল।

সোফা ছেড়ে ওঠার সময় সুন্দরলালের মুখের ওপর চোখ রেখে শান্তা বলল, পল্লবের চিকিৎসার জন্যে আমার কিছু করার থাকলে জানাবেন। আমিও দেখছি, কী করা যায়।

সোফা থেকে উঠে পল্লবের পাশে এসে তার কাঁধে আলতো করে হাত রেখে শান্তা বলল, ফোন করব। দরকার হলে তুমিও করো।

বার বছর বাদে শান্তাকে চিনতে পল্লবের অসুবিধে হল না।

শান্তাকে রেস্টুরেন্টের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে এল অসীম। সুন্দরলালকে প্রশ্ন করল, বিয়ার চলবে ?

স্থির চোখে অসীমের দিকে তাকিয়ে সুন্দরলাল বলল, একটা শর্তে খেতে পারি।

কি শর্ত ?

আপনার রেস্টুরেন্টে একটা চাকরি দিন পল্লবকে।

সুন্দরলালের শর্ত শুনে থ হয়ে গেল অসীম। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে প্রশ্ন করল, চাকরি পেলে কী লাভ হবে ওর ?

অনেক লাভ, সুন্দরলাল বলল, চিকিৎসার সুযোগ পাবে।

জব ভাউচার ছাড়া একজন বিদেশীর চাকরি করা অপরাধ, অসীম বলল, চাকরি দেওয়াটাও বেআইনী।

সবসময়ে নয়, সুন্দরলাল বলল, ভারতীয় রেস্টুরেন্টের কাজ জানা একজন ভারতীয়কে চাকরি দিয়ে তার জব ভাউচারের জন্যে শ্রম দপ্তরে আবেদন করা যায়। এ ধরনের আবেদনে শ্রম দপ্তর সাধারণত সাড়া দেয়।

এক সেকেন্ড চুপ করে থেকে সুন্দরলাল বলল, চেষ্টা করতে ক্ষতি কি ?

অসীম তাকাল সুন্দরলালের দিকে। দুজনের চোখাচোখি, দৃষ্টিতে দ্বন্দ্বযুদ্ধ, দ্বৈরথের আভাস পেল পল্লব। বুঝতে পারল, সুন্দরলাল অসীমে

শক্তি পরীক্ষা, ঠিক পরীক্ষা নয়, পরস্পরকে বাজিয়ে দেখার মহড়া চলছে। তাকে নিয়ে এই জট, পাঞ্জা কষা পল্লবের ভাল লাগছে না। অস্বস্তি, সংকোচে তার হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে। গম্ভীর, ভারী হয়ে উঠেছে পরিবেশ। অসীমের মুখে হঠাৎ হাসি ফুটল। রেস্টুরেন্টের একজন কর্মীকে ডেকে দু-পাইট বিয়ার আনার হুকুম দিয়ে সোফায় বসল অসীম। সুন্দরলালকে বলল, আপনার শর্ত মেনে নিলাম। তবে তাজমহলের বদলে অন্য একটা ভারতীয় রেস্টুরেন্টে পল্লবের চাকরির ব্যবস্থা হবে

অসীমের কথা শুনে তার হাতে হাত রাখল সুন্দরলাল। উর্দিপরা কর্মী দুটো লম্বা গ্লাসে দু-পাইট বিয়ার ভরে রেখে গেল টেবিলে। গ্লাস দুটোর মাথায় ফেনার টুপি। বিজবিজ শব্দ বেরোচ্ছে দুটো গ্লাস থেকে।

অসীম বলল, ওয়ারেন স্ট্রিট টিউব স্টেশনের কাছে আমার এক বাংলাদেশী বন্ধু দুদু মিঞার রেস্টুরেন্ট আছে। চালু রেস্টুরেন্ট, নাম পদ্মা। দুদু মিঞার পরিচিত একজনকে তিন মাস আগে এখানে চাকরি দিয়েছি। তার বদলে আমার চেনা একজনকে দুদু মিঞা নেবে। পল্লব ইচ্ছে করলে কালই পদ্মায় জয়েন করতে পারে।

পল্লব বোবা, কথা হারিয়ে ফেলেছে সে

অসীম বলল, এখনই ফোনে দুদু মিঞার সঙ্গে কথা বলছি আমি।

বিয়ার গ্লাসে দুটো লম্বা চুমুক দিয়ে হাতে পাকানো সিগারেট ধরিয়েছে সুন্দরলাল। ফেনা মরে গেলেও বিয়ারের গ্লাস পল্লব স্পর্শ করেনি। ফোন করতে ওঠার আগে পল্লবকে অসীম প্রশ্ন করল, আপনি পারবেন তো? শরীর কী বলছে?

অসীমের দিকে ফাঁকা চোখে তাকিয়ে থাকে পল্লব। এক মুহূর্ত পল্লবের উত্তরের অপেক্ষা করে কাউন্টারে গিয়ে ফোনের রিসিভার তুলল অসীম। বিয়ারের গ্লাস দেখিয়ে পল্লবকে সুন্দরলাল বলল,, শেষ করো তাড়াতাড়ি। গ্লাস তুলে চুমুক দিতে পল্লবের মুখের ভেতরটা তেতো হয়ে গেল। মিষ্টি ল্যাগার লাইমের বদলে বিয়ার তেতো। পছন্দ না হলেও গ্লাসে দ্বিতীয় চুমুক দিল সে। তেষ্টায় গলা কাঠ। তেতো হলেও গলা ভিজতে আরাম পেল পল্লব।

কাউন্টার থেকে এসে পল্লবকে অসীম বলল, কাল থেকে আপনার চাকরি। দুপুর একটার মধ্যে পদ্মায় পৌঁছে দুদু মিঞার সঙ্গে দেখা করবেন।

কথাটা বলে সুন্দরলালের দিকে তাকিয়ে বিজয়ীর হাসি হাসল অসীম।
গ্লাস শেষ করে অসীমকে সুন্দরলাল বলল, থ্যাংক য়ু।

বাড়ি ফিরে সুন্দরলালের বসার ঘরে রঞ্জনকে দেখে অবাক হয়ে গেল পল্লব। পল্লবের বিছানায় বসে মুমুর সঙ্গে লেগো খেলছিল রঞ্জন। প্লাস্টিকের ছোট ছোট টুকরো জুড়ে রঞ্জনের বানানো বড় সাইজের সুন্দর জাহাজটা দেখে পল্লব বুঝল, দুজনের খেলা অনেকক্ষণ শুরু হয়েছে। তার মানে, পল্লবের জন্যে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করছে রঞ্জন। রঞ্জনের তৈরি জাহাজ দেখে মুমু মুগ্ধ। লেগোর টুকরোগুলো খুঁটিয়ে দেখে জাহাজ তৈরির কৌশল পাঁচ বছরের মেয়েটা মুখস্থ করে নিতে চাইছে।
রঞ্জন বলল, কলকাতা থেকে লেখা তোর চিঠি পেয়ে অনেক খোঁজাখুঁজির পর এ ঠিকানা পেলাম। সাড়ে পাঁচটায় একবার ফোন করে জানলাম, ডাক্তার দেখিয়ে ফিরে আসবি। সাতটা নাগাদ তাই চলে এলাম।
ভাল করেছিস, পল্লব বলল।
সুন্দরলালের সঙ্গে রঞ্জনের পরিচয় করিয়ে দিল পল্লব। পাশে রাখা চামড়ার ব্যাগ খুলে ওয়াইনের একটা বোতল রঞ্জন দিল সুন্দরলালকে। সুন্দরলাল বলল, থ্যাংক য়ু।
হেসে রঞ্জন জবাব দিল, য়ু আর ওয়েলকাম।
বোতলের গায়ে লাল হরফে লেখা ভুবোনি, মেড ইন ফ্রান্স। পেশায় রঞ্জন নাভাল আর্কিটেক্ট, জাহাজ বানায়, বিখ্যাত লয়েড্স কোম্পানির কর্মী। প্রায় ছ-বছর লণ্ডনে আছে। পল্লবের স্কুলের বন্ধু ছিল রঞ্জন। এক কলেজে দু-বছর পড়ার পর রঞ্জন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গেল। কলেজ শেষ করে পল্লব ভর্তি হল ইউনিভার্সিটিতে। ছেলেবেলার বন্ধুত্ব, ঘনিষ্ঠতা একবার টিকে গেলে, সারাজীবন থেকে যায়। কলেজ আলাদা হয়ে গেলেও রঞ্জন-পল্লবের যোগাযোগ, আড্ডার ছেদ ঘটেনি। নিয়মিত দেখা, যাতায়াত বজায় ছিল। কলকাতা থেকে বিদেশে এসেও রঞ্জন বছরে একাধিক চিঠি, নববর্ষের গত পাঁচ বছর পাঠিয়ে যাচ্ছে পল্লবকে।
হাসপাতালে ভর্তি, অপারেশন সম্পর্কে রঞ্জন জানতে চাইলে সুন্দরলাল বাঁচাল পল্লবকে। হার্লে স্ট্রিট ক্লিনিকের এক রাতের খরচ দুশো সাতাশ

পাউন্ড থেকে শুরু করে দুদু মিঞার পম্মা রেস্টুরেন্টে পল্লবের চাকরি হওয়া পর্যন্ত, সব খবর রঞ্জনকে শোনাল সুন্দরলাল। পল্লবের জন্যে দুশ্চিন্তা, উদ্বেগে গম্ভীর মুখে বসে আছে রঞ্জন। তার কপালের রেখায়, মাথাজোড়া টাকে আলো পড়েছে। অসময়ের এই টাক পারিবারিক সূত্রে পেয়েছে রঞ্জন। আলো লেগে চকচক করছে টাক। গম্ভীর মুখ, মাথায় টাক, তবু রঞ্জনকে ছেলেমানুষ দেখাচ্ছে। ওর মুখের গঠনে, নাক, চোখ, চিবুকের বিন্যাসে মিশে আছে শিশুর আবেগ আর সারল্য। লেখাপড়ায় তুখোড়, মেধাবী হয়েও বাস্তব জীবনে বারবার নিজেকে সে বোকা প্রমাণ করেছে। ছোটখাট, রোগা শরীর, অনর্গল কথা বলত। বেশি কথা বলত বলেই বোধহয় দরকারী কাজের কথা কখনও বলে উঠতে পারত না। কিন্তু তার বকবকানি উপভোগ করত বন্ধুরা। রঞ্জন কথা শুরু করলে বন্ধুরা বলত, সাইলেন্স, সিজার স্পিকস্
তারপর সত্যি মুখে তালা এঁটে বসে থাকত বন্ধুরা। সেই রঞ্জনকে গম্ভীর, চুপচাপ দেখে অস্বস্তিতে পল্লব প্রশ্ন করল, কী খবর তোর ?
নড়েচড়ে বসল রঞ্জন। বলল, চাকরির পাশাপাশি গত তিন বছর ধরে শিখলাম মঞ্চশৈলী, স্টেজ ক্র্যাফ্ট আর পিয়ানো অ্যাকোর্ডিয়ান। এখন শিখছি ফটো প্রসেসিং, বলনাচ।
সোফা ছেড়ে উঠে ধুলোমাখা, পাতলা, চৌকো একটা বই বুকসেলফ থেকে টেনে বার করে ফুঁ দিয়ে সাফ করল সুন্দরলাল। বইটা খুলে রঞ্জনের সামনে ধরে সুন্দরলাল বলল, পিয়ানোর স্বরলিপি।
ঘরের কোণে রাখা পিয়ানোটা চোখের ইঙ্গিতে রঞ্জনকে দেখিয়ে সুন্দরলাল বলল, একটা ক্যান্টো বাজাও, শুনি…।
প্রস্তাব শুনে রঞ্জন সামান্য থতমত, দ্বিধায় পড়ল। তারপর স্বরলিপির বই হাতে পিয়ানোয় বসল। ওয়াইনের বোতল খুলে চারটে ছোট গ্লাসে ঢেলে ভেতরের ঘর থেকে ডরোথিকে ডেকে আনল সুন্দরলাল। রঞ্জনের পিয়ানোর ওপর একটা গ্লাস রেখে আর একটা দিল পল্লবকে। পকেট থেকে একটা রুমাল বার করে রঞ্জন সযত্নে পিয়ানোর ওপর, দুপাশ মুছে নিতে পালিশ করা ঝকঝকে কাঠের ওপরে ছায়া পড়ল তার। রঞ্জনের জ্বলন্ত সিগারেট পিয়ানোর পাশে রাখা অ্যাশট্রেতে পুড়ছে। সুরেলা গম্ভীর শব্দ-তরঙ্গ ঘরে ছড়িয়ে পড়ল। লাল তরমুজের রসের মত ওয়াইনের গ্লাস হাতে

নিয়ে অবাক চোখে দেখছে পল্লব। রঙের জৌলুসে মুগ্ধ পল্লব নাকের কাছে গ্লাস নিয়ে গন্ধ শুঁকল। মাদকতাময় মিঠে সুবাসে ভরে গেল তার বুক। গ্লাসে ঠোঁট ছুঁয়ে ছোট চুমুক দিল সে। মিঠে, কষা স্বাদ খারাপ লাগল না। সোফায় এলিয়ে বসে চোখ বুজে পিয়ানো শুনছে সুন্দরলাল। তার পাশে বসেছে ডরোথি। সুন্দরলালকে নিচু গলায় ডরোথি বলল, বেটোভেনের সোনাটিনা।

বেটোভেনের নাম শুনলেও পিয়ানোর কিছুই পল্লব বোঝে না। কিন্তু রঞ্জনের বাজনা কান পেতে শুনছে সে। ভারি সূক্ষ্ম গভীর সে সুর শুনে মনে হয়, তারের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে রঞ্জন। তার দু-হাতের আঙুল হাঁসের পালকের মত হঠাৎ ভারি হাল্কা, নরম হয়ে গেছে। সুরের মায়ায় দু-চোখ বুজে বসে আছে সুন্দরলাল। অচেনা এক ভারতীয়কে এমন চমৎকার পিয়ানো বাজাতে দেখে ডরোথির দু-চোখে বিস্ময়। জাহাজ খুলে লেগোর টুকরো দিয়ে নিজে জাহাজ বানাবার চেষ্টা করে মুমু পারছে না। বিরক্তি কাতরতা, অধৈর্য তার মুখে চোখে ছড়িয়ে আছে। নিভু নিভু ফায়ার প্লেসের দিকে দু-তিনবার দেখেও সোফা ছেড়ে সুন্দরলাল উঠল না। তার নড়াচড়া, আগুনে কয়লা ঢালার শব্দে সুরের অপঘাত হবে ভেবে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকল সে। অ্যাশট্রেতে রঞ্জনের সিগারেট কখন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। পিয়ানোর মাথায় রাখা গ্লাসের মদ বাজনার তালে তিরতির করে কাঁপছে। লাল মদের ওপর পড়েছে দেওয়ালের ফিকে হলুদ আলো। মদের রঙ এখন রক্তের মত লাল। কী সুর রঞ্জন বাজাচ্ছে পল্লব জানে না। কিন্তু সারা ঘর মনোরম, কান্না, দীর্ঘশ্বাসে ভরে যাচ্ছে। মনে বিষাদ জাগলেও সে বিষাদ নিখাদ, স্নিগ্ধ।

রঞ্জন বিয়ে করেছে কিনা, পল্লব এখনও জানতে পারেনি। ফেলে আসা বহু ঘটনা, একটি অসাধারণ সুন্দরী মেয়ের মুখ বাজনার স্রোতেই ভেসে এল পল্লবের মনে। রঞ্জনের জীবনের একটা দিন, একটা বড় ঘটনা, বা দুর্ঘটনার সাক্ষী পল্লব। দুঃসহ সে ঘটনার কথা নানা সময়ে নিভৃতে, একা পল্লব ভেবেছে। রঞ্জনের জন্যে দুঃখে, সমবেদনায় কাতর হয়েছে সে। তারপর ভুলে গেছে।

টাক উঁকি দিলেও তখন রঞ্জনের মাথায় যথেষ্ট চুল ছিল। এক সকালে ফোন করে রঞ্জন বলল, দুপুরে জরুরী দরকার। চলে আয়।

মধ্য কলকাতার এক চীনা রেস্টুরেন্টে বারটার মধ্যে পল্লবকে আসতে বলেছিল রঞ্জন। অফিস কামাই করে রেস্টুরেন্টে ঢুকে পল্লব দেখল, একটা কেবিনে আটজন বন্ধু নিয়ে বসে আছে রঞ্জন। তার বাঁপাশের চেয়ারে সহেলি। দুজন ছাড়া রঞ্জনের সব বন্ধুই পল্লবেরও বন্ধু। পল্লবকে দেখে হইহই করে উঠল তারা। রঞ্জনের সঙ্গে সহেলিকে আগে কয়েকবার দেখলেও সেই দুপুরের দেখা ছিল একদম আলাদা। সহেলির রূপ দেখে মাথাঘুরে গিয়েছিল পল্লবের। পদ্মের ডাঁটার মত লম্বা ছিপছিপে শরীরে চাঁপাফুল রঙ সিল্কের শাড়ি পরেছিল সহেলি। তার লালাভ ফর্সা রঙ, টিকোলো নাক, ফালি তরমুজের মত পাতলা ঠোঁট, তীক্ষ্ন চিবুক, ঘন, লম্বা কুচকুচে কালো বিনুনি, গভীর, টানা দুটো চোখ, লম্বা, ঝকঝকে গলা, ঘাড়, শরীরের সব অঙ্গ থেকে ফেটে পড়ছিল রূপ। দশজন পুরুষের মধ্যে সহেলি একা রূপের হাট বসিয়ে দিয়েছিল। রঞ্জন, সহেলি ছাড়া সকলের সামনে গ্লাস ভর্তি পানীয়। হুইস্কি, রাম, জিন, বিয়ার, যার যা পছন্দ খাচ্ছিল। সহেলির মুখে আবছা হাসি।

কী ঘটছে বুঝতে একটু সময় লেগেছিল পল্লবের। রঞ্জনই বলল যে, ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের ঘরে আজ সে বিয়ে করছে সহেলিকে। খবর শুনে আনন্দে রঞ্জনের কাঁধে হাত রেখে পল্লব বলেছিল, অভিনন্দন, কনগ্র্যাচুলেশনস্।

খাবারের অর্ডার দিয়ে পল্লব, সরিৎ আর কল্যাণকে নিয়ে ম্যারেজ রেজিস্ট্রার অফিসে গিয়েছিল রঞ্জন, সহেলি। রেস্টুরেন্টের পাশের রাস্তায় দশ, বারটা বাড়ি পরে রেজিস্ট্রারের অফিস। বিয়ের কাগজপত্র তৈরি ছিল। সইসাবুদ করে দশ মিনিটের মধ্যে রঞ্জন যখন রেস্টুরেন্টে ফিরল, তখনও খাবার আসেনি। কেবিনে যারা ছিল, তাদের কারও গ্লাস খালি নেই। গ্লাস খালি রাখছিল না কেউ। সাধন, মনোজ খুব বকবক করছিল। তরুণ, মানবের মুখ চোখ দেখে পল্লবের মনে হচ্ছিল, তারা এখনই ঘুমিয়ে পড়বে। বমি করার জন্যে বাথরুমে গেল প্রকাশ। হাসিখুশি সহেলির মুখের হাসি এত আবছা যে অন্যরকম লাগছিল তাকে। এত মদ, হল্লা, মুখে না বললেও সে বোধহয় পছন্দ করছিল না। খুশিতে কথার তুবড়ি ছোটাচ্ছিল রঞ্জন। বিয়ার-প্রেমিক রঞ্জন কিন্তু কোন পানীয়ে সেদিন ঠোঁট ছোঁয়ালো না।

নানা মজার কথা বলছিল কল্যাণ। রঞ্জনকে কল্যাণ বলল, শেষ পর্যন্ত তাহলে সহেলিকে তুই বাগালি? সরিৎ বলল, বাগাবি শব্দটা খুব আপত্তিকর।

সরিতের কথায় কান না দিয়ে কল্যাণ বলল, রঞ্জনের ধৈর্য আছে। পাঁচ বছর প্রেম করা চাট্টিখানি কথা নয়।

সাধন বলল, আমাদের পলিসি হল, ধরো তক্তা মারো পেরেক।

সরিৎ কপাল কুঁচকে বলল, আপত্তিকর কথাবার্তা।

সব কথায় হো হো করে হাসছিল রঞ্জন। রঞ্জন কথা বলে বেশি, হাসে কম। তার হাসির বাড়াবাড়ি দেখে পল্লব ভাবল, মদ না খেলেও গন্ধে নেশা হয়ে গেছে রঞ্জনের। সেদিন শেষ বিকেলে প্রায় এক হাজার টাকা রেস্টুরেন্টের বিল দিয়েছিল রঞ্জন। রঞ্জন, সহেলি, বন্ধুদের সঙ্গে রেস্টুরেন্টের বাইরে রাস্তায় পা দিয়ে পল্লব দেখল, হেমন্তের ধোঁয়াশায়, ফিকে অন্ধকারে চারপাশ ঝাপসা, রাত নামছে পৃথিবীতে। বন্ধুদের দুটো ট্যাক্সিতে তুলে পল্লব, কল্যাণ, সহেলিকে নিয়ে পায়ে হেঁটে ধর্মতলায় এল রঞ্জন। অফিস কাছারি ছুটি হয়েছে। রাস্তায় ঘরমুখো মানুষের ভিড়। সহেলিকে দেখে চোখ ঝলসে যাচ্ছিল অনেকের। তিনটে পান কিনে রঞ্জন, পল্লব, কল্যাণ খেল। পানদোকানীর কাছ থেকে সহেলি চেয়ে নিল মিষ্টি সুপুরি। একটা ট্যাক্সি ডেকে চারজন উঠতে কল্যাণ বলেছিল, তোদের সকলকে নামিয়ে বাড়ি ফিরব আমি।

গোয়াবাগানে নিজের বাড়ির বদলে মানিকতলায় সহেলির বাড়ির সামনে রঞ্জন ট্যাক্সি দাঁড় করাতে তাঁকে খোঁচা দিয়ে কল্যাণ বলল, শ্বশুরবাড়িতে আজ নিশিযাপন হবে নাকি?

কল্যাণের রসিকতার জবাব না দিয়ে হাসল রঞ্জন।

মানিকতলা বাজারের সামনে গাড়ি থেকে সহেলি নেমে যাবার পরেও রঞ্জনকে বসে থাকতে দেখে কল্যাণ প্রশ্ন করেছিল, নামবি না।

রঞ্জন বলল, একটু পরে ফিরব।

নতুন বৌকে পেঁছে দিয়ে আয়।

কল্যাণের কথার উত্তরে হেঁয়ালি করে রঞ্জন বলল, বৌ আর নতুন কোথায়?

রঞ্জনের কথা ভাল লাগল না পল্লবের। কল্যাণ ঠাট্টার সুরে বলল, তা বটে, পাঁচ বছর ট্যাং ট্যাং করে প্রেমের পর।

কল্যাণের কথার মধ্যে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে রঞ্জন বলল, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল।

ফায়ার প্লেসের আগুন নিভে গেলেও জ্বালার তাড়া নেই সুন্দরলালের। ফাটা জানলা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকে শীতল করছে ঘর। নিজের খালি গ্লাস ভরে পল্লবের গ্লাস শেষ হয়নি দেখে সুন্দরলাল ডুবোনির বোতল রেখে দিল। রঞ্জন এখনও গ্লাসে চুমুক দেয়নি। ডরোথির গ্লাসেও অনেকটা আছে।

পল্লবের মনে পড়ল, সেদিন ছিল শনিবার। রাস্তায় গাড়ি, মানুষ কমে এসেছে। চৌরঙ্গি ধরে হু হু করে ছুটে চলেছে তাদের ট্যাক্সি। রঞ্জনের কথা, আচরণে পল্লব গোলমাল টের পাচ্ছিল। সেরকম কিছু আঁচ করে কল্যাণও চুপ করে গিয়েছিল। ভিক্টোরিয়ার গেটে ট্যাক্সি থেকে নেমে পল্লব দেখল, আকাশের দক্ষিণ-পূব কোণে বিশাল চাঁদ উঠেছে। এমন চাঁদনী রাতে নতুন বৌ ফেলে বন্ধু নিয়ে নববিবাহিত কোনও যুবক ভিক্টোরিয়ায় বেড়াতে আসে না। অবাক হলেও পল্লব কোনও প্রশ্ন করল না রঞ্জনকে। ভিক্টোরিয়ার সবুজ মাঠের মধ্যে দিয়ে অল্প হেঁটে দীঘির ধারে গিয়ে বসেছিল তিন বন্ধু। পেছনে লাল কলাফুলের ঝাড়। ইলেকট্রিক আলো আর জ্যোৎস্নায় ফুটফুট করছিল মাঠ, সাদা পাথরের স্মৃতিসৌধ। রঞ্জন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। পল্লব প্রশ্ন করল, কী হয়েছে তোর?

তার প্রশ্নের খেই ধরে কল্যাণ প্রশ্ন করল, সহেলিকে আনলি না কেন?

সহেলি আসতো না।

রঞ্জনের জবাবে একটু চমকে উঠে কল্যাণ বলল, তার মানে?

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও বিয়ে শেষ হয়ে গেছে।

পল্লব, কল্যাণ বুঝতে পারছিল না রঞ্জনের কথা। দীঘির জলে চাঁদের ছায়ার দিকে চেয়ে রঞ্জন বলেছিল, কয়েক ঘণ্টার জন্যে বিয়ের চুক্তি করেছিলাম আমরা। বলতে পারিস, এটা কাগুজে বিয়ে অথবা সিনেমার বিয়ে। সহেলির সঙ্গে আর আমার কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা দু'জনেই এখন মুক্ত, স্বাধীন।

রঞ্জনের কথায় কল্যাণ তাজ্জব, পল্লব আতঙ্কিত হয়েছিল।

রঞ্জন বলল, একমাস আগে রেজিস্ট্রারকে নোটিশ দিয়ে বিয়ের সব আয়োজন আমরা দু'জন করেছিলাম। গতকাল সহেলি জানাল, সে বিয়ে করতে

চায় না আমাকে। সহেলির কথা শুনে প্রথমে ভাবলাম, সে মজা করছে, লেগপুল করছে আমার। কিন্তু সে যা বলছে, তা যে সত্যি বুঝতে দেরি হল না। পাঁচ বছর ওর সঙ্গে আমার মেলামেশা, প্রেম, বাড়ির সকলে, কয়েকজন বন্ধুও রেজিস্ট্রির তারিখ জেনে গেছে। আমি নিজে জানিয়েছিলাম তাদের। সহেলির কথা শুনে আমার পায়ের তলার মাটি সরে গেল। কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। তাকে বোঝাবার, তার মত বদলের অনেক চেষ্টা করে বিফল হলাম। কেন সে এমন করছে জানার জন্যে অনেক অনুরোধ, চাপাচাপির পর শুনলাম, এক বিখ্যাত বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের উঁচুপদে কাজ করেন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ছ'মাস আগে পরিচয় হয়েছিল সহেলির। প্রথমে সে ভদ্রলোককে পাত্তা দেয়নি সহেলি। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এমন নিবিড় হল যে, সহেলি সরে আসতে পারল না। সেই নিবিড় ঘনিষ্ঠতার বীজ সহেলির শরীরে ঢুকে গেছে। সেই ভদ্রলোক ছাড়া আর কাউকে সহেলির বিয়ে করার উপায় নেই।

রঞ্জনের কাহিনী ধারালো ঠাণ্ডা বাতাসের মত পল্লবের হাড়ের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল। শরীরে কাঁপুনি জেগেছিল তার।

রঞ্জন আবার বলল, যে কোনও অবস্থাতেই সহেলিকে বিয়ে করতে তৈরি ছিলাম আমি। অন্যের দায় নিজের ঘাড়ে নিতে আমার দ্বিধা বা আপত্তি ছিল না। কিন্তু সহেলি।

কথা শেষ না করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল রঞ্জন। বলল, আমার দশা দেখে এক বিকেলের জন্যে স্ত্রী সেজে নাটক করতে রাজি হল। কাগুজে বিয়ের কাগজ এবার ফেলে দিতে হবে আমাকে।

কথাটা বলে ভাঁজ করা একটা সবুজ কাগজ পকেট থেকে বার করল রঞ্জন। কাগজটা যে ম্যারেজ সার্টিফিকেট আজ দুপুরে রঞ্জন, সহেলি এ কাগজে সই করেছে, দেখেই চিনতে পেরেছিল পল্লব। কল্যাণ চেঁচিয়ে উঠেছিল, এ অন্যায়। সহেলিকে এ কাজ আমরা করতে দেব না।

তা হয় না, রঞ্জন বলেছিল, এসব কাজ গায়ের জোরে হয় না।

হয়। যে মেয়ে ফ্রড, বেইমান।

কল্যাণের কথার মধ্যে রঞ্জন বলেছিল, সহেলিকে কথা দিয়েছি আমি।

ও কথার কোন দাম নেই।

কল্যাণের কথার জবাব না দিয়ে কয়েক সেকেণ্ড গুম্‌ হয়ে থেকে রঞ্জন বলল, সহেলির সঙ্গে পরিচয়, মেলামেশার শুরুতে ওকে একটা কথা দিয়েছিলাম আমি। পাঁচ বছর সে কথা মেনে চলেছি। তোরা শুনে হাসবি, হয়ত ব্যাপারটা হাস্যকরও, গত পাঁচ বছরে কথা রাখতে সহেলিকে সেভাবে আদর করা দূরের কথা, একটা চুমুও আমি খাইনি।

নেশা ছুটে গিয়েছিল কল্যাণের। সে বলল, এতক্ষণে বুঝলাম, কেন তোর এই দশা।

তার মানে, প্রশ্ন করল রঞ্জন।

সহেলি তোকে নপুংসক ভেবেছে।

স্মৃতিসৌধের মাঠে বসার সময় শেষ। ভেতরে যারা রয়েছে তাদের বাইরে যাবার জন্যে লাউডস্পিকারে অনুরোধ করা হচ্ছে। বিয়ের সার্টিফিকেটটা হঠাৎ টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিল রঞ্জন।

এ ঘটনার তিন মাস পরে ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার প্লেনে রঞ্জন উঠে বসল।

সুন্দরলাল ঘুমোচ্ছে না জেগে বোঝা যাচ্ছে না। ডুবোনির বোতল প্রায় শেষ। সুন্দরলাল একা আধবোতল খেয়েছে। পল্লবের মাথার মধ্যে সময়, দেশ, অতীত, বর্তমান, তিন হাজার পাউণ্ড, তিন মাস সময়, পিয়ানোর শব্দস্রোতে একাকার। দীর্ঘ যাত্রার পর করুণ, গভীর, শান্ত, নীরবতা নামছে বেটোভেনের সোনাটিনার সুরে। পিয়ানোয় মুখ গুঁজে থাকা রঞ্জন ধীরে ধীরে সোজা হয়ে বসছে। তার দুহাতের গতিমান আঙুলগুলো এবার থেমে যাবে।

পিয়ানো নীরব হতে সুন্দরলাল বলল, স্ম্যাশিং। এ্যাকোর্ডিয়ান শিখে পিয়ানোয় হাত পাকালে কী করে?

তার প্রশ্নে রঞ্জন হাসল।

ডরোথি কথা বলছে না। তৃপ্তি ছড়িয়ে আছে তার মুখে, চোখে। রঞ্জনের মত একটা জাহাজ লেগোতে বানিয়ে তাকে দেখাবার জন্যে মুমু অপেক্ষা করছে। পল্লব ভাবল, আমি যদি পিয়ানো বাজাতে পারতাম। পিয়ানো কেন, যে কোনও একটা যন্ত্র শিখলে কষ্ট, ক্লান্তি অনেক কমে যেত আমার! পুঁথি পড়া পরীক্ষা পাস ছাড়া আমি কিছুই করতে, শিখতে পারলাম না। একটা রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করে সারাজীবন আশায় কেটে গেল।

তখনই তার মনে হল, এত যুদ্ধের পরেও কি আমি যুদ্ধ করতে শিখেছি?

তাও শিখিনি। যোদ্ধার সাহস, দৃঢ়তা, ধৈর্য, অবিচল প্রশান্তি, কিছুই আমার নেই। এমন চমৎকার জীবন কি হেলাফেলায় কাটিয়ে দিলাম, কাটাতে বাধ্য হলাম আমি!

সুন্দরলালের বাড়িতে রাতের খাবার খেল রঞ্জন। হাত, মুখ ধুয়ে একবার টয়লেট্ ঘুরে এসে রঞ্জন ঠকঠক করে কাঁপছে। ফাঁকা ঘরে পল্লব একা। সুন্দরলাল পাশের ঘরে।

কী হয়েছে তোর?

পল্লব প্রশ্ন করতে রঞ্জন বলল, টয়লেটটা আইস চেম্বারের মত ঠাণ্ডা। ডেঞ্জারাস, ভয়ঙ্কর।

রঞ্জনের কথা ভুল নয়। টয়লেটের অবস্থা খুব খারাপ। বাড়ির লাগোয়া অথচ বাইরের বাগানে এ ফ্ল্যাটের টয়লেট্। কমোডের ওপর সিলিং ছুঁয়ে সাবেকী, চেন্ লাগানো ফ্লাশের ট্যাঙ্ক ফুটো হয়ে পেছনের দেওয়াল জুড়ে কঠিন বরফ জমেছে। টয়লেটে ঢুকলে ঠাণ্ডায় দাঁতে দাঁত লেগে যায়। ফ্লাশ না সারালে শীত শেষ হওয়া পর্যন্ত বরফের পলেস্তারা দেওয়াল কামড়ে থাকবে। কিন্তু কে সারাবে ফ্লাশ? শীতে কষ্ট পেলেও ফ্লাশ সারানোয় সুন্দরলালের হুঁশ নেই। ডরোথি এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। চাপা গলায় রঞ্জন প্রশ্ন করল, রাতে টয়লেটে যাস কী ভাবে?

রঞ্জনের কথার জবাবে পল্লব হাসল। রাতে আবছা ঘুম, জেগে থাকার অস্বস্তি, কষ্টে বার বার বিছানা ছেড়ে সে উঠে বসে। টয়লেটেও একাধিক-বার যেতে হয়। টয়লেটে যাওয়া খুব কষ্টের। রাতপোশাকের ওপর ড্রেসিং গাউন, কোট, ওভারকোট, জোড়া মোজা, জুতো, দস্তানা পরে, কলকাতা থেকে আনা কাশ্মীরি শালে মাথা, গলা মুড়ে পল্লবের টয়লেটে যাওয়া যেন যুদ্ধযাত্রা, তারপর ঘরে ফিরে সবগুলো একের পর এক খোলাও কম ঝকমারি নয়। পোশাক পরা এবং ছাড়ার ধকলে তার হাঁপ ধরে। শুধু রাতে কেন, রোজ সকাল সাতটার ল্যাক্সিক্স্ খাওয়ার পর তিন, চার ঘণ্টায় পাঁচ, ছবার টয়লেটে যেতে বাধ্য হয় পল্লব। টয়লেটের ভেতরে দিনেও রাতের মত ঠাণ্ডা। শুধু দিন হওয়ায় পোশাক পরা, ছাড়ার ঝামেলা নেই। গরম জামা কাপড়েই সারা সকাল পল্লব ঘরে বসে থাকে।

পল্লবের কানের কাছে মুখ নিয়ে রঞ্জন বলল, রাতে একটা দুটো দুধের খালি বোতল বিছানায় রেখে দিবি, ব্যস!

মুশকিল আসান বুদ্ধি দিয়ে চোখ টিপল রঞ্জন। তারপর বলল, এরকম ঠাণ্ডা গত ছ' বছরে আমি পাইনি। শীত আরও বাড়বে। আমার ঘরের লাগোয়া টয়লেট, তবু রাতে দুধের বোতল আমি বিছানায় রাখি।
রঞ্জনের পরামর্শ মনে ধরলেও গা ঘিনঘিন করছে পল্লবের। সুন্দরলাল শুনে কষ্ট পাবে। তার ঘরগৃহস্থালি সুশ্রী নয়, সংসারে অভাব, টানাটানি আছে। কিন্তু পল্লবের সুখ, আরামের জন্যে যা করার তার চেয়ে বেশি করছে সুন্দরলাল। রোজ সকালে পল্লবের জন্যে ব্রেকফাস্ট, দুধ, কর্নফ্লেক্স ডিমের পোচ, বেকন টোস্ট, বানিয়ে সুন্দরলাল নিজে এ ঘরে নিয়ে আসে। বাতে, হাঁপানিতে অসুস্থ মানুষটার কোনও বিরক্তি নেই। পল্লবের জন্যে ব্রেক্‌ফাস্টের এলাহি ব্যবস্থা করলেও মুমু, ডরোথি, সুন্দরলাল সকালে কী খায়, পল্লব জানে না। তবে সকাল, রাতের খাওয়া সকলে একসঙ্গে সারে। বন্ধুবৎসল, দরদী সুন্দরলালের জন্যে পল্লবের বুকে কৃতজ্ঞতা গভীর হয়। ঠাণ্ডা, ভদ্র, মার্জিত হলেও বয়স বা বাতের জন্যে সুন্দরলালের মেজাজ ঈষৎ তিরিক্ষি। ডরোথি, মুমুর ওপর চটলে সে মেজাজ মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ে। কোনও বিষয়ে মতের অমিল হলে সহজে রেগে ওঠে সুন্দরলাল। ফলে সুন্দরলালের নিয়মিত বন্ধু বদল হয়। কোনও বন্ধু বা রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে খুব বেশিদিন থাকতে পারে না সুন্দরলাল।
পল্লবের বিছানার পাশে চেয়ারে বসে সুন্দরলাল সম্পর্কে এসব গোপন তথ্য রঞ্জন শোনাচ্ছে পল্লবকে। রান্নাঘরের বেসিনের কলে জল পড়ার শব্দ। রান্নারবাসন, এঁটো প্লেট, ধোয়ামোছা করছে সুন্দরলাল। চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের বাইরে গিয়ে সুন্দরলালকে রঞ্জন প্রশ্ন করল, সাহায্য করতে পারি।
নো, থ্যাংক য়ু।
সুন্দরলালের ভারী কণ্ঠস্বর শুনল পল্লব। রাত দশটা বাজার পর বাড়ি ফেরার জন্যে রঞ্জন উঠে দাঁড়াল। যাবার আগে পল্লবকে বলল দরকার হলে যোগাযোগ করবি। ফোনে আমিও খবর নেব। নেক্সট উইক এণ্ডে আসছি।
ঘুমের বড়ি খেয়ে বিছানায় শুয়ে, কাল দুপুর একটার মধ্যে পদ্মা হোটেলে পেঁছনোর কথা ভেবে বাড়তি দুশ্চিন্তায় পল্লব ছটফট করতে থাকল। পদ্মা রেস্টুরেণ্টে কাল কাজে ঢুকলে স্মিথের চিঠি নিয়ে গাইজ হাসপাতালে কলিন্সের সঙ্গে পরশু সে দেখা করবে কী করে? চাকরিতে ঢুকেই ছুটি

চাওয়া যায় না। অথচ কলিন্সের কাছে যাওয়াটাও খুব জরুরী। জি পি-র চিঠি, হেলথ সার্ভিসের কার্ড, অপারেশনের জন্যে কলিন্স যা যা বলেছিলেন, গত একমাসের চেষ্টায় পল্লব জোগাড় করেছে। এগুলো দেখে কলিন্স আর পল্লবকে ফেরাতে পারবেন না। সরকারি কোন হাসপাতালে এবার নিশ্চয় ভর্তি হবার সুযোগ পাবে সে।

পাশের ঘরে খকখক করে সুন্দরলাল কাশছে। নাক ঝাড়ছে টিস্যু পেপারে। বিছানায় শুয়ে অন্ধকারে ফায়ার প্লেসের ধিকিধিকি লালচে আলো, প্যারাফিন হিটারের সবুজ শিখা কাঁপতে দেখল পল্লব। মাথার নিচে তিনটে বালিশ রেখে শুয়েও পল্লবের মনে হচ্ছে, আরও দুটো বালিশ পেলে ভাল হত। সামান্য উঁচুতে মাথাটা রাখলে আর একটু বেশি অক্সিজেন, আরাম পেত সে। তিনটে বালিশ উল্টে পাল্টে, নানা কায়দায় রেখেও পল্লবের অস্বস্তি, কষ্ট কাটছে না। টয়লেটে যাওয়ার কথা একবার ভেবে গুটিয়ে গেল। রাত শেষ হলে পরমায়ুর একটা কড়ি খসে যাবে। তারপর থাকবে উনষাট দিন, তারপর আটান্ন, সাতান্ন ছাপান্ন, এভাবে হাজির হবে তেইশে মার্চ মঙ্গলবার। পল্লব ভাবল, জীবনের বাকি উনষাট দিন কি এ বাড়িতেই থাকব। নাহ্, ঠিক হবে না সেটা। সুন্দরলাল, ডরোথির ঘাড়ে চেপে এখানে দু'মাস থাকা উচিত নয়।

বিনয়, জয়ার বাড়িতে কিছুদিন থাকার কথা ভেবে উৎসাহ বোধ করল না পল্লব। সেখানের পরিবেশ, কথা ভারি একঘেঁয়ে, ক্লান্তিকর, পল্লবকে বিমর্ষ করে। সতুমামা, রিনি এখন কোথায়? সতুমামা কি বাড়ি ফিরেছে? পদ্মায় চাকরি করলে মাইনের টাকায় পল্লব অবশ্য আলাদা থাকার আয়োজন করতে পারে। সংবাদপত্রে বেড্ অ্যান্ড ব্রেকফাস্টের অনেক বিজ্ঞাপন রোজ পল্লবের চোখে পড়ে। পছন্দসই একটা জায়গা খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত রঞ্জনের সঙ্গেও থাকা যায়। কাউকে চাপ না দিয়ে স্বাধীনভাবে একা থাকতে টাকা চাই। পল্লব ঠিক করল, কালই পদ্মা রেস্টুরেন্টের কাজে সে যোগ দেবে। তখনই মনে হল, এই অসুস্থ, পোকাকাটা শরীরে একটানা আধঘণ্টা কাজ কি আমি করতে পারব? সে ধকল শরীর সইতে পারবে কি?

কথাটা ভেবে ভয়, অনিশ্চয়তায় কুঁকড়ে গেল তার বুক। অসুস্থতা যে শুধু তার দেহ নয় মন, সাহস, আত্মবিশ্বাস কুরে কুরে খেয়ে তাকে ভীতু, ভিখিরি বানিয়ে দিয়েছে, বুঝে লজ্জা পেল পল্লব। কিন্তু যা সত্যি, তাকে মেনে

নেওয়া ভাল। কিন্তু নিজের ওপর এই অবিশ্বাস, ভয়ই কি সত্য; আর কোন সত্য নেই? নিশ্চয়ই আছে। সংসার, বৌ, ছেলে, মেয়েকে ছেড়ে বাঁচার জন্য প্রায় খালি পকেটে ছ'হাজার মাইল উড়ে আসা, জি পি-র খোঁজে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা, নব্বই দিন পরমায়ুর কথা শুনে রুখে দাঁড়ানোর মধ্যে কি কোন সত্য নেই? দুশ্চিন্তায় উদ্বেগে ভেঙে পড়া মনকে শাসন করতে চাইল পল্লব। নিজেকে প্রেরণা দেবার জন্য বলল, সাহস দেখাও পল্লব। চাকরি যখন পেয়েছ ঢুকে যাও। চাকরি শুরু করলেই শরীরে শক্তি, মনে জোর পাবে তুমি। কলিন্স ফিরিয়ে দিলেও চাকরিতে ঢুকলে তুমি বেঁচে যাবে। তোমাকে বাঁচতে হবে।

ঘোলাটে অন্ধকার ঘরে সবুজ প্যারাফিন শিখার দিকে তাকিয়ে পল্লব নিজেকে বোঝায়, নিজের সঙ্গে কথা বলে। ফাঁকা মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘুমের ওষুধ। ঘুম আসছে না। হিটারের তেল কমে আসায় সবুজ শিখা, ফ্যাকাসে নীল দেখাচ্ছে। তেল আরও কমলে নীল শিখা হলুদ হবে। তারপর নিভে যাবে হিটার। নিভে যাবার কয়েক ঘণ্টা পরেও ঘরে ছড়িয়ে থাকবে হিটারের তাপ। পল্লব ঠিক করল, কাল দুপুর একটায় পদ্মা রেস্টুরেন্টে হাজির হবে সে।

গাইজ হাসপাতালে কলিন্সের যে সেক্রেটারি, তার নাম মিস শার্লি। ফোনে তার সঙ্গে সকালে সুন্দরলাল কথা বলতে দুপুর দুটোয় হাসপাতালের আউটডোরে পল্লবকে নিয়ে যেতে বলল সে। শার্লি জানাল, আউটডোরে পল্লবকে মিঃ কলিন্স দেখবেন।

খবর শুনে মাথায় বাজ পড়ল পল্লবের। আজ একটার মধ্যে পদ্মা রেস্টুরেন্টে দুদু মিঞার সঙ্গে তার দেখা করার কথা। সম্ভবত আজই কাজে লাগতে হবে তাকে। সুন্দরলালও সে কথা জানে। পল্লব দেখল, শার্লির সঙ্গে কথা শেষ করে সুন্দরলাল আবার ফোনের ডায়াল ঘোরাচ্ছে। ফোনে সুন্দরলালের কথা শুনে পল্লব বুঝল, উল্টোদিকে যে আছে, সে পদ্মা রেস্টুরেন্টের দুদু মিঞা।

এক দেড় মিনিটে কথা শেষ করে রিসিভার রেখে সুন্দরলাল বলল, সময়টা বদলে নিলাম। দুপুর একটার বদলে আজ সন্ধ্যে সাতটায় তোমাকে পদ্মাতে যেতে হবে।

সুন্দরলালের কথা শুনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল পল্লব। ডরোথির এখন সকাল

আটটায় ডিউটি শুরু। ডিউটি শেষ করে পাঁচটার আগে সে বাড়ি ফিরতে পারে না। ফাঁকা ফ্ল্যাটে মুমুকে একা রেখে যাওয়া যায় না। বারটা নাগাদ মুমু, পল্লবকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরুল সুন্দরলাল। হ্যাম্পস্টেড লেকে গাইজ হাসপাতাল টিউবে এক ঘণ্টার বেশি না লাগলেও অ্যাপয়েন্টমেণ্ট থাকলে সুন্দরলাল একটু আগেভাগে বাড়ি থেকে রওনা হয়। সারা রাস্তা মুমুর নানা প্রশ্ন, এটা কি, ওটা কি, বিজ্ঞাপনের মেয়েটা ছবি থেকে বেরিয়ে এলে কী হবে, শুনে বিরক্ত হচ্ছে সুন্দরলাল। মাঝে মাঝে সুন্দরলালের হাত ছেড়ে রাস্তার দিকে এমন দৌড় দিচ্ছে যে পল্লবও ভয় পেয়ে যাচ্ছে। পাঁচ বছরের মেয়েকে রাগে ধমক দিচ্ছে সুন্দরলাল, য়ুসিলি, বিলি গাল,' আই শ্যাল স্ম্যাক য়ু। কিন্তু কে শোনে সুন্দরলালের ধমক। দুচার সেকেণ্ড চুপ থেকে মুমুর আবার প্রশ্ন আবার দৌড়। সকালে বিশ, পঁচিশ মিনিট উঁকি দিয়ে সূর্য সরে যাওয়ার পরমেঘ, কুয়াশায় মশারিতে ঢুকে গেছে শহর। রাস্তায় লোক চলাচল কম। জলে ভিজে পল্লবের জুতো থসথস করছে, রেন কোট না থাকায় স্যাঁতসেঁতে ওভারকোট আগের চেয়ে আরও ভারি হয়েছে।

বাড়ির সামনে থেকে বাস ধরে টটেনহাম কোর্ট রোডে টিউব স্টেশনের সামনে নামল ওরা। স্টেশনে ঢুকে টিকিট করল সুন্দরলাল। তারপর চলন্ত এসকালেটরের মাথায় এসে দাঁড়াল তিনজন। মুমুর হাত শক্ত করে ধরে আছে সুন্দরলাল। খাঁজকাটা, ঝকঝকে স্টেনলেস স্টিলের খাড়াই এসকালেটরের ওপর থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে মাথা ঘুরে গেল পল্লবের। অনেক নিচে, কত নিচে পল্লব দেখতে পেল না, স্টিলের সিঁড়ি গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে। পল্লবের ভয় হল, এসকালেটরে সে দাঁড়াতে পারবে না। দাঁড়ালে তলিয়ে যাবে। বাঁ দিকে ওপরে ওঠার এসকালেটারের পাতাল থেকে উঠে আসছে। দু'দিকের এসকালেটরেই থিকথিক করছে মানুষ। কেউ কেউ চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নেমে যাচ্ছে। খুদে পুতুলের মত দেখাচ্ছে এসকালেটরের নিচের দিকের মানুষগুলোকে। মাথা ঘোরার সঙ্গে পল্লবের পা, শরীর কাঁপছে। সুন্দরলালের মুঠো আলগা হতে মুমু একা এসকালে-টরের সিঁড়ি দিয়ে নাচতে নাচতে নেমে যাচ্ছে। চলন্ত সিঁড়ির বাঁ দিকের কাঠের হাতল চেপে ধরে চোখ বুজে প্রথম ধাপে পা রাখল পল্লব। ভয়ঙ্কর এক দুর্ঘটনার ভয়ে এসকালেটরের শেষ সিঁড়িতে পৌঁছবার আগে সে চোখ

খুলল না। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ওপর নিচে ওঠানামা করা দুসারি এসকালেটর একপলক দেখে পল্লবের মনে হল কোন অতিকায় প্রাণীর দু সারি ধারাল দাঁত সারাদিন মানুষ চিবোচ্ছে।

টটেনহাম্ কোর্ট রোড থেকে টিউবে ব্যাঙ্ক স্টেশন পনের মিনিট। সেখান থেকে গাইজ হাসপাতাল হেঁটে দশ-মিনিট লাগে। ব্যাঙ্ক এলাকা যে খুব পুরনো, দেখেই বোঝা যায়। রাস্তার দুপাশে কালো পাথরের বাড়ি, পাতা ঝরে যাওয়া দু'একটা উইলো বা বট গাছ, মেঘ, অন্ধকার ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে। মুমুকে সামলাতে সুন্দরলাল হিমশিম, পল্লবকে দেখার সুযোগ হচ্ছে না তার। উঁচুনিচু রাস্তায় চলার পরিশ্রমে বুক ঠেলে হৃৎপিণ্ড গলায় উঠে আসছে। শ্বাসকষ্টে কুঁজো হয়ে গেছে পল্লব। হাঁটার শক্তি নেই শরীরে। মনে হচ্ছে, হাঁটু ভেঙে এখনই রাস্তায় লুটিয়ে পড়বে সে। ভিজে জুতো, ভারি ওভারকোটের ওজনে পল্লব দুলছে। একটানা তীক্ষ্ম শিস বাজিয়ে রাস্তা দিয়ে ছুটে গেল একটা দুধসাদা অ্যাম্বুলেন্স। শিস শুনে বোঝা গেল ভেতরে রোগী নিয়ে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে যাচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স। পল্লব ভাবল, অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরে শুয়ে থাকা রুগ্ন মানুষটা কি আমার চেয়ে বেশি অসুস্থ ? একটা অ্যাম্বুলেন্সের গরম কোলে, নরম বিছানায় আমার কি জায়গা হবে না ?

প্রশ্নগুলো মনে জাগতে তার মাথার ভেতরটা খালি হয়ে গেল। গাইজ হাসপাতালের আউটডোরে পেঁছিবার দশ-বার মিনিটের মধ্যে পল্লবের এক্স-রে ই সি জি হয়ে গেল। বুকের রোগীদের হাসপাতালের আউটডোরে প্রথমেই এ পরীক্ষাগুলো করা হয়। রোগী দেখার সময় এক্স-রে, ই সি জি রিপোর্ট ডাক্তারের হাতের কাছে থাকে। ছোট, বড় ছড়ানো বাড়ি, বিশাল কম্পাউণ্ডের মধ্যে লণ্ডনের অন্যতম প্রধান, প্রাচীন হাসপাতাল এটা। কার্ডিয়াক সার্জারির থুরোরি দোতলা বাড়ির একতলায় আউটডোরের ওয়েটিং রুমে পল্লব গিয়ে বসল। ঝকঝকে পরিষ্কার হাসপাতাল। ভিড়, হইচই নেই। আউটডোরে আরও চার পাঁচজন রোগী বসে আছে। সকলেই অপেক্ষা করছে কলিন্সের জন্যে। নাম ধরে পরপর ডাকা হচ্ছে রোগীদের। বসার ঘর খালি হয়ে গেল একসময়। গম্ভীর সুন্দরলালের পাশে চুপচাপ ডাক্তারের ডাকের জন্যে পল্লব বসে আছে। কিছু একটা করার জন্যে ছটফট করছে

মুমু। দৌড়ে কোথাও চলে যাচ্ছে। আবার ফিরে আসছে। বিরক্ত সুন্দরলাল কফি খেতে মুমুকে নিয়ে বাইরে গেল। প্রায় একঘণ্টা পরে ডাক পড়ল পল্লবের। অল্পবয়সী, সুন্দরী জ্বলজ্বলে দু চোখ, মুখে মিষ্টি হাসি, নার্সের সাদা পোশাক পরা শার্লির সঙ্গে বসার ঘর ছেড়ে ভেতরের একটা বড় হলের মধ্যে এসে দাঁড়াল পল্লব। বিরাট হলঘরের দুপাশে তিনটে করে ঘর। ডানদিকের দ্বিতীয় ঘরে ঢুকে পল্লবকে পোশাক ছেড়ে একটা বিছানায় শুয়ে পড়তে বলল, শার্লি। খালি ঘর, বেশ ঠাণ্ডা, বোধহয় হিটারে জোর নেই। ঘসা কাঁচ লাগানো বন্ধ একফালি জানলা। জানলায় পর্দা নেই। কাঁচের গায়ে বাইরের ম্লান আলো লেগে আছে। ওভারকোট, জ্যাকেট, কার্ডিগান, শার্ট, গেঞ্জি খুলে বিছানায় শুয়ে পল্লবের মনে হল বিছানার সাদা চাদরটা ভিজে আছে। ঠাণ্ডায় ছ্যাঁৎ করে উঠল তার শরীর। ঘসা কাঁচ লাগানো এক চক্ষু জানলার দিকে তাকিয়ে ফাঁকা ঘরে বিছানায় শুয়ে থাকল পল্লব। এ ঘরে ঢোকার আগে বাঁ দিকের প্রথম ঘরে কয়েকজন তরুণ ডাক্তার অথবা ছাত্রের সঙ্গে চেয়ারে বসা কলিন্সকে মুহূর্তের জন্যে পল্লব দেখেছে। খুব নিবিষ্ট হয়ে গুটিকয় তরুণকে কিছু বোঝাচ্ছিল কলিন্স। মন দিয়ে কলিন্সের কথা শুনছিল তারা। আউটডোরে ঢুকেই স্মিথের চিঠি শার্লিকে দিয়েছিল সুন্দরলাল। সে চিঠি নিশ্চয় কলিন্স পড়েছেন। পল্লবের এখন কিছু করার নেই, ভাবার নেই। ঠাণ্ডা বিছানায় কাঠ হয়ে শুয়ে কলিন্সের প্রতীক্ষা করতে হবে তাকে। আজ একটা সিদ্ধান্ত হবে। জি পি-র চিঠি চেয়েছিলেন কলিন্স। পল্লব এনেছে। আর কি আনতে হবে তাকে? তিন হাজার পাউণ্ড, সোনার কৌটায় ভরা সোনার ভ্রমর? দরকার হলে প্রাণভ্রমরের খোঁজে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতেও সে রাজী। দিন ফুরিয়ে আসছে। ঊনষাটতম দিনটা ফুরিয়ে যাবে আজ। হিটার আর শরীরের তাপে গরম হয়েছে বিছানা। মার কোলে শুয়ে থাকার নরম, স্নিগ্ধ অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ছে শরীরে। বহুরাতের বকেয়া অনিদ্রায় ভারি হচ্ছে চোখ। পল্লবের মনে হল, কাকচক্ষু জল, এক গভীর দীঘিতে অতি ধীরে সে ডুবে যাচ্ছে। কাছে কোনও গির্জার ঘড়িতে চারটে বাজার ধাতব, গম্ভীর ধ্বনিতে চমকে উঠল সে। তন্দ্রা ছুটে যেতে দারুণ শীতে কাঁপুনি লাগল তার। প্রায় আধঘণ্টা পরে ঘরে ঢুকে পল্লবকে দেখে চিনতে পারলেন না কলিন্স? সত্যি কি তাই, অথবা না চেনার ভান করলেন?

রোগের ইতিহাস পল্লব শোনাল কলিন্সকে। ইতিহাস শুনে এক্স-রে, ই সি জি খুঁটিয়ে দেখে গম্ভীর মুখে কলিন্স বললেন, মাইটাল স্টেনোশিস অ্যান্ড এওর্টিক ইনকমপিটেন্স।

দামী সিগারের হাল্কা সুবাস বেরচ্ছে কলিন্সের শরীর থেকে। জ্যাকেটের নিচে ফুলশার্টের কাপলিঙ্কে জ্বলজ্বল করছে কচি ডুমুরের মত জোড়া হীরে। কলিন্স বলল, য়ু নিড্ অপারেশন, তোমাকে অপারেশন করাতে হবে। লম্বা ওয়েটিং লিস্ট। টার্ন এলে যথাসময়ে চিঠি দিয়ে ডাকা হবে তোমাকে।

কত দিন পরে, তেইশে মার্চ মঙ্গলবার, ঊনষাট দিন ফুরোবার আগেই কি সে সুযোগ পাবে, হাসপাতাল থেকে ডাক আসবে, ইচ্ছে থাকলেও পল্লব প্রশ্ন করতে পারল না। কলিন্স ঘর থেকে চলে যেতে পোশাক পরে বসার ঘরে ফিরে পল্লব দেখল, হাতে পাকানো সিগারেট টানছে সুন্দরলাল। পাশে একটা সোফায় মুমু ঘুমোচ্ছে। পল্লবকে দেখে সিগারেটে শেষ দুটো টান দিয়ে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সুন্দরলাল। ঘুম থেকে ডেকে তুলতে ফ্যালফ্যাল করে বাবার দিকে তাকিয়ে মুমু হদিশ করছে, কোথায় সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। পল্লবকে সুন্দরলাল প্রশ্ন করল, কলিন্স কী বলল ?

কলিন্স যা বলেছে পল্লব শোনাল সুন্দরলালকে। আউটডোরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে গেল সুন্দরলাল। তার কপালের চামড়া কুঁচকে গেছে। এক সেকেন্ড থম দাঁড়িয়ে পল্লবের কাঁধে হাত রেখে সুন্দরলাল বলল, ডোণ্ট্ ওরি, ভয় পেও না। ব্যবস্থা একটা হবে।

পল্লব সাড়া করল না। পল্লবের মনে হল, ঘন অন্ধকারে সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে মাঝে মাঝে দপ করে যে আলো জ্বলে উঠছে, তা আলো নয়, আলেয়া, চেষ্টা করেও ধরা যাবে না। একটা করে দিন শেষ হয়ে, ফুরিয়ে যাচ্ছে। এক অদৃশ্য সিরিঞ্জে তার শরীরের রক্ত শুষে নিচ্ছে কেউ। ধীরে ধীরে বাতাস বেরিয়ে চুপসে যাওয়া বেলুনের মত দু মাস ধরে সে পড়ে থাকবে মাটিতে। কেউ ফিরে তাকাবে না।

ঘুম ভাঙতেই শুরু হয়েছে মুমুর দস্যিপনা। দৌড়ে বাগানে গিয়ে একমুঠো জিনিয়া ফুল ছিঁড়ে আনল সে। সুন্দরলাল চেঁচিয়ে উঠল, য়ু সিলি বিলি……।

টেমস্ নদীর ওপর দিয়ে লণ্ডন ব্রিজ ধরে হাঁটছে তিনজন। আলো জ্বলছে নদীর তীরে। টেমসের সবুজ জলে ভাসছে স্পিড বোট, লঞ্চ, পাল তোলা ছোট নৌকো, ইয়াচ্। আলোয় ঝলমল করছে হাওয়ায় ফোলা রঙবেরঙের পাল। রাস্তায় দু চারজন পথচারী, অনেক গাড়ি, গাড়ির স্রোত বয়ে যাচ্ছে। কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরছে মানুষ। লণ্ডন ব্রিজ টিউব স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে আবার টটেনহাম কোর্ট রোড, আকাশ ছোঁয়া এসকালেটর দেখে এবার বুক কাঁপল না পল্লবের। ব্যস্ত মানুষ ঝড়ের বেগে এসকালেটরে ওঠানামা করছে। ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়ার ভয়ে বাঁদিক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে পল্লব। তাড়া থাকলেও কারও গায়ে গা লাগছে না। এসকালেটরের বাঁ পাশের দেওয়ালে হরেক জিনিসের রঙীন বিজ্ঞাপনে তাজা, উজ্জ্বল, হাসিমুখ মেয়েপুরুষের ছবি। মেয়ে বেশি, পুরুষ কম। স্টেশনের বাইরে এসে একটা উইম্পি বারে ঢুকে তিনপ্লেট ফিশ অ্যান্ড চিপস্ নিয়ে এল সুন্দরলাল। ক্ষুধার্ত মুমু, গপগপ করে খাচ্ছে। বিস্বাদ মুখ, পল্লবের খেতে রুচি নেই।

সাড়ে ছটায় পদ্মা রেস্টুরেন্টে পল্লব পেঁছে গেল। তার সঙ্গে সুন্দরলাল, মুমু। পদ্মা রেস্টুরেন্টের ভেতরটা তাজমহলের মত সাজানো না হলেও বেশ ছিমছাম, পরিষ্কার। কাউন্টারে মাঝবয়সী একজন মেমসাহেব। চার, পাঁচজন খাচ্ছে। দুদু মিঞাকে পেতে পল্লবের অসুবিধে হল না। একটা লম্বা সোফায় তিনজনকে বসিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল দুদু মিঞা। এ রেস্টুরেন্ট সুন্দরলালের অচেনা। ভেতরটা সে খুঁটিয়ে দেখছে। কাউন্টারের মেমসাহেব হঠাৎ চাটগাঁর ভাষায় কাউকে ধমক দিল। রান্নাঘর থেকে ফিরে দুদু মিঞা তখনই পল্লবের সামনে চেয়ার টেনে বসেছে। কাউন্টারের মেমসাহেবকে দেখে দুদু মিঞা বলল, উনি আমার স্ত্রী।
চাটগাঁর শব্দ মেশানো ভাঙা বাংলায় বলা দুদু মিঞার সব কথা পল্লব বুঝতে পারছে না। সুন্দরলালের মাতৃভাষা গুরুমুখী। দুদু মিঞার কথা একটা বর্ণ তার বোধগম্য নয়। রোগা, বেঁটেখাটো শরীর, কদমছাট চুল, কুঁতকুঁতে চোখ, চাপা নাক, ফ্যাসফেসে ফর্সা মঙ্গোলিয়ান গঠন দুদু মিঞাকে আগ্রহ নিয়ে দেখছে পল্লব। সুট, টাই-এ কেতাদুরস্ত দুদু মিঞার মুখে তার ভাষা

মানাচ্ছে না। দুদু মিঞা বলল, আমার এক বিবি বাংলাদেশে আছে। বছরে একবার, বিবির টানে নয়, দেশের মায়ায় চাটগাঁ যাই।

সুন্দরলালের কপালের রেখা গভীর হতে দেখে পল্লব বুঝল, তার পছন্দ হয়নি দুদু মিঞাকে। দুদু মিঞার কথায় কান না দিয়ে নিঃশব্দে সিগারেট পাকাচ্ছে সুন্দরলাল।

দুদু মিঞা বলল, আপনার কথা কাল ফোনে রায় জানিয়েছে আমাকে। আজ ভাঙা হপ্তায় শুরু না করে কাল থেকে আপনি কাজে লেগে যান। সন্ধ্যে সাতটা থেকে রাত বারটা পর্যন্ত আপনার ডিউটি। কাজের সময়টা একটু বদখত। কিন্তু কী করা যাবে। সাতটা থেকে খদ্দের লাগে, এঁটো বাসন জমা হয়। বাসন ধোয়ামোছা আপনার কাজ। বেসিনে গরম, ঠাণ্ডা জল আছে। হপ্তায় পাঁচ দিন কাজ, মাইনে দশ পাউণ্ড। দু চার মাস পরে মাইনে বাড়বে। ওভারটাইম কাজ করলে উইকে পনের ষোল পাউণ্ড রোজগার করতে পারবেন আপনি।

মন দিয়ে শুনে দুদু মিঞার কথার কিছু অংশ, বিশেষ করে হপ্তায় পাঁচ দিন কাজ, দশ পাউণ্ড মাইনে সুন্দরলাল বুঝতে পেরেছে। গম্ভীর গলায় সুন্দরলাল বলল, হপ্তায় মাত্র দশ পাউণ্ড। সুন্দরলালের কথায় অখুশি দুদু মিঞা বলল, দ্যাহেন, ভিজিটরদের কাজ দেওয়াই বেআইনী। রায়ের অনুরোধে ঝুঁকি নিয়েছি। দশ পাউণ্ডের বেশি দিতে পারব না।

কিছু বুঝে অথবা না বুঝে, দুদু মিঞার কথা শুনে সুন্দরলাল হাসল। মাইনে নিয়ে দরাদরিতে পল্লব বিব্রত। হপ্তায় দশ পাউণ্ড তার কাছে অনেক টাকা। টাকার চেয়ে বড় হল, এ চাকরির সুবাদে ট্যাক্স দিয়ে এ দেশে চিকিৎসা পাবার বৈধ অধিকার অর্জন করবে সে। তখন বুক ফুলিয়ে জি পি বা কলিন্সের কাছে যেতে পারবে। দশ পাউণ্ডেই রফা করল পল্লব।

চা কফি ?

দুদু মিঞার প্রশ্নে অখুশি গলায়, নো থ্যাঙ্কস্ বলে মুমুর হাত ধরে সোফা থেকে উঠে পড়ল সুন্দরলাল। মুমু ঘুমে ঢুলছিল। হাতে টান পড়তে চমকে গেল সে

পদ্মা রেস্টুরেন্টে তিন দিন কাজ করে, পল্লব টের পাচ্ছিল যে কোনও মুহূর্তে বাসন ধোয়ার বেসিনে মুখ গুঁজে পড়ে সে মারা যাবে। আজ চতুর্থ দিন। আজ কাজ শেষ হলে উইকএন্ড শুরু, পরপর দুদিন শনি, রবিবার

ছুটি। খাবার ঘরের পেছনে বাসন মাজার ঘরে দু'দেওয়ালে বড় সাইজ, ঘুলঘুলির মত দুটো ফোকর। রান্নাঘর, খাবার ঘরের ব্যবহৃত, এ'টো যত বাসন এ দুই ফোকর দিয়ে মাজা ধোয়ার জন্যে পল্লবের সামনে বেসিনের দুদিক ভাগাড় হয়, তারপর সাফসুফ হয়ে জায়গা মত চলে যায়। নোংরা, ঠাণ্ডা ছোট ঘরে দুহাতে পাতলা রবারের দস্তানা, পল্লব ঠকঠক করে কাঁপছে। কাল থেকে উইক্এণ্ড্ শুরু হচ্ছে। রেস্টুরেণ্টে আজ তাই খুব ভিড়। সন্ধ্যে সাতটায় অর্ধেকের বেশি টেবিল ভরে গেছে। পল্লবের সামনে স্টিলের বেসিনের দু-হাতায় এই সওয়া সাতটায় ধোয়ার জন্যে লাট লেগেছে বাসন। শীতে কাঁপতে কাঁপতে এ'টো প্লেট, বাটি, কাঁটাচামচ গরম, ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে ডান দিকের স্টিলের র‍্যাকে তুলে রাখছে পল্লব। মাঝে মাঝে গরম জল বন্ধ হয়ে তোড়ে ঠাণ্ডা জল বেরোতে থাকে। বেসিনের দু'কলেই তখন ঠাণ্ডা জলের স্রোত। দু'হাতের পাতলা রবারের দস্তানা ভেদ করে শীত হাড়ে ঢুকে যায়। আজও সেরকম হল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় পল্লব জমে যাচ্ছে। দু'চোখের দৃষ্টি ঝাপসা, গলা কাঠ, মাথা ঝিমঝিম করছে। আর বেশিদিন, এমনকি আগামী হপ্তা পর্যন্ত চাকরি করার সামর্থ, যে নেই, বুঝতে পারছে পল্লব। কয়েকদিন চাকরি করেই অর্ধেক হয়ে গেছে তার জীবনীশক্তি। পদ্মায় সে চাকরি নেওয়াতে সুন্দরলাল খুশি নয়। মুখে না বললেও নিজের অসন্তোষ আভাসে জানিয়েছে সুন্দরলাল। কেন সে অখুশি, পল্লব জানে না। সুন্দরলালই উদ্যোগ নিয়ে চাকরি খুঁজে দিয়েছে পল্লবকে। চাকরির কথা পল্লব কখনও ভাবেনি। ভাবার সাহস পায়নি। চাকরি করার মত শরীরের অবস্থাও তার নয়। শুধু সুন্দরলালের উৎসাহেই সে চাকরি করছে। খুব বেশিদিন এ চাকরি করা সম্ভব হবে না সেকথাও পল্লবের অজানা নয়। কিন্তু সুন্দরলালের অখুশি, অসন্তোষে ব্যথিত হয়েছে পল্লব। সুন্দরলালের ক্ষুণ্ণ হওয়ার কারণ পল্লব কিছুটা অনুমান করতে পারে। আটাশ বছর ইংল্যাণ্ডে থেকেও হাড়ে, মজ্জায় সুন্দরলাল ভারতীয়। তার অনুমতি ছাড়া পদ্মার চাকরি পল্লব নেওয়ায়, বয়স্ক মানুষটার অভিমানে লেগেছে। সংসারের কর্তা হিসেবে নিজেকে পল্লবের স্বাভাবিক অভিভাবক ভেবেছিল সুন্দরলাল। তার ধারণা, তার সে অভিভাবকত্ব পল্লব মানেনি। সুন্দরলালের ক্ষুণ্ণ, অখুশি হওয়ার আর একটা কারণ পল্লব খুঁজে পেয়েছে। অসুস্থ শরীরে সে চাকরি করলে আধা সুস্থ বেকার সুন্দরলাল, বাড়ি বসে থাকতে অস্বস্তি বোধ

করবে। হ্যাঁ, সুন্দরলালের অসন্তুষ্ট হওয়ার এটাও একটা কারণ। পল্লবের চাকরির জন্যে অসীমকে যখন সুন্দরলাল বলেছিল, তখন সে তার মনের খবর জানত না। জানল অনেক পরে, পল্লব চাকরি শুরু করার পর।
সামান্য এই জটিলতা বাদ দিলে পল্লবের জন্যে সুন্দরলালের উদ্বেগ সহানুভূতি, মমতায় কোন ভেজাল নেই। নিছক বন্ধুবাৎসল্যেই সে বাঁচাতে চায় পল্লবকে। পল্লবের জন্যে যে কোনও ঝুঁকি সুন্দরলাল নিতে পারে। তার ছোটখাটো দোষ, দুর্বলতা ঢেকে দিয়েছে তার উদারতা, মহত্ত্ব। সুন্দরলালের মনের অনেকটাই পল্লব স্পষ্ট দেখতে পায়। যত দেখে, তার কাছে বেড়ে যায় সুন্দরলালের আকর্ষণ।

প্লেট, ডিশের পাশাপাশি জমছে ক্যাসারোল সেট, হাঁড়ি, গামলা, বাটি, রান্নার সরঞ্জাম। বাঁ দিকের দেওয়ালের চৌকো ঘুলঘুলি দিয়ে রান্নাঘরের দুই কুক দাশগুপ্ত আর আলমের মুখের আধখানা, সিকিভাগ দেখতে পাচ্ছে পল্লব। দাশগুপ্ত বেশিরভাগ সময় ডিম ভেজে যায়। এখনও ভাজছে। অন্য ভাজাভুজিও করতে হয় তাকে। মূল রাঁধুনী আলম। দুজনের গলায় ঝুলছে সবুজ এ্যাপ্রন্। পল্লবকেও একটা এ্যাপ্রন্ দিয়েছে দুদু মিঞা। প্রথম দিনের পর এ্যাপ্রনটা সে আর পরেনি। দাশগুপ্ত, আলমের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে পল্লবের। দাশগুপ্ত ছাত্র, ফুর্তিবাজ ছেলে। আলম ঠিক কী করে জানতে পারে নি পল্লব। কিন্তু সে খুব গম্ভীর। ঘুলঘুলির সামনে এক মগ গরম কফি রেখে পল্লবকে দাশগুপ্ত বলল, কফি।
মগ থেকে ধোঁয়া উড়ছে। দু'হাতের মোজা খুলে, ডানহাতে কফি মগ তোলার সময় পল্লব টের পেল, জলে ভেজা হাত অসাড়, জোর নেই। দুহাতে গরম মগটা জড়িয়ে ধরল সে। মগের তাপ অসাড় হাতের পাতায় জড়িয়ে গেল। আহ, কী আরাম!
মাঝে মাঝে দুদু মিঞা রান্নাঘরে এসে আলমকে কিছু বলছে। ডিম, সাদা পরোটা, আলু পরোটা, কখনও পাঁপড় ভেজে চলেছে দাশগুপ্ত। রেস্টুরেন্ট জমজমাট, এঁটো বাসন আসা দেখে পল্লব বুঝছে, আর জায়গা নেই। কথা, হাসি, কাঁটাচামচ, প্লেটের শব্দ। কফি খেয়েও শরীরে জুত পেল না পল্লব। পায়ের তলার মাটি কাঁপছে। বেসিন ধরে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে

পল্লব হিসেব করল, আর তিপ্পান্ন দিন আছে। তারপর পৃথিবী থেকে মুছে যাব আমি। কত কাজ ছিল আমার, করা হল না। কত ইচ্ছে অপূর্ণ থেকে গেল।

অনিতা, বাবুন, ফুলিকে নিয়ে ময়দানে সবুজ ঘাসের ওপর একটা দুপুর পল্লবের কাটাবার ইচ্ছে ছিল। ঘাসে শরীর এলিয়ে, ছেলেমেয়ের দৌড়, খেলা, হইচই দেখবে, খোশগল্প করবে অনিতার সঙ্গে। আজ, কাল করে যাওয়া হয় নি। কোনদিন আর যাওয়া হবে না। ব্যথায় হুহু করে ওঠে পল্লবের বুক। কত মূল্যবান দিন, সকাল, সন্ধ্যে বাজে কাজে অপচয় করার জন্যে অনুতাপ হল তার। এই সকাল, সন্ধ্যে গুলো যদি সে বৌ, ছেলেমেয়ের জন্যে দিতে পারত! দেওয়ার যখন ইচ্ছে জাগল, তখন সে শয্যাশয়ী, কিছু করার নেই। চোখ বুজে পল্লব বুঝছে বেসিনে বাসনের পাহাড় জমছে। তার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে দাশগুপ্ত প্রশ্ন করল, শরীর খারাপ?

পল্লব সজাগ হল। বেসিনে ঠাণ্ডা, গরম জল ভরে লিকুইড্ সাবান ঢালল। দুহাতে রবারের দস্তানা পরে সে বাসন ধোয়া শুরু করতে দরজায় উঁকি দিয়ে দুদু মিঞা বলল, কি ছাহেব, এঁটো বাসন ডাঁই করে রেখেছেন কেন? কয়েক সেকেণ্ড পল্লবের কাজ দেখে দুদু মিঞা বলল, হাতমুজো খুলে কাজ করলে অনেক চটপট! বে

পল্লব তাই করল। রবারের দস্তানা খুলে হাত ডোবাল বেসিনের জলে। সাবান জলে ডুবে থাকা তার ফ্যাকাসে হাত আধঘণ্টা পরে আরও ফ্যাকাসে, মরা মানুষের হাতের মত হয়ে গেল। রাত বাড়ার সঙ্গে রেস্টুরেণ্টের ভিড়, গুঞ্জন কমে যাচ্ছে। কলের পুতুলের মত বেসিনে ধুয়ে, গরম জলের ভ্রামে ডুবিয়ে, তোয়ালেতে মুছে র‍্যাকের ওপর বাসন রেখে দিচ্ছে পল্লব। অবসাদ, ক্লান্তিতে দুমড়ে যাচ্ছে শরীর, তবু শেষ নেই, ছুটি নেই। হপ্তায় দশপাউণ্ড মাইনের সঙ্গে পাবে ইনসিওরেন্সের কার্ড। দুদু মিঞা আশ্বাস দিয়েছে, কার্ড তাড়াতাড়ি এসে যাবে।

ব্যস্, কার্ড হাতে এলে কেল্লা ফতে। নিজের অধিকারে তখন সে ডাক্তার, হাসপাতালের সুযোগ নেবে। কারও কৃপা করুণার মুখাপেক্ষী থাকতে হবে

না তাকে। বাঁচার এখন এই একটা রাস্তা, যেভাবে হোক, এ চাকরি বাঁচিয়ে রাখতে হবে। হাত থেকে একটা প্লেট পড়ে গিয়ে ঝনঝন শব্দে ভেঙে যেতে ছুটে এল দুদু মিঞা। লজ্জায় অধোবদন পল্লব নিচু হয়ে কাঁচের টুকরো কুড়োতে লাগল। দুদু মিঞার দিকে চোখ তুলতে সাহস পেল না। দুদু মিঞা বলল, প্রথম হপ্তায় এরকম হবে, দু'চারটে প্লেট ভাঙবে, তারপর ঠিক হয়ে যাবে। আপনি ভাববেন না। মাইনের সঙ্গে কাটাকুটি করে নেব।

এই চারদিনে পল্লব হিসেব করল, ছ'টা প্লেট, দুটো বাটি সে ভেঙেছে। হাতে তার জোর নেই। শক্ত করে ধরেও সে টের পায় মুঠো আলগা, ধরা জিনিস খসে যাচ্ছে।

দুটো চাপাটি, মাংসের কোর্মা নিয়ে টেবিলে দুদু মিঞার মুখোমুখি রাত প্রায় বারটায় খেতে বসল পল্লব। অনেক আগেই দুদু মিঞার খাওয়া শেষ। সে বসেছে এক পাঁইট বিয়ার নিয়ে। দাশগুপ্ত, আলম চলে গেছে এগারটায়। রেস্টুরেন্টের সামনের দরজা বন্ধ। খালি কাউন্টারের পাশে লম্বা সোফায় দুদু মিঞার বাংলাদেশী শ্যালক, ফাইফরমাস খাটার লোক, জিয়াদ ঘুমোচ্ছে। দুদু মিঞার মেম বৌ ঠিক দশটায় দোতলায় চলে গেছে। হোটেলের ওপরে দুদু মিঞার বাসস্থান। এ বাড়ির মালিকও দুদু মিঞা। মুখে স্বাদ, পেটে ক্ষিধে না থাকায় রুটি, মাংসের টুকরো পল্লব চিবিয়ে যাচ্ছে, গিলতে পারছে না। চোঁচোঁ করে বিয়ার খাচ্ছে দুদু মিঞা। পল্লবের স্নায়ু, শিরায় অস্থির দপদপানি, দু-কানে গভীর ভোঁ ভোঁ আওয়াজ। এক পাঁইট শেষ করে আবার বিয়ার নিল দুদু মিঞা। পল্লবের দিকে তাকিয়ে দুদু মিঞা বলল, এদেশে এসে প্রথম কয়েকমাস সকলেই খুব মনমরা হয়ে থাকে। তারপর ঠিক-ঠাক হয়ে যায়। বিশবছর আগে যে জাহাজে আমি কাজ করতাম, সেই জাহাজ থেকে লিভারপুলে নেমে গা ঢাকা দিয়েছিলাম। জাহাজের রসুইখানায় কাজ করতাম, একবর্ণ ইংরিজি বলতে, বুঝতে পারতাম না। আজও খুব একটা পারি না। মেমবিবিকে তাই চাটগাঁইয়া ভাষা শিখতে হয়েছে। জাহাজ থেকে নেমে পাঁচ, সাত দিন বার্মিংহামে লুকিয়ে থাকলাম। তারপর এক দেশের লোকের দয়ায় লণ্ডনে রসুল ছাহেবের বাগানের কাছে একটা দিশি রেস্টুরেন্টে কাজ পেলাম।

এক চুমুক বিয়ার খেয়ে দুদু মিঞা প্রশ্ন করল, রসুল ছাহেবের বাগান চেনেন তো ? ওই যাকে আপনারা রাসেল স্কোয়ার বলেন। সেই বাগানের কাছে ইটালিয়ান হাসপাতালের পেছনের রাস্তায় ছিল আমার কাজের জায়গা। রাস্তার নাম কাজের জায়গা প্রথম সাতদিন, রোজ গোলমাল হয়ে যেত। ভয়ে টিউব ট্রেনে চাপিনি এক বছর। কাজের জায়গায় বাসে যাতায়াত করতাম। বাসস্টপ রোজ গুলিয়ে ফেলতাম। আসল বাসস্টপের আগে বা পরে নেমে নাজেহাল হতাম। একদিন বুদ্ধি করে কাজের জায়গা থেকে একটা থান ইট বয়ে এনে বাসস্টপের গায়ে ল্যাম্পপোস্টের তলায় রেখে দিলাম। মনে খুব শান্তি, কাল আর বাসস্টপ চিনতে ভুল হবে না। পরদিন খুব সাহস নিয়ে বাসে উঠলাম। জানলার ধারে বসে কাঁচে চোখ রেখে যাচ্ছি। কিন্তু চলেছি তো চলেছি। ইট খুঁজতে খুঁজতে বাস টার্মিনাসে পৌঁছে গেলাম। সেদিন আর কাজে যাওয়া হল না। থান ইট যে সাতসকালে ঝাড়ুদার সরিয়ে দিয়েছে, অনেক পরে বুঝতে পেরেছিলাম। পেটে একটা বড় পিলে ছিল আমার। যে রেস্টুরেন্টে বয়ের কাজ করতাম, সেখানে সাদা চামড়ার খদ্দেররা আমার পিলে দেখে হাসাহাসি করত আঙুল দিয়ে কেউ কেউ এমন জোরে খোঁচা মারত যে আমার দম আটকে যেত। ভাষা জানা না থাকায় কিছু বলতে পারতাম না। তারপর ধীরে ধীরে দু'একটা ইংরিজি বুলি শিখলাম, আদবকায়দা শিখলাম, পেটের পিলে চলে গেল, নিজে দোকান দিলাম, মেম বিয়ে করলাম।

কথা বলতে বলতে দুদু মিঞার কুতকুতে ছোট দুচোখ তৃপ্তিতে বুজে গেল। খাওয়া শেষ করে হাত, মুখ ধুয়ে এসে পল্লব দেখল, আধগ্লাস বিয়ার নিয়ে তখনও দু'চোখ বুজে দুদু মিঞা বসে আছে। লোকটা জেগে না ঘুমিয়ে বুঝতে পারল না পল্লব। পদ্মা রেস্টুরেন্ট থেকে ওয়ারেন স্ট্রিট টিউব স্টেশন অনেকটা পথ। পায়ে হেঁটে স্টেশনে পৌঁছতে পাঁচ, সাত মিনিট লাগে। গ্যাসোলিনের হলুদ আলোয় বৃষ্টিতে ভেজা পিচের কালো রাস্তা খাঁ-খাঁ করছে। রাস্তায় হুস করে মিলিয়ে যায় দু'একটা গাড়ি। জলের গুঁড়ো মেশা কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় রাস্তা যেন হিমবাহ। বেতাল পায়ে পল্লব যেভাবে হাঁটছে, তা সুস্থ মানুষের হাঁটা নয়। নির্জন, ফাঁকা রাস্তায় টলমল পায়ে হাঁটতে গিয়ে পল্লবের মনে হচ্ছে, বাড়ি ফিরতে পারব তো ? রাস্তায় পা দিলেই এখন এ প্রশ্ন তার মাথায় চিকুর দেয়। বাড়িতে বসে ভাবে, রাস্তায় কি আবার হাঁটতে পারব ?

পৃথিবীতে একজন মানুষের দিনগুলো ফুরিয়ে এলে বোধহয় এসব প্রশ্ন সবসময়ে তার মাথায় জাগে। উদ্বেগ ঘন হয়। তখন দিন কাটে তো রাত কাটে না, ঘণ্টা কাটে, মিনিট থমকে যায়, প্রতিটা মুহূর্ত অন্তহীন মৃত্যুর ছবি আঁকে। অন্ধকার, নিস্তব্ধ ফাঁকা এই রাস্তা, পৃথিবী পল্লবের খুব চেনা, নিজের মনে হয়। অন্ধকারে সব এক, একাকার মনোহর স্ট্রিট, ওয়ারেন স্ট্রিট, হ্যাম্পস্টেডে কোনও তফাত নেই। এখন ভিজে, কালো এই রাস্তায় ফট করে মরে গেলেও তার কোনও কষ্ট হবে না। মনে হবে, মায়ের কোলে শুয়ে সে মরেছে। সনাতন অন্ধকার রাত্রির সে সন্তান, এগিয়ে চলেছে অন্ধকারের দিকে। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড ক্রমশঃ ভারী, লম্বা হয়ে পাথরের পেণ্ডুলামের মত দুলছে। ওয়ারেন স্ট্রিট টিউব স্টেশনের কাউণ্টারে পল্লব একা, আর কোনও যাত্রী নেই। দুটো এসকালেটর ওপরে, নিচে ঘুরে চলেছে। এসকালেটরে কয়েকজন মানুষ নামছে। মাটির নিচে দু'তিন তলা টানেলের একটা দিয়ে গুমগুম ধ্বনি আর ঘূর্ণি হাওয়া ছড়িয়ে একটা ট্রেন চলে গেল। বেলসাইজ পার্ক পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে আবার হাঁটা পথ। এই রাস্তাতেই গত কয়েকদিন যাতায়াত করছে পল্লব। প্রথম দিন, দুদু মিঞার মত রাস্তা ভুল করে ঘুরপাক খেয়েছিল কয়েকবার। রাস্তায় একজনও মানুষ ছিল না, যাকে প্রশ্ন করে পথের হদিস নেবে। সে ভুল গত দু'দিন আর করেনি।
ক্লান্ত শরীরে পল্লবের মনে হল, কাঁধে একটা বিশাল পাথর নিয়ে সে হাঁটছে। ভিজে রাস্তা, ভিজে ওভারকোট, ট্রাউজারস, জুতো, পল্লব হাঁপাচ্ছে। বুবেরি রোডে যখন সে বাড়ি পেঁছিল, রাত একটা, সুন্দরলাল তখনও জেগে আছে। পল্লবকে এক পলক দেখল সুন্দরলাল। পল্লবও তাকাল সুন্দরলালের দিকে। পল্লবের মনে হল তার চোখের সামনে সুন্দরলালের মুখ, ঘর, ঘরের দেওয়াল, দেওয়ালের আলো, আসবাব, পিয়ানো, সব গলে যাচ্ছে। ধপ করে একটা সোফায় বসে পড়ল পল্লব। তার মনে হল, বাঁচার জন্যে শুধু ইচ্ছাশক্তি যথেষ্ট নয়।

বেলা ন'টার পাঁচ দশ মিনিট পরে একটা ফোন এল। রিসিভার কানে লাগিয়ে শুনে সেটা পল্লবকে বাড়িয়ে দিল সুন্দরলাল। রিসিভার ধরে পল্লব বলল, হ্যালো।
শান্তা বলছি। কেমন আছ?

শান্তার গলা শুনে ধক করে উঠল পল্লবের বুক। চেনা কণ্ঠস্বরের জাদুতে পল্লবের মনে পড়ল, কলকাতা, ইউনিভার্সিটি, শীতে দুপুরে গোলদীঘির আড্ডা, পরিচিত নানা মুখ, মানুষ, ঘটনার স্মৃতি। শান্তার কথা, ধ্বনি হয়ে বাজছে, সব শুনতে পাচ্ছে না পল্লব। শান্তা বলছে, পদ্মা রেস্টুরেন্টে তোমার চাকরি করার খবর অসীমদার মুখে শুনেছি। শরীর পারমিট্ করছে তো ?

জানলার বন্ধ কাঁচের ওপাশে ছাইরাঙা আকাশের গায়ে গির্জার ক্রশ, কুয়াশা, আবছা শব্দ করল পল্লব।

আজ কি করছ, জানতে চাইল শান্তা।

আজ ছুটি।

আমার বাড়ি চলে এস। এখানে লাঞ্চ খাবে।

কোনও জবাব চট করে মাথায় না আসতে সুন্দরলালের দিকে তাকাল পল্লব। আসছ, জানতে চাইল শান্তা।

শান্তার কথা না শুনেও সমস্যাটা বুঝতে পেরে সুন্দরলাল বলল, যাও, ঘুরে এস।

বাড়ির ঠিকানা, কীভাবে যেতে হবে জানিয়ে ফোন ছেড়ে দিল শান্তা। রিসিভার রেখে পল্লব দেখল, গম্ভীর মুখে সিগারেট পাকাচ্ছে সুন্দরলাল। তার কপালে দুর্ভাবনার রেখা। তাকে নিয়েই যে সুন্দরলালের দুশ্চিন্তা, পল্লব বুঝতে পারল। কোনভাবে পল্লবের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে না পারায় সুন্দরলালের অভিমান আহত হয়েছে। মুমূর্ষু পল্লবকে যে চাকরি নিয়ে নিজের চিকিৎসার আয়োজন করতে হচ্ছে, এ ঘটনা সইতে পারছে না সুন্দরলাল। সুন্দরলালের কথা, ভারতবর্ষ নিয়ে আলোচনার আগ্রহও কমে গেছে। সুন্দরলাল নিজের মনে বিড়বিড় করল, একটা কিছু হওয়া উচিত। রানীকে লেখা তোমার চিঠি প্রায় একমাস হল, জবাব এল না।

শান্তার ফোন পেয়ে পল্লবের মনে একটা ঘুমানো ইচ্ছে জেগে উঠল। এ ইচ্ছে নিষিদ্ধ, গোপন। বিনয়ের বসার ঘরে পল্লবের অসুস্থতা, সংকটের কাহিনী শুনে ঠাট্টা করে এ প্রসঙ্গ পেড়েছিল সতুমামা। সতুমামা বলেছিল, এটা গল্প নয়, এদেশে হামেশা এ ঘটনা হয়। এদেশের মেয়ে বা আইবুড়ো স্থায়ী বাসিন্দাকে বিয়ে করে যে কোনও বিদেশী পুরুষ এখানে পাকাপাকি

থেকে যেতে পারে। বেশ কিছু ইংরেজ মেয়ে বিয়েটাকে পেশা হিসেবে নিয়েছে। মোটা টাকার বিনিময়ে এদেশে থাকতে চায়, এমন একজন ধনী লোককে এই মেয়েরা কয়েক মাসের চুক্তিতে বিয়ে করে। চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে নতুন খদ্দের পাকড়ায়। বিয়ের ব্যবসাতেও টাউট্, ফোড়ে আছে। তারা যোগাযোগ করে দেয়। অনেক বিদেশী বিয়ে করে এদেশে এমিগ্রাণ্ট্ হয়ে গেছে।

কথা শেষ করে পল্লবকে সতুমামা বলেছিল, এরকম একটা মেয়ে খুঁজে বার করুন। আমার ধারণা চেষ্টা করলে ভারতীয় মেয়েও পাওয়া যাবে।

সতুমামার প্রস্তাব শুনে জয়া, রিনি খুব হেসেছিল। অবশ্য হেসেই জয়া বুঝেছিল, কাজটা ঠিক হয়নি। বলেছিল, একজন অসুস্থ মানুষকে নিয়ে মজা করা ঠিক নয়।

শান্তার ফোন পেয়ে এক গূঢ় ইচ্ছে পল্লবের মাথায় পেখম মেলল। রানীর জবাব, হাসপাতালের ওয়েটিং লিস্টের ওপর নির্ভর করে অপারেশনের আশায় বসে থাকলে সে মরে ভূত হয়ে যাবে। বিদেশী, রবাহূত বিত্তহীন, কালো চামড়ার মানুষ হয়ে অপারেশনের সুযোগ পাওয়ার প্রতিযোগিতায় সে পাত্তা পাবে না। সুযোগ যখন আসবে, তখন জীবনের বাকি বাহান্ন দিন ফুরিয়ে যাবে। তার আগেই বুদ্ধি খাটিয়ে একটা উপায় করতে হবে। সরাসরি সব বললে শান্তা হয়ত রেগে অপমান করে বসবে। তা করুক। তবু পল্লব বলবে, আমাকে বাঁচাও, একমাত্র তুমি বাঁচাতে পার আমাকে।

চোখের সামনে সকালে টাইম্‌স্ পত্রিকা খুলে সাতপাঁচ ভেবে যায় পল্লব। আপন মনে বলে, আমি ভাগ্য, ভগবানে বিশ্বাস করি না। কিন্তু একটা কিছু বিশ্বাস করি, মানি। তা না হলে, মৃত্যুর সঙ্গে এতদিনে একটা রফা হয়ে যেত আমার। সে রফা, চুক্তি আমি করিনি। কীসের জোরে কোন তাড়নায় এ যুদ্ধ আমি চালিয়ে যাচ্ছি?

পুরনো অনেক কথা, ভবানীপুরে শান্তাদের বাড়ি তার বাবা, মা, চারবোনের মুখ মনে পড়ল পল্লবের। বেশ কয়েকবার শান্তাদের বাড়ি পল্লব গেছে। পাঁচ বোনের মধ্যে শান্তা ছিল বড়। ভাই ছিল না শান্তার। ছোট একটা ব্যবসা করত শান্তার বাবা। শান্তার মা, চার বোন পল্লবকে পছন্দ করলেও আখতারকে দেখতে পারত না। শান্তা, আখতারের সম্পর্ক কীভাবে আঁচ করে শান্তার মা একদিন পল্লবকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছিল,

শান্তাকে তুমি বাঁচাও। শান্তা কিছু করলে আমার আর চারটে মেয়ের বিয়ে হবে না।

তখনই শান্তা ঘরে ঢুকল। মার সঙ্গে পল্লবকে দেখে চোখে বিস্ময় মুচকি হেসে শান্তা প্রশ্ন করেছিল কী ষড়যন্ত্র হচ্ছে ?

প্রশ্ন শুনে পল্লব হেসেছিল। প্রশ্নটা আর কচলায়নি শান্তা। অন্যকিছু ভাবতে শুরু করেছিল। এলোচুল পিঠে ছড়িয়ে ছিপছিপে, ফর্সা মেয়েটা বাসস্টপে এগিয়ে দিয়েছিল পল্লবকে। শান্তার মার কথা, গলার স্বর, শান্তার ভাবুক ভঙ্গিতে গা ছমছম এক বিভ্রম তৈরি হয়েছিল পল্লবের মনে। সে বিভ্রমের মানে পল্লব আজও বুঝতে পারেনি। না বুঝলেও শান্তাকে আজও বন্ধু, আপনজন মনে করে পল্লব। বিলেতে এসে আখতার, পরে শান্তা নিয়মিত দুতিন বছর চিঠি লিখেছিল পল্লবকে। তারপর কখন যে চিঠি বন্ধ হয়ে গেল, পল্লব ভুলে গেছে। ওদের চিঠি পড়েই পল্লব জেনেছিল, গোল্ডার্স গ্রিনে একটা বাড়িতে দুটো ঘর নিয়ে আখতার, শান্তা আছে। ব্যারিস্টারি পড়ছিল আখতার। শান্তা চাকরিতে ঢুকেছিল।

আরও দু'তিন বছর, এক বন্ধু বলেছিল, গোল্ডার্স গ্রিনের যে বাড়িতে আখতার, শান্তা ভাড়া থাকত, সে বাড়ি দু'জনে কিনে নিয়েছে। পাঁচ বছর এক সঙ্গে থাকার পর, যখন ওরা আনুষ্ঠানিক বিয়ের জন্যে তৈরি, তখন থেকে পল্লবের কাছে তাদের খবর আসা বন্ধ, আখতার, শান্তার কথা এক-সময়ে ভুলে গেল পল্লব। গোল্ডার্স গ্রিন টিউব স্টেশনের টিকিট কাউন্টারে বারটায় পৌঁছে পল্লব দেখল, শান্তা অপেক্ষা করছে সেখানে। পল্লবকে নিয়ে রাস্তায় দাঁড় করানো নিজের ছোট অস্টিন গাড়িতে তুলল শান্তা। স্টেশন থেকে বাড়ি পর্যন্ত নিখুঁত ড্রাইভিং করল। কবে গাড়ি চালাতে শিখল শান্তা ?

মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াশা না থাকলেও রোদ নেই আকাশে। চারপাশের ঘোলাটে রঙ দেখে মনে হয় ধোঁয়াভরা একটা সেলোফেন পেপারের প্যাকেটে পৃথিবীকে পুরে রাখা হয়েছে। ছবির মত সাজানো শান্তার দোতলা বাড়ি দেখে তাক লেগে গেল পল্লবের। একতলায় লিভিং রুম, খাবার ঘর, রান্নাঘর, টয়লেট, দোতলায় দুটো বড়, একটা ছোট শোবার ঘর, স্নানের ঘর। সেণ্ট্রাল হিটিং সব ঘরে কার্পেট, আসবাব, টিভি, ইলেকট্রিক ওভেন, নানারকম বাসন, কী নেই শান্তার বাড়িতে। বিনয়ের বাড়ির মতই এ বাড়ির গড়ন।

শান্তা বলল, দোতলার দুটো ঘরে দু'জন বাংলাদেশী ছাত্র ভাড়া থাকে। শনি, রবিবার কাজ করে তারা। আজ কাজে গেছে।

শান্তার মুখে পল্লব শুনল আটবছর আগে ধারে কেনা এ বাড়ির মর্টগেজের টাকা দেওয়া এবছর শেষ হবে। তখন আর ভাড়া দেওয়ার দরকার হবে না।

রান্নাঘরের ওভেনে ডিম ভাজতে ভাজতে গল্প করছে শান্তা। ডিম ভেজে, বিনের টিন কেটে গরম করে প্লেটে সাজিয়ে বস্যার ঘরে মুখোমুখি দুটো কোচে খেতে বসল দু'জনে। টমেটোর রসে সেদ্ধ লালচে বিন থেকে ধোঁয়া উড়ছে। কমলা রঙের জর্জেট শাড়ি, একই রঙ ব্লাউজ, শান্তাকে আজ পল্লবের খুব চেনা লাগছে। বুকের ওপর লম্বা বিনুনি দুলছে। কার্ডিগান, ওভারকোট, গরম জামার বোঝা শরীরে না থাকায় খুব একটা মোটা লাগছে না শান্তাকে। খাওয়ার ইচ্ছে না থাকায় শুধু ওমলেট খেয়ে প্লেটের বিন-গুলো চামচে নাড়াচাড়া করতে লাগল পল্লব।

ট্রেতে দু'কাপ চা নিয়ে বসার ঘরে ঢুকে শান্তা প্রশ্ন করল, বিন ভাল লাগে না তোমার?

খিদে নেই, পল্লব বলল।

মাংস, ভাত রেঁধেছি। বিকেলে খেয়ে যাবে। আমি পেঁছে দিয়ে আসব তোমাকে।

কত কথা, গল্প, একযুগের আড্ডা বকেয়া থাকলেও কেউ কথা বলছে না। নিষিদ্ধ এক ইচ্ছে পেখম তুলে পল্লবের মাথায় নাচছে। কিন্তু পল্লব বুঝল, সে চিরকেলে নিরীহ, লাজুক, রাতের কথা দিনে বলতে পারে না। দীনের কথাও কত সময় মুখে আটকে যায়। শান্তাকে যে কথাটা বলবে ঠিক করেছিল, এখন তা চিন্তা করে তার বুক কাঁপছে। কফিতে চুমুক দিয়ে চিচু গলায় শান্তা বলল, আখতার লন্ডনে আসছে।

পল্লব তাকিয়ে আছে শান্তার দিকে। এক মুহূর্ত থেমে শান্তা বলল, এ বাড়ি, কয়েকটা ফার্নিচার কেনার সময় আখতার কিছু টাকা দিয়েছিল। সে টাকা ফেরত নিতে আসছে আখতার। কত টাকা ও চাইবে জানি না। তবে যে টাকা ও দিয়েছিল, আমি যোগাড় করে রেখেছি।

বুকের মধ্যে অনেক প্রশ্ন হইচই করলেও চুপ থাকল পল্লব। পাশের টিপয় থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে একটা লম্বা সিগারেট ধরাল শান্তা। তিন, চারটে রিং ছেড়ে কিছু ভাবছে ও। নিষ্প্রদীপ টেলিভিশনের ফ্যাকাসে

পর্দায় চোখ রেখে পল্লব বসে আছে।

শান্তা প্রশ্ন করল, তোমার চিকিৎসার কাজ কতটা এগল?

দু'চার কথায় জবাব সারল পল্লব।

তোমার বাড়ি ঘর সংসারের কথা বল, শান্তা বলল।

আবার দু'চার কথায় সংসারের খবর দিল পল্লব।

চা শেষ করে, প্লেট, কাপ রান্নাঘরের বেসিনে রেখে এসে শান্তা বলল, চল, দোতলায় যাই।

আরও এক পোঁচ কালি পড়েছে আকাশে। কোথাও বসলে আজকাল পল্লবের উঠতে ইচ্ছে করে না। তবু শান্তার সঙ্গে সে দোতলায় এল। সামনে শান্তা, হাতে জ্বলন্ত সিগারেটের প্যাকেট, দামী লাইটার, শরীরে হাল্কা সুগন্ধি, পেছনে রুগ্ন, দীর্ণ পল্লব। মেঝেয় দেওয়াল জোড়া পুরু, সবুজ কার্পেট দেওয়ালে হাল্কা সবুজ লাল নক্সা করা ওয়াল পেপার, শান্তার শোবার ঘরে তার সঙ্গে পল্লব ঢুকল। ঘরে সিঙ্গল খাট, গদিমোড়া চেয়ার, প্লাই টেবিল, একটা ওয়ারড্রোব আর একটা কাঠের আলমারি। ঝকঝকে পালিশ করা সব আসবাব। ওয়ারড্রোবের ওপর রেকর্ড প্লেয়ার টেপ রেকর্ডার, দরজার মাথায় স্টিরিও বক্স, দেওয়ালে কাঁচের বুক কেস। বুক কেসের সবচেয়ে ওপরের তাকে আগাথা ক্রিস্টির রচনাবলী, পাশে একটা রিভলবার, সম্ভবত খেলনা রিভলবার। দ্বিতীয় তাকে রবীন্দ্রনাথ, তারা-শঙ্কর, জীবনানন্দ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণের বই। একটা লক্ষ্মীর ঝাঁপি। ঘরের বাতাসে মেয়েলি গন্ধ লেগে আছে। পল্লব চেয়ারে বসতে যেতে শান্তা বলল, জুতো খুলে বিছানায় আরাম করে বস। ইচ্ছে হলে শুতেও পার।

ফোমের গদির ওপর তুলোর তোষক পাতা বিছানায় পল্লব আধশোয়া হয়ে বসল।

রেকর্ড শুনবে?

শান্তা প্রশ্ন করতে পল্লব বলল, হ্যাঁ।

রবিশঙ্করের একটা লং প্লেয়িং প্লেয়ারে চাপাল শান্তা। খাদে যে সুর বেজে উঠল, পল্লবের ধারণা, তা বাগেশ্রী। শান্তার জীবনযাপনের স্বাচ্ছন্দ্য, বিলাস দেখে তাকে রাজপুত্রী মনে হল পল্লবের। এক সূক্ষ্ম হিংসে কাজ করছে চেতনায়। মনে হচ্ছে, তাকে বাড়িতে ডেকে নিজের প্রাচুর্য দেখাচ্ছে

শান্তা !

কথা বলছ না কেন, শান্তা প্রশ্ন করল।

শান্তার গলায় কোন আবিলতা নেই। তার প্রশ্নে পল্লব হাসল। এখন কিছু সময় হেসে অভিনয় করে যেতে হবে আমাকে, পল্লব ভাবল, যে কথা, উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এসেছি একটু রয়েসয়ে তা শান্তাকে জানাব। সহজে ধৈর্য হারালে চলবে না। কিন্তু কীভাবে বলা যায় ?

হঠাৎ রঞ্জনের কথা মনে পড়ল পল্লবের। পাঁচবছর প্রেম করেও সহেলিকে সে স্পর্শ করেনি, চুমু খায়নি। স্বর্গীয় প্রেমের কোন্ জগতে রঞ্জন বাস করত, পল্লব জানে না। কিন্তু সে স্বর্গ থেকে আছাড় খেতেও তার দেরি হয়নি। পাশাপাশি দু বছর ইউনিভার্সিটিতে একসঙ্গে পড়ে আখতারের প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে তার টানে ইংল্যান্ডে চলে এল শান্তা। স্বর্গীয় প্রেমের ধার ধারল না সে। একবাড়িতে একসঙ্গে সাত বছর কাটাবার পর তারা বিয়ে করল না। তাদের রক্ত মাংসের প্রেমও মুখ থুবড়ে পড়ল। জীবনের আজব নকশায় হাসি পেল পল্লবের।

হাসছ কেন ?

শান্তা প্রশ্ন করতে পল্লব থতমত খেল। তার মুখে যে হাসি জেগেছে সে জানত না। এক সেকেন্ড চুপ করে থেকে পল্লব বলল, এই আজব জীবনের কথা ভেবে হাসি পাচ্ছিল।

শুধু হাসি পায় ?

শান্তার প্রশ্নে তার চোখের দিকে তাকিয়ে পল্লব বলল, কান্নাও পায়। কাঁদতে পারি না, তাই হাসি।

শান্তা আর কথা বলল না। রঞ্জনের মত বিশুদ্ধ থাকার বোকামি না করে গোপন ইচ্ছেটা প্রকাশের জন্যে উসখুস করছে পল্লব। চেয়ার ছেড়ে উঠে কাঁচের দেওয়াল আলমারি খুলে তলার তাক থেকে একটা সবুজ বোতল, একটা গ্লাস বার করে টেবিলের ওপর শান্তা রাখল। টেবিলে জল বোঝাই একটা জাগ রয়েছে। বোতলের গায়ে-লেখা, কানাডিয়ান ক্লাব, মল্ট হুইস্কি, পল্লব নজর করল। শান্তা বলল, একটু হুইস্কি খাও, ভাল লাগবে।

শান্তার মুখের দিকে অবাক চোখে পল্লব তাকাতে শান্তা হেসে ফেলল। বলল, ভয় নেই, তোমার বৌ জানবে না।

শান্তার কথায় হেসে পল্লব প্রশ্ন করল, একটা গ্লাস কেন ?

হুইস্কি খাই না।

কী খাও ?

জিন।

তাহলে, তাই খাও।

মুচকি হেসে শান্তা বলল, এই ভরদুপুরে জিন খেয়ে বেসামাল হলে তুমি সামলাতে পারবে না আমাকে।

খুব পারব।

পল্লবের কথায় আবার আলমারি খুলে জিন, টনিক ওয়াটারের বোতল আর একটা গ্লাস বার করল শান্তা। একটা গ্লাসে হুইস্কি আর একটায় জিন ঢেলে, হুইস্কিতে জল এবং জিনের সঙ্গে টনিক মেশাল। হুইস্কির গ্লাস পল্লবের হাতে দিয়ে শান্তা বলল, ক্রিশ্‌মাসের আগে বোতল দুটো কিনেছিলাম। সে সময়ে হঠাৎ প্যারিসে বেড়াতে চলে যাওয়ায় বোতল দুটো আর খোলা হয়নি। তোমার সম্মানে আজ খুলতে পেরে ভাল লাগছে।

বাগেশ্রীর ঝালা বৃষ্টির বড় ফোঁটার মত ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে। পল্লবের মাথা, ফুসফুস হৃৎপিণ্ড সুরের ফোঁটায় ভিজে যাচ্ছে। ঘরে দানা বাঁধছে অন্ধকার। শান্তার লম্বা দু'আঙুলে জ্বলন্ত সিগারেট। গ্লাস তুলে শান্তা বলল, চিয়ার্স'।

গ্লাস তুলে হুইস্কিতে চুমুক দিল পল্লব। মুখ ছুঁচোল করে একটার পর একটা রিং ছাড়ছে শান্তা। ধোঁয়ার ছোট চাকাগুলো ঘুরতে ঘুরতে ঘরের দেওয়ালে মিশে যাচ্ছে।

কবে সিগারেট ধরলে ?

পল্লবের প্রশ্ন শুনে এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে শান্তা বলল, অনেকদিন, আট, দশ বছর।

জানলার কাঁচের ভেতর দিয়ে রাস্তার ল্যাম্পপোস্টে বসা কুচকুচে কালো একটা দাঁড়কাক দেখতে পেল পল্লব। ঘণ্টা বাজিয়ে একটা অ্যাম্বুলেন্স চলে গেল। জিনের গ্লাসে খুব ছোট চুমুক দিচ্ছে শান্তা। পল্লব একটু তাড়াতাড়ি খাচ্ছে। সাদা মাথায় বলা সম্ভব না হলেও তার বিশ্বাস, তিন, চার পেগ্ হুইস্কি খাওয়ার পর নিষিদ্ধ কথাটা সে বলতে পারবে শান্তাকে। শান্তা জিন খেতে শুরু করায় পল্লবের কথা বলতে সুবিধে হবে। কথাটা ভারি কঠিন, ব্যর্থ প্রেমের কাঁদুনি, টাকাকড়ির হিসেব নয়, একজন মুমূর্ষু

মানুষের বেঁচে থাকার সংকল্প।

রেকর্ড প্লেয়ার থেমে গেছে। ঘরে নীরবতা, অন্ধকার। কীভাবে, পুরাণ, ইতিহাস অথবা ধ্রুপদী কোনও উপন্যাসের গল্প ফেঁদে কথাটা পাড়া যায় পল্লব ভাবছে।

শান্তা বলল, গত বছর দেশে গিয়ে আমার সবচেয়ে ছোট বোনের বিয়ে দিয়ে এলাম। অন্য তিনবোনের বিয়ে আগেই দিয়েছিলাম। বাবা, মা এখন খুব খুশি।

শান্তা কেন এসব কথা বলছে, পল্লব বুঝতে পারল না। হঠাৎ তার মনে হল, শান্তার কথাগুলোর কারণ সে বুঝেছে। বহু বছর আগে মেয়েদের বিয়ে নিয়ে শান্তার মা একদিন, একান্তে নিজের উদ্বেগ, দুশ্চিন্তার কথা পল্লবকে বলেছিল। মার কথাগুলো যেভাবেই হোক কানে গিয়েছিল শান্তার। এতদিন পরে চার বোনের বিয়েতে যে কোন অসুবিধে হয়নি, শান্তা সে খবর জানিয়ে দিল পল্লবকে।

আখতার, তোমার বিয়েটা ঠেকে গেল কেন?

পল্লবের প্রশ্ন শুনে গ্লাসের তলানি জিন এক চুমুকে খেয়ে শান্তা বলল, আখতারের সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞেস কর।

তুমি বলবে না?

পল্লবের প্রশ্ন শুনে তার চোখে চোখ রেখে শান্তা বলল, না।

দুটো খালি গ্লাসে হুইস্কি, জিন ঢেলে যা যা মেশাবার মিশিয়ে নিয়ে এল শান্তা। হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে পল্লব প্রশ্ন করল, রঞ্জন সেনকে তুমি চেন?

কে রঞ্জন?

আমার বন্ধু, ন্যাভাল আর্কিটেক্ট, লণ্ডনে আছে ছ'বছর।

নাহ্, আলাপ নেই।

পল্লব বলল, রঞ্জনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব তোমাকে?

কথাটা বলেই তার মনে হল, বোকামি করে ফেলেছে। এ মুহূর্তে আর কোন পুরুষের সঙ্গে, বিশেষ করে অবিবাহিত রঞ্জনের সঙ্গে শান্তাকে আলাপ করাবে না সে। এখন তার খুব দরকার শান্তাকে। জীবনের বাকি বাহান্ন দিন শান্তাকে আগলে রাখার দায়িত্ব তার। তারপর, তার কাজ চুকে গেলে রঞ্জন কেন, লণ্ডনে তার যত বন্ধু আছে, সকলের সঙ্গে শান্তার

পরিচয় করিয়ে দেবে সে। পল্লবের মাথার ওপর দিয়ে দূরপাল্লার একটা ট্রেন ঝমঝম করে ছুটে চলেছে। ঝমঝম শব্দের মধ্যে পল্লব শুনতে পেল, বাহান্ন দিন, একান্ন দিন, পঞ্চাশ দিন, ট্রেনের কামরা একটা করে চোখের সামনে থেকে সরে যাচ্ছে।

গ্লাস খালি করে পল্লব নিজে হুইস্কি ঢালতে যেতে শান্তা প্রশ্ন করল, কতটা খেলে?

তুমি যা দিয়েছ।

কথাটা বলে গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে অল্প জল মেশাল পল্লব। শান্তা তাকিয়ে আছে। পল্লবের নেশা ঘন হচ্ছে। তার মনে হচ্ছে আমার কোন রোগ নেই, কষ্ট নেই, আমি ষোল আনা সুস্থ, সরল মানুষ।

পল্লব শুনেছে, মানুষ মরে গেলে তার শরীরের সব রোগ, ব্যাধি, বিকৃতি চলে যায়। রোগের কোন লক্ষণ থাকে না তার শরীরে। মৃত্যু আর নেশা, প্রায় একরকম মনে হল পল্লবের। মৃত মানুষের মত, নেশাতুর মানুষেরও রোগ, শোক, কষ্ট নেই।

বুঝে খাও।

পল্লবের দিকে এক সেকেন্ড নজর করে শান্তা কথাটা বলতে, পল্লব বলল, আমি সেরে উঠছি, যত খাচ্ছি, তত সেরে উঠছি। খুব ভাল লাগছে আমার।

শান্তারও দু'চোখ নেশায় ভারি হয়ে উঠেছে। আখতার এবং তার সম্পর্কের বিষয়ে মুখ না খোলার কথা বলেও শান্তা এখন বলছে, চারবোনকে বিয়ে দেওয়ার পর আমি বিয়ে করার প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। আমার সে প্রতিজ্ঞায় আখতারেরও সায় ছিল। তারপর একদিন টের পেলাম ও এড়াতে চাইছে আমাকে। কেন? খোঁজখবর নিয়ে জানলাম, দেশের এক মুসলিম মন্ত্রী, তিনি আখতারের বাবার বন্ধু, মেয়েকে নিয়ে লণ্ডনে বেড়াতে এসেছেন। বাবার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁর মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। দেশের প্রভাবশালী, ক্ষমতাবান মন্ত্রীর বিদুষী মেয়েকে দেখে মাথা ঘুরে গিয়েছিল আখতারের। শুধু মাথা ঘোরেনি এই মেয়েটিকে দেখে দেশে ফিরে ভবিষ্যতের একটা ছকও আখতার করে ফেলেছিল। তার চালচলন, কথায় আমি ভেঙে পড়েছিলাম। আমার সর্বস্ব দিয়েছিলাম ওকে। বোধ-হয় একটু বেশিই দিয়েছিলাম। এক বাড়িতে থেকেও কথা বন্ধ হয়ে গেল

আমাদের।

তারপর ?

হঠাৎ চুপ হয়ে গেল শান্তা। তারপর পল্লবকে প্রশ্ন করল, বিয়ে কী ?

শান্তার সব কথা কানে না ঢুকলেও প্রশ্নটা শুনল পল্লব। একটু নড়েচড়ে বসে সে বিড়বিড় করল, বিয়ে কী ? হ্যাঁ, বিয়ে হল নারী পুরুষের আইনসম্মত, সামাজিক যুগলসম্পর্ক যাতে দু'পক্ষের সায় আছে।

পুঁথিপড়া সংজ্ঞা, মন্তব্য করল শান্তা।

পল্লব চুপ। শান্তা প্রশ্ন করল, তোমাকে কি বিব্রত করছি ?

পল্লব একটা অস্পষ্ট শব্দ করল, যার কোন মানে নেই। আসলে পল্লব কিছু শুনছে না, শুনতে চাইছে না। তার মনে হচ্ছে, ভারি মনোরম, সুন্দর এই পৃথিবী। রোগ, কষ্ট, হতাশায় এই পৃথিবীতে মুষড়ে পড়ার কোন মানে হয় না

শান্তা বলল, লণ্ডনের বাঙালীসমাজ একটা মিনি কলকাতা, সকলের খবর সকলে পায়, আলোচনা করে। গতবছর এ সময় খুব অশান্তিতে ছিলাম। দেশে ফিরে যাবার আগে কিছুদিনের জন্যে আমেরিকায় চলে গেল। আমি এখানে থেকে গেলাম। তখন যেখানে যেতাম, এক প্রশ্ন, আখতার কোথায় ? নাজেহাল হয়ে গিয়েছিলাম।

কথা থামিয়ে গ্লাসে চুমুক দিল শান্তা। বিছানার ওপর দুটো বালিশে ঠেস দিয়ে মুখোমুখি বসেছে দুজনে। ঘরের জমাট অন্ধকারে শান্তা ক্রমশ মিশে যাচ্ছে। তার হাত, পা, চোখ, নাক, বুকে লুটিয়ে থাকা বিনুনি, আলাদা করা যাচ্ছে না। কালো কাগজের ওপর কয়েকটা সাদা আঁচড়ের মত দেখাচ্ছে ওকে। ঘরের আলো জ্বালা দরকার বুঝেও বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করল না পল্লবের।

আমার নেশা হয়ে গেছে শান্তা বলল, এজন্যে জিন খাই না আমি।

বিছানার ওপর টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল শান্তা। পল্লবের কোলের কাছে শান্তার ধবধবে ফর্সা দু'পা। একটু সরে বসে পল্লব ভাবল, যে কথা সকাল থেকে বলতে চাইছি, বলার সময় হয়েছে। এমন সুযোগ আর হবে না। এখনই বলা উচিত

কিন্তু পল্লব বোবার মত বসে থাকল। আওয়াজ বেরল না তার গলা থেকে। পল্লবের গ্লাস প্রায় শেষ দেখে শান্তা বলল, তুমি আর খাবে না। ছ'টায়

আমরা ভাত খাব।

গোটা খাট জুড়ে শুয়ে আছে শান্তা। খাটের কিনারা ছুঁয়ে পল্লব বসে আছে। ইচ্ছে থাকলেও চেয়ারে গিয়ে সে বসল না। গোপন কথা বলার মোক্ষম সুযোগ চলে যাচ্ছে। নিস্তব্ধ পল্লবের বুকে বইছে ঝড়।

আমার বুকেও একটা রোগ হয়েছে। বুক না খুললে রোগটা ধরা পড়বে না। আমারও একটা অপারেশন দরকার, আপন মনে কথা বলছে শান্তা। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাতে একঝলক জোরালো আলোয় বিছানায় লুটিয়ে থাকা শান্তাকে দেখল পল্লব। শান্তা যেন মোমের শরীর, গলে যাচ্ছে বিছানায়। মনের ফুরফুরে, হালকা ভাব কেটে গিয়ে ভারী হচ্ছে পল্লবের মাথা। শান্তার জন্যে কষ্ট হচ্ছে তার। সুস্থ, সবল মানুষদের বিরুদ্ধে পল্লবের মনে চাপা হিংসে জমেছিল এতদিন। তাদের হাসি, হল্লা ফুর্তি দেখে রাগে তার গা জ্বলত। পল্লব ভাবত, তার সুখ শান্তি পরমায়ু চুরি করে সুস্থ মানুষেরা আনন্দে আছে। সুস্থ মানুষরা অপরাধী। রাগে, ঈর্ষায় চেনা অচেনা কত লোককে যে নিজের অসুস্থতার জন্যে পল্লব দায়ী করেছে, শত্রু ভেবেছে, তার হিসেব নেই। কোন পুণ্যে একজন নিরোগ, সুস্থ, একজন অসুস্থ, আধমরা, পল্লব হদিস পায় না। নিজের সঙ্গে সুস্থ মানুষদের তুলনা করে সে ভাবে ওদের চেয়ে কোনও বিচারে আমি খারাপ নই, তবু আমার এ অবস্থা কেন? ওরা বেঁচে থাকবে অথচ কোন অপরাধ, পাপে মরতে হবে আমাকে?

ভেবে থৈ পায় না পল্লব। তার মাথার মধ্যে আকাশের মত বড়, ঘন নীল রঙ এক রেকর্ডে, পৃথিবীর সব গান, শব্দ স্বপ্ন, হাজার, লক্ষ্য বছরের ধ্বনি, পাখির ডাক, আলো, অন্ধকার, খসে পড়া তারায় বাতাসে ঘষটানি, ঘুরে ঘুরে বাজতে থাকে। অন্ধকারে শান্তার নিঃশ্বাসের ঘন, গভীর শব্দে পল্লবের মনে হল, সে কাঁদছে। কেন কাঁদছে? শান্তার জন্যে স্নেহে, সহানুভূতিতে হাহা করতে থাকে পল্লবের বুক। সাবধানে, আলতো হাতে শান্তার একটা পা পল্লব স্পর্শ করতে বিছানায় লুটিয়ে থাকা তার শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। বালিশে মুখ গুঁজে আর কিছু সময় বিছানায় শুয়ে শান্তা উঠে বসল। নিস্তব্ধ, অন্ধকার ঘরে দুচোখ মেলে পল্লবকে দেখে শান্তা বলল, তুমি সেরে ওঠ। আমি সুস্থ দেখতে চাই তোমাকে।

নড়েচড়ে বসে পল্লব বলতে চাইল, তুমি একটু সাহায্য কর আমাকে, আগামী বাহান্ন দিন একটা ঝুঁকি নিয়ে তুমি বাঁচাতে পার আমাকে, বলতে পারল না।

অন্ধকারে পাথরের মূর্তির মত বিছানায় বসে থাকে দুজন। শান্তা হঠাৎ বলল, সেরকম হলে কাগজে কলমে কিছুদিন আমরা স্বামী স্ত্রী সেজে থাকব।

শান্তার কথা শুনে শিউরে উঠল পল্লব, তার শরীরে কাঁপুনি, এখনই, সে বেহুঁশ হয়ে যাবে। তার মুখ, শরীর দেখতে পাচ্ছে না শান্তা। বিছানা থেকে নেমে শান্তা সুইচ টিপতে আলোয় ঘর ভরে গেল। ধীর, স্নিগ্ধ গলায় শান্তা প্রশ্ন করল, আমার প্রস্তাবে রাজী?

শান্তার মুখে পল্লব দেখল, নিখাদ প্রীতি, মমতা, বন্ধুর জন্যে উদ্বেগ। বিস্ময়ে, কৃতজ্ঞতায় আচ্ছন্ন পল্লব চুপ। কথা বলতে গেলে এখন তার গলা কান্নায় ভেঙে যেতে পারে।

শান্তা বলল, ভয় পেও না। এ নিছক কাগুজে বিয়ে, এদেশে নানা প্রয়োজনে এরকম বিয়ে হয়, প্রয়োজন ফুরলে বিয়ে শেষ। স্ত্রী পরিচয়ে তোমার কাছে কখনও যাব না।

সকাল থেকে যে কথা জিভের ডগায় নিয়ে বলার সুযোগ খুঁজছে পল্লব, সুযোগ পেয়ে বলতে পারেনি, সে কথা কী সহজে, অবলীলায় শান্তা বলল। দিশাহারাপল্লব অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল শান্তার দিকে। শান্তার প্রস্তাব শুনে বিছানা থেকে চেয়ারে গিয়ে বসেছিল পল্লব। বিছানা ছেড়ে পল্লবের কাছে এসে তার দুকাঁধে দুহাত রেখে শান্তা প্রশ্ন করল, তুমি কি মাতাল ভাবছ আমাকে? নেশার ঘোরে প্রলাপ বকছি আমি?

নাহ্, তা নয়।

তবে?

পল্লব বলল, এখন মরতে আমার দুঃখ নেই। আমার নেশা ছুটে গেছে, কিন্তু আনন্দে ভেসে যাচ্ছি আমি।

শান্তা বলল, আমি জানতাম, তুমি রাজী হবে না।

এক সেকেন্ড চুপ করে থেকে পল্লব বলল, এ কথাটা বলার জন্যে সকাল থেকে উসখুস করছিলাম আমি। কথাটা বলে দেখতে চাইছিলাম, তুমি কী কর।

পল্লবের কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে শান্তা বলল, তুমি মরবে না।

পল্লব বলল আমি জানি।

ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেঁতে নোংরা ঘরে ডাঁই করে এঁটো বাসনের সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ বোধ করল পল্লব। আজ সকাল থেকে শরীর খুব বেজুত। বিছানা ছেড়ে উঠতে বসতে এত কষ্ট, অস্বস্তি হচ্ছিল যে বিকেলে কাজে আসার কথা ভাবতে পারছিল না পল্লব। কলকাতার সেই ভয়ংকর রাত, দম আটকে মরতে মরতে বেঁচে ওঠার ঘটনা, পল্লবের মনে পড়েছিল। সেরকম কিছু যে কোন মুহূর্তে ঘটার আশঙ্কা করছিল সে। জীবনের বাকি আটচল্লিশ দিন শেষ হবার আগেই হয়ত সে দম ফুরিয়ে মরে যাবে। তিনমাস সময় কলিন্স দিলেও সেই তিন মাস মানে যে ঠিক নব্বই দিন, বেশি বা কম নয়, তা কে বলতে পারে! আজ সকাল থেকে শরীরের হাল দেখে পল্লব টের পেয়েছে কলিন্সের দেওয়া নব্বই দিন, আশি বা সত্তরের বেশি গড়াবে না। আশি হলে বত্রিশ দিন, সত্তর হলে আর বাইশ দিন সে পৃথিবীতে আছে। আটচল্লিশ বত্রিশ, বাইশ দিনের গড় হিসেব পল্লব পেল, একচল্লিশ দিন। তার মানে, খুব বেশি হলে আগামী একচল্লিশ দিন সে বাঁচার সুযোগ পাবে। অসুস্থ শরীরে, আজ সকালে এই একচল্লিশ দিনকে অনেক মনে হয়েছিল পল্লবের। কেননা, খুব কাছ থেকে মৃত্যুর পায়ের শব্দ শুনেছিল পল্লব। তার মনে হয়েছিল, আগামী দু তিন দিনের মধ্যে এমন কি আজও সে মারা যেতে পারে। শরীরে বিপর্যয়, ধস শুরু হওয়ার কথা পল্লব বলতে পারেনি সুন্দরলালকে। মনে মনে বরং মৃত্যুর জন্যে সে প্রস্তুত করেছে নিজেকে।

কাজে না গিয়ে শুয়ে থাকলে সুন্দরলালের উদ্বেগ, অশান্তি বাড়বে ভেবে শেষ বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল পল্লব। এখন তার মনে হচ্ছে বাড়ি থেকে বেরনো বোকামি হয়েছে। রোগের চরম মার এখন যে কোন মুহূর্তে আসতে পারে। জলের বেসিনে বাসনের স্তূপ, দু হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে পল্লব। ভারী পাথরের সেই পেণ্ডুলাম তার বুকের মধ্যে ঢিমে তালে দুলছে। শান্তার বাড়িতে সেদিন পল্লব যে সাহস, আত্মবিশ্বাস দেখিয়েছিল, আজ তার ছিটেফোঁটা নেই। অসহায়তা, উদ্বেগ, মৃত্যুভয় গত দু তিন দিনে ধীরে ধীরে গিলে নিয়েছে তাকে। অসুস্থ হওয়ার পর থেকেই এরকম ঘটছে। যুক্তি,, বুদ্ধি, সাহস, বিশ্বাস অস্থির হয়ে আছে সবসময়।

রান্নাঘরের ঘুলঘুলি গলিয়ে দাশগুপ্ত এক কাপ চা দিল পল্লবকে। ঘুলঘুলি থেকে হাত বাড়িয়ে পল্লবের কাপ নেওয়ার শক্তি নেই। দাশগুপ্তকে খুশি করতে তবু চায়ের কাপটা পল্লব তুলে নিল। দাশগুপ্ত পালিমার টেকনোলজির

ছাত্র। সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত কলেজে ক্লাসের পর চাকরি করে। কলকাতায় বিধবা মা, বিধবা বৌদি, দুই নাবালক ভাইপো, ভাইঝি নিয়ে দাশগুপ্তর সংসার। কলকাতায় দাশগুপ্ত নেই, তার সংসার আছে। ঠিক তার নয়, মৃত বাবা, দাদার সংসার। লম্বা, পাতলা, শ্যামলা চেহারা, বুদ্ধিদীপ্ত দু চোখে মোটা কাঁচের চশমা, দাশগুপ্ত আড্ডাবাজ ছেলে। পল্লবের সঙ্গে বেশ আলাপ হয়েছে দাশগুপ্তর। এ দেশে দু বছর থেকেও কলকাতার বাড়ির মায়া, আকর্ষণ দাশগুপ্ত কাটাতে পারেনি। ডিমভাজার বিরতি হলে ঘুলঘুলিতে মুখ রেখে দাশগুপ্ত বলে, মেরেকেটে আর তিন বছর. পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এদেশে থাকতে হবে। তারপর কে আমাকে ধরে! সোজা কলকাতায় চলে যাব।

কলকাতা ফেরার কথায় চশমা ঢাকা দাশগুপ্তর দু চোখের মণি চিকচিক করে ওঠে।

ডিম ভাজতে ভাজতে ঘুলঘুলির কাছে মুখ এনে চাপা গলায় দাশগুপ্ত বলল, লণ্ডনের রেস্টুরেন্টওয়ালারা বিশেষ করে ভারতীয়, পাকিস্তানী বাংলাদেশী মালিকেরা খাবার বিক্রির তলে তলে আরও পাঁচরকম ব্যবসা করে। সে সব ব্যবসা খুব নিরীহ, সাদামাটা নয়। হোটেল ব্যবসায়ী ছাড়া সে ব্যবসা আপনি, আমি করতে পারব না।

শোনার ক্ষমতা না থাকলেও দুটি চোখের দৃষ্টিতে আগ্রহ ফুটিয়ে রাখতে চাইল পল্লব।

ফিসফিস করে দাশগুপ্ত বলল, গাঁজা, ভাঙ-এর এদেশে খুব কদর।

আরও কিছু বলার থাকলেও খাবারের অর্ডার হাতে দুদু মিঞার শ্যালক জিয়াদ রান্নাঘরে ঢুকতে দাশগুপ্ত চুপ করে গেল। গরম চায়ে একটা লম্বা চুমুক দেওয়ার পরেও পল্লবের আতঙ্ক কাটছে না। গা বমি করছে। টি ব্যাগের রঙিন চায়ে বার্লি'র স্বাদ। গাঁজা, সিদ্ধির অবৈধ ব্যবসাতে দুদু মিঞা জড়িয়ে আছে জেনে আরও অসুস্থ বোধ করল পল্লব। বেআইনী মাদকদ্রব্যের ব্যবসা চালানো ইংল্যাণ্ডে গুরুতর অপরাধ। ধরা পড়লে কঠিন শাস্তি, দেশ থেকে বহিষ্কার পর্যন্ত হতে পারে। পম্মায় পুলিস হানা দিলে দুদু মিঞার সঙ্গে রেস্টুরেন্টের কর্মীরাও ধরা পড়বে। কেউ রেহাই পাবে না। সেই বিপজ্জনক সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে পল্লবের গায়ে কাঁটা দিল। মাদকের চোরা ব্যবসাতে দুদু মিঞা যে জড়িত, পল্লবের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ফাঁকা খাবার ঘরে বিয়ারের পেটি থেকে পরশু রাত সাড়ে এগারটায় দু-তিনটে সেলোফেন পেপারের প্যাকেট দুদু মিঞাকে বার করতে দেখেছিল পল্লব। কীসের প্যাকেট পল্লব বুঝতে পারেনি, জিজ্ঞেসও করেনি দুদু মিঞাকে। এক আলগা সন্দেহ পরশু রাতেই পল্লবের মাথায় জেগেছিল। দুদু মিঞার মুখ দেখে অনেক কিছু বুঝে ফেলেছিল সে। রেস্টুরেণ্টে এখন ভিড় উপচে পড়ছে, বসার জায়গা নেই। ক্যাসেটে নিচু লয়ে বাজছে বোম্বে ছায়াছবির হিট গান। দুদু মিঞার তাড়ায় রান্নাঘরে দাশগুপ্ত, আলম হাঁপিয়ে উঠেছে। কমপ্যাক্ট গ্যাস ওভেনের পাশাপাশি চারটে মুখ দাউদাউ জ্বলছে। একটার পর একটা অর্ডার স্লিপ নিয়ে ছুটে আসছে দুদু মিঞা, জিয়াদ।

ঠাণ্ডা, গরম জল বোঝাই বেসিনে বাসনের স্তূপ আর দু হাত ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পল্লব। সমুদ্রের ঢেউ-এর মত কয়েক সেকেণ্ড ছাড়া রক্তস্রোত তার হৃৎপিণ্ডে ভেঙে পড়ছে। স্রোতের ধাক্কায় কেঁপে উঠছে শরীর, পায়ের তলার মাটি। শান্তার প্রস্তাবে সেদিন রাজী না হওয়ার বোকামিতে পল্লব আজ হাত কামড়াচ্ছে। শান্তার বাড়িতে যাওয়ার পরদিন সকালেই সে ফোন করেছিল পল্লবকে। নানা কথার মধ্যে একসময় শান্তা বলেছিল, গতকাল যা বলেছি, মাতাল হয়ে বলিনি কিন্তু।

তখনও শান্তার প্রস্তাবে রাজী হওয়ার সুযোগ ছিল। ফোনে সে কথা পল্লব বলতে পারত। কিন্তু বলে নি। না বললেও বলে ফেলার আশঙ্কায় ধড়ফড় করেছিল তার বুক। রিসিভার ধরা হাতের মুঠো শক্ত হয়েছিল। কথা শেষ করে ফোন ছেড়ে দেওয়ার পর হতাশা, ক্লান্তিতে বিছানায় লুটিয়ে পড়েছিল সে।

খাবার ঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে গাদা গাদা বাসন পল্লবের সামনে জড়ো হচ্ছে। যে পোশাকে বাড়ি থেকে এখানে আসে, ওভারকোট ছেড়ে সে পোশাকেই পম্পায় বাসন মাজে পল্লব। জলের ছিটে লেগে ভেজা তার কার্ডিগান, জ্যাকেট ট্রাউজারস তাই কখনও শুকোয় না। স্যাঁতসেঁতে পোশাক থেকে গুমো গন্ধ বেরচ্ছে পায়ের পুরনো জুতো জোড়া জল খেয়ে ঢপঢপে ফুলে ঢোল, হাঁটলে দু পায়ের গোড়ালি বেরিয়ে আসে। ভেতরের ভিড় কথার আওয়াজ কমে আসতে, পল্লব বুঝল রাত সাড়ে দশটা। কাজের চাপ হাল্কা হতে দাশগুপ্ত সিগারেট ধরিয়েছে। হিমশীতল এ ঘরের চেয়ে রান্নাঘর যে অনেক বেশি গরম, দাশগুপ্ত আলমের মামুলি পোশাক, কপালের মিনমিনে

ঘাম দেখে ধরা যায়। বুকে রক্তের ধাক্কা, ভোঁভো মাথা, শীতের কামড়ে ছত্রখান পল্লব নিজের শরীরে মৃত্যুর গন্ধ পেল। সে গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছে। গন্ধটা খুব চেনা। শ্মশানের পাশ দিয়ে হাঁটলে পাওয়া যায়। এ গন্ধ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এর ব্রিজের ওপর দিয়ে হাঁটার সময় বহুবার পল্লব পেয়েছে। হুবহু সেই গন্ধ নিজের শরীরে অনুভব করে পল্লব চোখ বুজল

রাতে খাওয়ার সময় পল্লবের মুখোমুখি এক পাইট বিয়ার নিয়ে বসে দুদু মিঞা বলল, আমিও শীতের সময় এদেশে এসেছিলাম। তখন বিদেশীদের এখানে থাকা নিয়ে এত কড়াকড়ি ছিল না। তবু তিন, চার মাস ধরা পড়ার ভয়ে চোরের মত লুকিয়ে থাকতাম। বাসা, কাজের জায়গা ছাড়া, আর কোথাও এমন কি দোকান, বাজারেও যেতাম না। সাউথাম্পটনে একটা ঘরে দু জন চেনা লোকের সঙ্গে আমি থাকতাম। ঘর মানে বেড্‌সিটার, একটা বিছানা, একজন থাকতে পারে। একজনের বেশি থাকা বেআইনী। কিন্তু সব আইন তো মানা যায় না। আমরাও মানতাম না। একজনের জায়গায় থাকতাম তিনজন। একটা সুবিধে ছিল আমাদের। তিনজন আটঘণ্টা করে আলাদা তিনটে সময়ে ডিউটি দিতাম। ফলে প্রত্যেকেই বিছানায় আটঘণ্টা ঘুমোবার সুযোগ পেত। আর পাঁচজন বাড়িউলির মত আমাদের বাড়িউলিও ছিল খুব হুঁশিয়ার পিটপিটে মেয়েমানুষ। আমাদের চালাকি একদিন সে ধরে ফেলল। তারপর কি হেনস্তা!

বিয়ার মাগে চুমুক দিয়ে দুদু মিঞা হাসল। দুর্দিনের কোন চিহ্ন নেই তার মুখে। দুদু মিঞা শুরু করল দেশের কথা। তার সব কথা পল্লব শুনছে না। দুদু মিঞার গোপন ব্যবসার খবর জেনে তাকে শুধু খুঁটিয়ে দেখছে পল্লব।

পাশের টেবিলে রাখা একগোছা প্লেট দেখিয়ে দুদু মিঞা বলল, যাবার আগে ওগুলো ওয়ারড্রোবে তুলে দিন।

খাওয়া শেষ করে পল্লব বেরবার জন্য তৈরি। বারটা বাজতে দেরি নেই। সারা এলাকা নিস্তব্ধ, নির্জন হয়ে গেছে। দুদু মিঞার হুকুম শুনে এক-গাদা প্লেটের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে গেল পল্লব। ধোঁয়ামোছা, নাড়াচাড়া করে প্লেটের ওজন পল্লব জেনে গেছে। টেবিলের ওপর প্রায় একডজন প্লেটের ওজন কী হবে, পল্লব জানে। সুস্থ শরীরে একডজন প্লেট টেবিল থেকে

ওয়ারড্রোবে তোলা শক্ত কাজ নয়। নির্জীব, রুগ্ন শরীরে সে শক্তি, সাহস পল্লবের নেই। ছ'টা করে প্লেট নিয়ে দু বারে ওয়ারড্রোবে রাখার কথা ভেবেও দুদু মিঞাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে প্লেটের বোঝা পল্লব একসঙ্গে তুলে নিল। কাঁচের একডজন ভারী প্লেট একসঙ্গে নিয়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে। সাধারণ রোজকার প্লেটের চেয়ে এ প্লেট যেন বেশি ভারী। দু তিন পা গিয়ে নিজের বোকামি ধরতে পারল পল্লব। কিন্তু তার চেয়েও বড় বোকামি সে আগেই করে রেখেছে। প্লেট তোলার আগে ওয়ারড্রোবের বন্ধ পাল্লা খোলেনি। ওয়ারড্রোবের সামনে গিয়ে থতমত পল্লব হাঁটু ভেঙে ডান পা সামান্য এগিয়ে দিয়ে, পায়ের দাবনায় প্লেটের বোঝা রাখল। টলমল করছে শরীর, পা। বাঁ হাতে সে ওয়ারড্রোবের দরজা খুলতে যেতেই পায়ের দাবনা থেকে একডজন প্লেট হড়কে গেল। এদিকের মেঝেতে শক্ত কার্পেট পাতা। মেঝেতে পড়ে বারটা প্লেট একসঙ্গে ঝনঝন করে ভাঙার শব্দে সোফা ছেড়ে লাফিয়ে উঠল দুদু মিঞা। পাশের সোফাতেও ঘুম ভেঙে গেল জিয়াদের। দোতলা থেকে মেয়েলি গলার তীক্ষ্ন প্রশ্ন, হোয়াট্স্ রং, শুনতে পেল পল্লব। লজ্জা, ভয়, অনুশোচনায় রাশি রাশি ভাঙা প্লেটের টুকরোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে পল্লব ঠকঠক করে কাঁপছে।

দুদু মিঞা, জিয়াদ কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। রাগে, যেন্নায় কথা বলতে পারছে না দুদু মিঞা। তার মেমসাহেব বৌ বার-তের বছরের এক মেয়েও নেমে এসেছে দোতলা থেকে। জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টিতে মেমসাহেব যেন ছাই করে ফেলবে পল্লবকে। দুদু মিঞা বলল, আপনি আমার খুব বড় ক্ষতি করে দিলেন মজুমদার। রেস্টুরেন্টের সবচেয়ে দামী প্লেটের সেট, এগুলো আমি নামাই না, আজ একটা বড় পার্টি ছিল, তাই বার করেছিলাম, ভেঙে ফেললেন আপনি। যে লোকসান আমার ওপর চাপিয়ে দিলেন, তা মেটাতে আপনার এক মাসের মাইনে লেগে যাবে। কিন্তু রায় আপনাকে পাঠিয়েছে। তাই পুরোদাম আমি উসুল করব না। এ হপ্তার মাইনে কেটে রেহাই দেব আপনাকে।

এক সেকেন্ড চুপ করে থেকে দুদু মিঞা বলল, রেস্টুরেন্টে কাজ করার এলেম আপনার নেই। কাল থেকে আর আসতে হবে না আপনাকে।

পাথরের মত নিশ্চল, চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে পল্লব। কী ঘটছে, দুদু মিঞা কী বলছে, বুঝতে পারছে না সে। ঝাড়ু হাতে মেঝে সাফ করছে

জিয়াদ। পল্লবকে সে বলল, সরে দাঁড়ান।
পল্লব যখন রেস্টুরেন্টের বাইরে এল জনহীন রাস্তায় বড় দানার তুমুল বৃষ্টি, কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া, দাপাদাপি করছে ইংলিশ, উইণ্টার। বৃষ্টি, ঝড় মাথায় করে ফুটপাথ দিয়ে ওয়ারেন স্ট্রিট টিউব স্টেশনের দিকে হেঁটে চলল পল্লব। লজ্জা, অপমানে মরে যাচ্ছে সে।

সকাল ন'টায় জরুরী একটা কাজে বেরিয়ে সুন্দরলাল বাড়ি ফিরল দুপুর দুটোর সামান্য আগে। ফোনে জয়ার সঙ্গে তখন কথা বলছে পল্লব। প্রায় দশ দিন পরে ফোন করেছে জয়া। তার বাড়ি ছেড়ে আসার পর প্রথম তিন চারদিন রোজ ফোন করত। তারপর কমে গেছে। অন্যের ফোন ব্যবহারে লজ্জা করে পল্লবের। তাই ফোন পাবার প্রত্যাশায় থাকলেও সে নিজে ফোন করে না। ফোন করেই জয়া প্রথমে সুসংবাদ দিয়ে বলল, চারদিন হল, সতুমামা ফিরেছে।
খবরটা আরও বিশদে শোনার আগ্রহে পল্লব প্রশ্ন করল, তারপর?
সে অনেক কথা। দেখা হলে বলব। তবে খবরের সারমর্ম হল, ইণ্ডিয়া থেকে সতুমামা ঘুরে এল। কলকাতাতেও গিয়েছিল।
কলকাতা দেখে হতাশ হয়েছে নিশ্চয়?
পল্লবের প্রশ্নে জয়া বলল, কলকাতায় গিয়ে বেচারির একটা অ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে। গরুতে গুঁতিয়ে সতুমামার হাত ভেঙে দিয়েছে। ডান হাত।
এক সেকেণ্ড থেমে জয়া প্রশ্ন করল, তুমি নাকি চাকরি করছ?
জয়ার প্রশ্ন শুনে গুটিয়ে গেল পল্লব। চাকরি থেকে কাল রাত বারটায় যে সে ছাঁটাই হয়েছে, বলতে পারল না জয়াকে। পল্লব প্রশ্ন করল, কে বলল?
চাকরি তোমাকে যে যোগাড় করে দিয়েছে।
অসীম রায়ের মুখ থেকেই চাকরির খবর শুনেছে জয়া। পল্লব বলল, চাকরিটা চলে গেল কাল।
কেন?
শরীরে জোর নেই।
জয়া বলল, অসীমের কাছ থেকে খবরটা শুনে আমি ভাবছিলাম, ওই অসুস্থ

শরীরে তুমি কীভাবে কাজ করবে? তাছাড়া বাসন মাজার ধকল খুব কম নয়।

চাকরিটা যে বাসন মাজার, জয়া জেনেছে শুনে ধড়াস করে উঠল পল্লবের বুক। জয়া চিঠি লিখে কলকাতায় অনিতাকে এ খবর জানালে সে খুশি হবে না। স্বামী বাসন মাজার চাকরি করছে শুনে কোন বিবাহিতা মেয়ে খুশি হয়? শুধু অখুশি নয়, পল্লবের অসুস্থ শরীরের কথা ভেবে সে ভারি উদ্বিগ্ন হবে। অবশ্য অনিতাকে তিনমাস সময়, তিনহাজার পাউণ্ডের কথা পল্লব চিঠিতে জানায়নি। বরং সব চিঠিতে লিখছে, এখন বেশ আছি আমি। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করছি। মার্চ মাস শেষ হওয়ার আগে, আশা করছি অপারেশন হয়ে যাবে।

প্রতি চিঠিতে মার্চ মাসের কথা লিখতে ভুলছে না পল্লব। জয়ার সঙ্গে কথা শেষ করে পল্লব রিসিভার রেখে দিতে সুন্দরলাল প্রশ্ন করল, চাকরি গেল কেন?

গত রাতের কাহিনী পল্লব শোনাতে থমথমে হল সুন্দরলালের মুখ। বিছানা ছেড়ে নেমে আগুনের সামনে একটা চেয়ার টেনে বসল পল্লব। একটু পরে সুন্দরলালকে সে প্রশ্ন করল, কিছুদিন আগে হাসপাতালে ঢোকার একটা মোক্ষম বুদ্ধির কথা আপনি বলেছিলেন আমাকে। সে বুদ্ধিটা কি?

এক সেকেন্ড চুপ করে থেকে সুন্দরলাল জবাব দিল, খুব তাড়াতাড়ি বলব। আর প্রশ্ন করল না পল্লব। পাশের ঘরে অথবা রান্নাঘরে ঢুকেছে সুন্দরলাল। পল্লব ভাবছে, আমি আর ভাবব না। ভাবনার শেষ নেই। ভাবা মানে অস্থিরতা, কষ্ট, হতাশা। তাছাড়া এত ভাবার দরকার কী? মূল খেলা আমি বুঝে গেছি। সুখ, শোক, বিষাদ, আনন্দের বাইরে পৃথিবীতে আমি একা, একক। এ মুহূর্তে মৃত্যু আর আমি মুখোমুখি, কে জিতবে, এ যুদ্ধে আমি জানি না। তবু প্রেম, প্রীতি, ভালবাসার শেকড় হাজার হাতে জীবনের মাটি আঁকড়ে ধরে আছে। ট্রেতে দু কাপ কফি নিয়ে ঘরে ঢুকল সুন্দরলাল। এককাপ নিজে নিয়ে পল্লবকে দিল আর একটা কাপ। টেবলে কফির কাপ রেখে পাশের চেয়ারে বসে একটা বই খুলে ঘাড় গুঁজে দিল সুন্দরলাল। কফির কাপে চুমুক দিয়ে পল্লব দেখল সুন্দরলালকে। কথা না বলে কিছু ভাবতে চাইলে বই খুলে এভাবে বসে থাকে সুন্দরলাল।

পাশের ঘর থেকে এসে মুমু একবার বাবাকে দেখে পল্লবের দিকে তাকিয়ে হাসল। সারা দুপুর ঘুমিয়ে ফুলে উঠেছে তার দু চোখ। ফোন বাজতে রিসিভার তুলল পল্লব। তারই ফোন। রিসিভার কানে লাগিয়ে রঞ্জনের গলা শুনতে পেল পল্লব। রঞ্জন বলল, আজ সন্ধ্যের পর পম্মায় দেখা করব তোর সঙ্গে। ওখানে কখন তুই পেঁছিবি ?

রঞ্জনের প্রশ্নে অস্বস্তি হলেও পল্লব বলল, পম্মায় নয়, তুই এখানে আয়।

কাজে যাবি না ?

কাজ নেই।

কেন ?

এলে বলব।

ঠিক আছে। যাচ্ছি।

পল্লব রিসিভার রাখতে বই থেকে মুখ তুলে সুন্দরলাল বলল, আমার শেষ চালটা জানার জন্যে তুমি যে ব্যস্ত বুঝতে পারছি। তোমার বন্ধু এলে বলব।

সুন্দরলালের রহস্যময় মুখ দেখে কিছু বুঝতে পারল না পল্লব। সুন্দরলাল সিগারেট পাকাচ্ছে। পল্লব ভাবল এমন কোন চালে তাকে নিশ্চয়ই সুন্দর-লাল জড়াবে না, যা তার অভিমান, মর্যাদা খাটো করে। তার মনের গঠন এতদিনে নিশ্চয় বুঝে গেছে সুন্দরলাল। নিজেকে শুনিয়ে পল্লব বলল, দয়া চাওয়ার কথা আমি ভাবতে পারলেও মুখ ফুটে চাইতে পারি না। অনেক চেষ্টাতেও পারি নি। কৃপা, করুণা চেয়ে ছোট হতে আমার লজ্জা করে, সংকোচ হয়। মরতে বসেও এ অভিমান কাটেনি আমার। বরং বাড়ছে।

বেশ তাড়াতাড়ি, পাঁচটার আগে প্লাস্টিক থলিতে ইটালিয়ান হোয়াইট ওয়াইনের একটা বোতল নিয়ে রঞ্জন এসে গেল। চকোলেটের একটা প্যাকেট দিল মুমুকে। মাঝখানে আরও একদিন পল্লবের জন্যে আপেল, আঙুর, কমলালেবু নিয়ে এসেছিল রঞ্জন। পল্লবকে কোন একটা কলেজ, পলিটেক-নিক বা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির জন্যে রঞ্জন উঠে পড়ে লেগেছে। ছাত্র হিসেবে পল্লব অপারেশন করাবার সুযোগ পেলে কলেজের অ্যাডমিশন ফি বাবদ পাঁচ, সাতশ পাউন্ড পর্যন্ত দিতে রঞ্জন রাজী। সুন্দরলালও জানে একথা।

ওয়াইনের বোতল সুন্দরলালের পাশে টেবিলের ওপর রেখে রঞ্জন বলল, হ্যালো ?

হ্যালো ইয়ংম্যান ?

সোফা থেকে উঠে রঞ্জনকে স্বাগত জানাল সুন্দরলাল। অফিসের ব্যাগ ঘরে নামিয়ে গ্যাবার্ডিনের ভিজে বর্ষাতি, ছাতা বাইরের হ্যাটস্ট্যান্ডে রেখে এল রঞ্জন। পল্লবকে একপলক দেখে প্রশ্ন করল, শরীর কেমন ?

ভালো। হাসতে চেষ্টা করল পল্লব।

চাকরি গেল কেন ?

রাতের ঘটনা রঞ্জনকে সংক্ষেপে বলল পল্লব। ঘটনা শুনে ম্লান মুখে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে থাকল রঞ্জন। পল্লবের চিকিৎসার ব্যবস্থা না হওয়ায় রঞ্জন দোষী ভাবছে নিজেকে। ছেলেবেলার বন্ধুকে চোখের সামনে কষ্ট পেয়ে, বিনা চিকিৎসায়, তিলে তিলে মরতে দেখেও কিছু করতে পারছে না। অসহায়তা, অশান্তিতে ছটফট করছে রঞ্জন। তার দুশ্চিন্তা, বেদনা পল্লবও টের পায়। পল্লবের দরকারী ওষুধ অবশ্য সব এনে দিয়েছে রঞ্জন। কিন্তু শুধু ওষুধ খেয়ে পল্লব সুস্থ হবে না। আরও কিছু করা দরকার। কোন একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পল্লবকে ভর্তির চেষ্টা করছে রঞ্জন।

বোতল খুলে তিনটে গ্লাসে সাদা মদ ঢেলে টেবিলের ওপর সুন্দরলাল রাখল। যে কোন সময়ে ডরোথি ফিরতে পারে জেনে একটা বাড়তি খালি গ্লাস নিয়ে এসেছে সুন্দরলাল। চকোলেট মুখে ঠেসে টিভি দেখছে মুমু। গ্লাসে চুমুক দিয়ে সুন্দরলাল নড়েচড়ে বসতে পল্লব বুঝল, তাকে নিয়েই বয়স্ক মানুষটা কথা পাড়বে। সে সুযোগ না দিয়ে রঞ্জনকে পল্লব বলল, তুই এবার বিয়ে কর। হো হো করে হেসে হাল্কা গলায় রঞ্জন বলল, ভাল পাত্রী আছে তোর খোঁজে ?

আছে।

কে ?

তুই রাজি হলে বলব।

না হলে ?

বলব না।

আবার একচোট হেসে রঞ্জন বলল, পাত্রীর নামটা শোনার জন্যে রাজি হয়ে

যেতে পারি কিন্তু।

কথার মধ্যে ঘরে ঢুকল ডরোথি। রঞ্জনকে দেখে হাসিমুখে বলল, হ্যালো?

সোফা ছেড়ে গ্লাস হাতে উঠে দাঁড়াল রঞ্জন। খালি গ্লাস ভরে ডরোথিকে এগিয়ে দিল সুন্দরলাল। রঞ্জন, সুন্দরলালের প্রথম গ্লাস ফুরিয়ে গেলেও পল্লবের গ্লাসে মদ প্রায় পুরো রয়েছে। দু চুমুক খেয়ে পল্লব আর খায়নি। সেদিনের মিষ্টি, লাল মদের পাশে জলের মত সাদা, বিবর্ণ, বয স্বাদ, এ মদ ভাল লাগছে না পল্লবের। জোর বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। ভাঙা জানালা দিয়ে কুলকুল করে ঘরে ঢুকছে হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা বাতাস। টেলিভিশনে শুরু হয়েছে ইউরোপীয় সঙ্গীত প্রতিযোগিতা। ইউরোপের প্রায় সব দেশ আর এশিয়া থেকে ইসরায়েল নাম দিয়েছে এ প্রতিযোগিতায়। মঞ্চসজ্জায়, শিল্পীদের পোশাকে চোখধাঁধানো জাঁকজমক। সোনালী চুল, অসাধারণ সুন্দরী, বছর বাইশ, তেইশের গ্রীক প্রতিযোগী গান গাইছে। পর্দায় এথেন্সের নির্জন সমুদ্রতীর, নীল সমুদ্রে ঢেউ উঠছে। যুবতী শিল্পী সমুদ্রতীরের বালিয়াড়ি ধরে হাঁটছে, ঝোড়ো হাওয়ায় উড়ছে তার সোনালী চুল, আত্মহারা আনন্দে গান গেয়ে চলেছে। গানের ভাষা না বুঝেও তার পাতলা লাল ঠোঁট, দুটো আয়ত চোখের উপচে পড়া খুশি দেখে সে যে এই বিশাল পৃথিবী, অসীম সমুদ্রের বন্দনা করছে, পল্লব অনুভব করল।

প্রতিযোগিতার পর ফলাফল ঘোষণা করে অনুষ্ঠান শেষ হতে রাত আটটা বাজল। ইটালিয়ান সাদা মদ শেষ হয়ে গেছে দেখে সুন্দরলালকে রঞ্জন প্রশ্ন করল, আর এক বোতল আনব?

নো, থ্যাঙ্কস্।

সুন্দরলালের জবাব শুনে পল্লবের গ্লাস দেখিয়ে রঞ্জন বলল, দু'চুমুক খেয়ে রেখে দিয়েছে। এ মদ ওর ভাল লাগেনি। ওর জন্যে অন্তত একটা সুইট, রেড ওয়াইন

পল্লব ঠেকাল রঞ্জনকে। বলল, খেতে ইচ্ছে করছে না আমার।

সোফা থেকে উঠে রঞ্জনকে ডরোথি বলল, ডিনার খেয়ে যাবে।

পল্লবের চিকিৎসার জন্যে সুন্দরলাল যে শেষ চাল ভেবেছে, এখন যে কোনও মুহূর্তে তা শোনার প্রতীক্ষা করছে পল্লব। রঞ্জনের সামনে নিজের পরিকল্পনা হাজির করার কথা ছিল সুন্দরলালের। কিন্তু সুন্দরলাল কথা

বলছে না কেন? সুন্দরলাল কি ভুলে গেল? ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক সংকট, টোরি পার্টির নষ্টামি, লেবার পার্টির ভণ্ডামি নিয়ে রঞ্জনের সঙ্গে আলোচনায় সুন্দরলাল মশগুল। দুটো দলই যে সমান বর্ণবিদ্বেষী, এ তত্ত্ব রঞ্জনকে বোঝাতে চাইছে সুন্দরলাল। কথা শুনে মনে হচ্ছে লেবার পার্টি সম্পর্কে রঞ্জনের দুর্বলতা আছে। লেবার দলের পক্ষে মৃদু গলায় দু একটা কথা বলার চেষ্টা করে সে থেমে গেল। পল্লব একভাবে তাকিয়ে আছে সুন্দরলালের দিকে। কথাটা সুন্দরলালকে মনে করাবে ভেবেও সংকোচে পারছে না। এই গুরুগম্ভীর আলোচনার মধ্যে নিজের প্রসঙ্গ তুলতে লজ্জা পাচ্ছে সে। একজন অসুস্থ মানুষকে নিয়ে সুস্থ মানুষেরা সবসময়ে আলোচনা করলে তারাও অসুস্থ হয়ে পড়ে। একথা পল্লব জানে। নিজের প্রসঙ্গ তুলে এ সজীব আড্ডাকে সে বিমর্ষ করতে চায়না। সে স্বার্থপর নয়। পল্লব তাই চুপ করে থাকল।

কিন্তু যে কোন কারণে তার মনে হল, নিজের পরিকল্পনাটা আপাতত চেপে রাখার জন্যে ইচ্ছে করে একটা অন্য আলোচনা ফেঁদেছে সুন্দরলাল। শেষ চাল ফাঁস করার আগে আরও সময় চাইছে সে। রঞ্জনের সঙ্গে তর্ক জুড়ে কয়েকবার আড়চোখে পল্লবের দিকে তাকাতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে সুন্দরলাল। দুজনের চোখাচোখি হতে তাড়াতাড়ি চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছে সে। হঠাৎ সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে সুন্দরলাল বলল, কিচেনে গিয়ে দেখি কতদূর হল।

তাড়াহুড়ো করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সুন্দরলাল। পল্লবের দিকে তাকিয়ে হাসল রঞ্জন। তারপর প্রশ্ন করল, আমার পুরনো কেচ্ছাটার কথা সুন্দরলালকে বলেছিস নাকি?

কোন কেচ্ছাটা?

কেচ্ছা আমার একটাই আছে। সেই কয়েকঘণ্টার বিয়ে।

নাহ, বলিনি।

পল্লবের কথা শুনে আরাম পেল রঞ্জন। কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ থেকে বলল, কেচ্ছা ঠিক একটা নয়, দুটো। দ্বিতীয় কেচ্ছাটা তোরা জানিস না। কলকাতার বন্ধুরা কেউ জানে না। আমি জানাই নি।

খবরটা নতুন। শুনে অবাক হল পল্লব। রঞ্জন কিছু ভাবছে। হঠাৎ সে

প্রশ্ন করল, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাঠে সেই সন্ধ্যেটা তোর মনে আছে?

কোন সন্ধ্যের কথা রঞ্জন বলছে বুঝতে পল্লবের অসুবিধে হল না। হওয়ার কথা নয়। বহুদিনের বন্ধুত্ব হলেও শুধু একবার, রঞ্জনের ভাষায়, কাগুজে বিয়ের দিনে তার সঙ্গে পল্লব ভিক্টোরিয়ার মাঠে গিয়েছিল। সঙ্গে ছিল কল্যাণ। পল্লব বলল, মনে আছে।

সেদিন আমার ওপর রেগে কল্যাণ একটা খারাপ কথা বলেছিল আমাকে। মনে আছে?

রঞ্জনের প্রশ্নে চোখ তুলে পল্লব বলল, নপুংসক।

রঞ্জন হেসে বলল, হ্যাঁ ঠিক এই শব্দটা বলেছিল কল্যাণ।

এক মুহূর্ত চুপ থেকে রঞ্জন বলল, এই একটা ছোট্ট শব্দ সেদিন পাথর করে দিয়েছিল আমাকে। আমাকে দু'পায়ে মাড়িয়ে সহেলি চলে যাওয়ার পরেও যা হয় নি কল্যাণের কথায় তাই হয়েছিল। বরং তার চেয়ে অনেক বেশি ঝড় তুলেছিল আমার মনে। আমার মনে হয়েছিল, কল্যাণের কথাই ঠিক, আমি নপুংসক, অক্ষম, কোন মেয়ের প্রেমিক হওয়ার যোগ্য নই। একজন অচেনা, উটকো লোক মাত্র ছ'মাস সহেলির সঙ্গে মিশে যা করতে পারল, ছ'বছর প্রেম করেও আমি তা পারলাম না। আমার মত অপদার্থ আর কে আছে? বাড়িতে চার-পাঁচদিন গুম হয়ে বসেছিলাম। নিজেকে নপুংসক হিজড়ে ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল আমার। হঠাৎ যেন চটকা ভেঙে জেগে উঠলাম। আমি যেন নপুংসক নই, সুস্থ, সবল একজন পুরুষ, এ সত্য প্রমাণের জেদ চেপে ধরল আমাকে। সহেলির এক বন্ধু, সায়েন্স কলেজের জুনিয়র রিসার্চ স্কলার, মন্দিরার সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। মন্দিরার সঙ্গে তিন- চার বছর আগে সহেলি আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। ওয়ারলেসের আধুনিকীকরণ ছিল মন্দিরার গবেষণার বিষয়। তখন যে চাকরি আমি করতাম, ওয়ারলেসের নকশা থেকে হাতে কলমে যন্ত্র তৈরি পর্যন্ত সব ছিল আমার দায়িত্বে। মন্দিরাকে সাহায্য করার জন্যেই তাকে আমার কাছে নিয়ে এসেছিল সহেলি। তারপর সহেলির সঙ্গে আরও তিন-চার বার মন্দিরা এসেছিল আমার কাছে। বেশ ঘনিষ্ঠতা, বন্ধুত্ব হয়েছিল মন্দিরার সঙ্গে। কিন্তু সবসময় আমি মনে রাখতাম যে মন্দিরা হল সহেলির বন্ধু। তার বেশি নয়। গবেষণার কাজে ঠেকে গেলে মাঝে মাঝে মন্দিরা একা, কখনও অফিসে, কখনও আমার বাড়িতে এসে দেখা করত। মাঝে মাঝে আমার মনে হত, শুধু কাজের জন্যে

মন্দিরা আসে না, তার অন্য তাগিদও আছে। কথাটা সহেলিকে জানাতে সে উল্টে ধমক দিয়ে বলেছিল, তুমি মশাই খুব খারাপ লোক।
আমি কথা বাড়াইনি। কিন্তু মন্দিরাকে এড়াবার চেষ্টা করতাম। সব বুঝেও মন্দিরা গায়ে মাখত না বরং আমার নিষ্ঠা, সততায় মুগ্ধ হয়েছিল সে। প্রায়ই বলত, সহেলি খুব ভাগ্যবতী।
তার কথা না শোনার ভান করতাম আমি।
সহেলি চলে যাওয়ার এক হপ্তা পরে, সায়েন্স কলেজের করিডোরে মাঝদুপুরে আমাকে দেখে অবাক মন্দিরা প্রশ্ন করেছিল, কী খবর?
আমি বললাম, প্রশান্তর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। সে নেই। ফিরে যাচ্ছি।
সায়েন্স কলেজের ফিজিক্স-এর অধ্যাপক প্রশান্ত চক্রবর্তী আমার বন্ধু হলেও তার সঙ্গে দেখা করতে আমি যাইনি। মন্দিরাকেই খুঁজতে গিয়েছিলাম। কিন্তু মন্দিরার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যেতে মুখ ফসকে একটা মিথ্যে কথা বেরিয়ে এসেছিল। একপলক আমাকে দেখে মন্দিরা প্রশ্ন করল, অফিসে ফিরবেন?
নাহ্, আমি বললাম, কফি হাউসে গিয়ে আড্ডা মারব।
কেউ আসবে?
নাহ, দু একজন বন্ধুর সঙ্গে হয়ত দেখা হয়ে যেতে পারে।
করিডোর ছেড়ে সিঁড়ি দিয়ে পাশাপাশি নিচে নামছিলাম আমরা। যে মন্দিরা দেখা হলেই সহেলির কথা বলত, সেদিন তার নাম উচ্চারণ করল না। মন্দিরার মুখ, কথার ভঙ্গী দেখে আমার মনে হচ্ছিল, কাগুজে বিয়ের কথা সে জানে।
সায়েন্স কলেজের লন পেরিয়ে গেটের কাছে এসে মন্দিরা প্রশ্ন করেছিল, যা শুনেছি, তা কি সত্যি?
মন্দিরার প্রশ্নে শান্ত গলায় বলেছিলাম, কী শুনেছেন, না জেনে সত্যি মিথ্যে বলা মুশকিল।
আপনার সময় আছে?
এখন কোনও কাজ নেই।
পার্ক স্ট্রিটের একটা রেস্টুরেন্টে সেদিন সন্ধ্যে পর্যন্ত কাটিয়ে যখন মন্দিরাকে নিয়ে বেরলাম, তখন আমার মনে হল, আমি যে নপুংসক নই, রীতিমত

একজন পুরুষ,খুব তাড়াতাড়ি প্রমাণ হবে। রেস্টুরেন্টে বসে মন্দিরা বলেছিল যে, সহেলির ব্যবহারে সে মর্মাহত।

আরও কিছু কথা তারপর মন্দিরা বলল, যার মানে, আপনি একনম্বর বোকা, মেয়েরা কী চায় জানেন না।

মন্দিরার কথা শুনে বলেছিলাম, বোধহয় তাই। তবে এ ভুল আর করব না। আমার জবাবে খিলখিল করে হেসেছিল মন্দিরা। তারপর যা হবার তাই, মন্দিরার সঙ্গে হপ্তায় দু'দিন দেখা, ঘনিষ্ঠতা, আপনি থেকে তুমি হল। কল্যাণের গাল খণ্ডন করে পৌরুষ প্রমাণের জন্যে মন্দিরার সঙ্গে মিশতে শুরু করে ভালবেসে ফেললাম তাকে। ভীষণ বুদ্ধিমতী, সপ্রতিভ মেয়ে ছিল সে। একদিন বলল, সেদিন দুপুরে প্রশান্তবাবু নয়, আমার সঙ্গে দেখা করতে সায়েন্স কলেজে গিয়েছিলে তুমি।

মন্দিরার আবিষ্কার হাসিমুখে আমি মেনে নিয়েছিলাম। মনে মনে তাকে বিয়ে করা ঠিক করলেও মুখে বললাম না। তুখোড় প্রেমিকের মত নিয়মিত দেখা, প্রেমালাপের মধ্যে ঠিক করে ফেললাম, আগের ভুল আর করব না। পুরনো প্রেমের ভূত তখনও আমার ঘাড়ে চেপে ছিল। একজন অচেনা, টিকো লোক যেভাবে সহেলিকে দখল করেছিল, অনেকটা সেভাবেই প্রেম আর পৌরুষ, দুটো দিয়েই আমি জয় করতে চাইলাম মন্দিরাকে। এক ছুটির দুপুরে মন্দিরা এসেছিল আমার বাড়িতে। আগেও অনেকবার সে এসেছে। বাড়ির সকলে, এমনকি মাও চেনে মন্দিরাকে। মন্দিরারও আলাপ আছে সকলের সঙ্গে।

ছেলেমেয়ে নিয়ে দাদা বৌদি গিয়েছিল আমার পিসিমার বাড়ি। নিজের ঘরে দরজা ভেজিয়ে মা ঘুমোচ্ছিল। ফাঁকা বাড়ি নিঝুম। আমার ঘরে খাটের ওপর মন্দিরা, চেয়ারে আমি বসে ছিলাম। নানা কথা, খুনসুটি চলছিল। মন্দিরাও ছিল খোলামেলা, উচ্ছল। আমার রুমাল দিয়ে ঠোঁটের রঙ মুছে মুচকি হেসে সে বলেছিল, তোমার বৌদি যেন এ রুমাল না দেখেন। একবার খাট ছেড়ে উঠে আমার পাঞ্জাবিতে লেগে থাকা টুকরো চুল ঝেড়ে দিল। বাড়ি ফেরার তাড়া আছে জানিয়েও বিছানা থেকে সে উঠছিল না। মন্দিরার কথা, হাসি, কটাক্ষে সহেলির সঙ্গে অনেক নিবিড়, ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের মিল পাচ্ছিলাম আমি। আমার বোকামিতে সে সব মুহূর্ত নিষ্ফল হয়ে গেছে। সহেলি কী চেয়েছিল, বুঝতে পারিনি আমি। বিছানায় বসে থাকা মন্দিরাকে

দেখে মনে হল, সে কী চায়, আমি বুঝেছি। দ্বিতীয়বার ভুল করার মত বোকা আমি নই। মেয়েরা কী চায়, এখন আমি বুঝতে শিখেছি। আমি যে পুরুষ, সে প্রমাণ আজ দেব। মন্দিরার ওপর আমি ঝাঁপিয়ে পড়তে সে ধাক্কা দিয়ে সরাতে চাইল আমাকে। আমি ভাবলাম, পেটে খিদে, মুখে লাজ। গায়ের জোরে প্রেমিকার লজ্জা কাটিয়ে দেওয়ার নাম পৌরুষ। আমি গায়ের জোর খাটাতে লেগে গেল ধস্তাধস্তি, শব্দহীন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। মন্দিরার প্রতিরোধে আমার একরোখা জেদ ক্রমশ চড়তে থাকল। পাঁচ-সাত মিনিট চেষ্টা করে মন্দিরাকে বাগে আনতে না পেরে আমার মনে হল, কিছু একটা ভুল হয়েছে।

ছেড়ে দিলাম মন্দিরাকে। মন্দিরার নখের আঁচড়ে, কামড়ে আমার হাত, মুখ, কাঁধ ছড়ে, কেটে রক্তপাত হচ্ছিল। সারা শরীর জ্বলছিল। বিছানার কোণে বসে ফুল ফুলে কাঁদছিল মন্দিরা। ঘাড় তুলে তাকাতে পারছিলাম না আমি। কখন যে মন্দিরা চুপচাপ চলে গেল, আমি খেয়াল করিনি। আমার হিসেব নিকেশ কেমন গুলিয়ে গিয়েছিল। তারপর অনেক চেষ্টা করেও মন্দিরার দেখা পাইনি। সায়েন্স কলেজে আসাও ছেড়ে দিয়েছিল সে। আমার সঙ্গে সে যে কোনও সম্পর্ক, যোগাযোগ রাখতে চায় না, বুঝতে পেরে-ছিলাম আমি। লণ্ডনে আসার দু-তিনমাস পরে খবর পেলাম, মন্দিরার বিয়ে হয়ে গেছে।

রঞ্জন চুপ করতে অদ্ভুত নীরব হয়ে গেল ঘর। রান্নাঘর থেকে ভুরভুর করে মাংসর গন্ধ আসছে। সুন্দরলাল পাকা রাঁধুনী। প্রায় তিন দশক ইংল্যাণ্ডে থেকেও ভারতীয় রান্নায় সে ওস্তাদ।

রঞ্জনের গল্প শুনে অকারণে শান্তার কথা মনে পড়তে পল্লব হাসল।

হাসছিস কেন, প্রশ্ন করল রঞ্জন।

জীবনটা বড় আজব।

ঠিক তাই।

পল্লবের কথায় সায় দিয়ে রঞ্জন আবার বলল, আজব জীবন দেখে হাসি পায়, কান্নাও পায়।

ঠিক তাই।

রঞ্জনের কথায় সায় দিয়ে পল্লব বলল, কাঁদতে লজ্জা করে। কান্না হজম করতে হাসতে হয়।

রান্নাঘর থেকে এসে সুন্দরলাল বলল, ডিনার ইজ্ রেডি।

ঘাড় নুইয়ে রঞ্জন বলল, থ্যাংক্ ইউ স্যর।

ভোররাত থেকে পল্লবের কাশি শুরু হল। আবছা ঘুম ভেঙে যেতে পল্লব টের পেল দু-চোখে জ্বালা, ম্যাজম্যাজ করছে শরীর। বোধহয় জ্বর হয়েছে। কনকনে শীতে, কাকভেজা হয়ে পরশু রাতে বাড়ি ফিরেছে সে। লজ্জা, অপমানে শীত, বৃষ্টি গ্রাহ্য করেনি। তার অবস্থা দেখে আঁতকে উঠেছিল সুন্দরলাল। ভিজে পোশাক বদলে ফায়ার প্লেসের সামনে সুন্দরলাল পাশের ঘরে চলে যাবার পরেও অনেকক্ষণ বসেছিল পল্লব। শরীরের স্নায়ু, শিরা মাঝে মাঝে কেঁপে কুঁকড়ে যাচ্ছিল। জ্বরজারির আশংকা তখনই করেছিল পল্লব। চব্বিশ ঘণ্টা পরে জাঁকিয়ে আসছে জ্বর। কলকাতায় থাকতে বারবার ডাঃ রায় ঠাণ্ডা যাতে না লাগে, সে বিষয়ে সতর্ক করতেন পল্লবকে। সে দিন স্মিথের মুখেও তার সার্জারিতে পল্লব একই কথা শুনেছে। বিওয়ার অব্ কোলড্, হার্টের এ অবস্থায় ঠাণ্ডা লেগে সর্দিজ্বর হলে খারাপ কিছু হতে পারে।

কিন্তু রাত বারটার সেই তুমুল বৃষ্টিতে, যা থামার কোন লক্ষণ ছিল না, পল্লব কতক্ষণ একটা আশ্রয়ের তলায় দাঁড়াতে পারত। মাইনে পেয়ে এ হপ্তায় একটা বর্ষাতি অথবা ছাতা কেনার কথা ভেবে রেখেছিল পল্লব। আর দরকার হবে না। ছাতা, বর্ষাতিতে বৃষ্টি থেকে বাঁচলেও ঠাণ্ডা ঠেকাত কী করে? ঘরের ভেতরেও হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা। চুল্লির আগুনে ঘর গরম হয় না। সকাল হওয়ার আগেই সর্দিতে পল্লবের বুক, গলা বুজে আসছিল।

টিসু পেপারে নাক মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকল সুন্দরলাল। ঠাণ্ডাতে সেও কাহিল হয়ে পড়েছে। বাতের কষ্টের ছাপ তার মুখে। জানলার পর্দা সুন্দরলাল সরিয়ে দিতে কুয়াশার মধ্যে গীর্জার আবছা চূড়া পল্লব দেখতে পেল। চার্চের পাশে কংকালের মত নিষ্পত্র এক গাছ। পল্লবের মনে হল, গলার কাছে হাল্কা কাঠের টুকরোর মত কিছু আটকে আছে। নিঃশ্বাসের সঙ্গে কণ্ঠনালীতে ওঠানামা করছে সেটা। ডরোথির আজ ছুটি। কফি খেয়ে মুমুকে নিয়ে সে বাজারে গেল। টাইপরাইটারে কাগজ গুঁজে খটাখট টাইপ করে যাচ্ছে সুন্দরলাল। দরজা খুলতে না পেরে কলঘরে আটকে গেলে যেমন হয়, পল্লবের মনে হল, চারপাশের পৃথিবী, ঘরের দেওয়াল ছাত কুঁকড়ে, ছোট হয়ে কফিনের চেহারা নিচ্ছে। নব্বই দিন শেষ হয় নি। ছেচল্লিশ দিন

বাকি থাকতেই মৃত্যু হাজির হয়েছে। বাঁচার আগ্রহে এত তাড়াতাড়ি মৃত্যুকে হয়ত পল্লব নিজেই ডেকে এনেছে। কান্না সামলাতে জানলার বাইরে তাকিয়ে পল্লব দেখল, তুষার পড়ছে। পেঁজা তুলোর মত ঝাঁকঝাঁক বরফ তেরচাভাবে নেমে আসছে পৃথিবীতে। ফিনফিনে তুষারের লঘু গতি দেখে মনে হয়, মাটি ছোঁয়ার আগে গলে, মিলিয়ে যাবে বাতাসে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। চারপাশ, গীর্জার গায়ের কঙ্কাল গাছ সাদা হয়ে উঠছে। বরফের সাদা চাদরে ধীরে ধীরে ঢাকা পড়ছে বাড়ির ছাত, চিমনির মাথা, টেলি-ভিশনের অ্যাণ্টেনা, পিচের রাস্তা। এতদূর এসে মরে যাওয়ার কথা ভাবতে পল্লবের কষ্ট হচ্ছে। পল্লব মনে মনে বলল, কলকাতা থেকে ছ-হাজার মাইল দূরে তাহলে এলাম কেন? কী লাভ হল এসে? ভারতবর্ষের অজ পাড়াগাঁয়ে একজন অসহায় রোগী বিনা চিকিৎসায় যেভাবে ধুঁকতে ধুঁকতে মারা যায়, আমারও কি তাই হবে? অজ পাড়াগাঁর সঙ্গে লণ্ডন শহরের কি কোন তফাত নেই? পয়সা না থাকলে স্বদেশে, বিদেশে, শহরে, গাঁয়ে মানুষ সমান অসহায়? ইংল্যাণ্ডবাসী কোন গরিব হয়ত এভাবে মরত না। আমাকে মরতে হবে। আমার অপরাধ, আমি শুধু গরিব নই, অনুন্নত, গরিব দেশের নাগরিক। হার না মেনে দাঁতে দাঁত টিপে লড়েও মুখুয্য, রুগ্ন, ভারতীয় গেঁয়ো মানুষটার পরিণাম মেনে নিতে হবে আমাকে।

বুকের মধ্যে ঘড়ঘড় সর্দির স্রোত, কাশলেও উঠছে না। কষ্টে শরীর বেঁকে যেতে, পল্লব নিজেকে বোঝাল, কিছু একটা হবে, নিশ্চয়ই হবে, এভাবে মরার হলে কলকাতাতেই আমি মরতাম। এতদূর আসতে পারতাম না। আমাকে বাঁচাবার জন্যেই পৃথিবী, প্রকৃতি, মানুষ, সযত্নে আগলে ছ-হাজার মাইল দূরে নিয়ে এসেছে।

বাজার থেকে ফিরে ঘরে ঢুকে ডরোথি বুঝল, পল্লব খুব অসুস্থ।

নরম গলায় প্রশ্ন করল, আর ইউ ও কে?

ঘাড় নেড়ে ভাল আছি, বোঝাতে চাইলেও পল্লবের ফ্যাকাসে, রুগ্নমুখ দেখে ভাল থাকার প্রমাণ পেল না ডরোথি।

ইলেকট্রিক টাইপরাইটার বন্ধ করে সুন্দরলাল এসে দাঁড়াল। পল্লবের কপালে হাত রেখে গম্ভীর হল সুন্দরলালের মুখ। ডরোথির সঙ্গে চোখে চোখে কথা হল তার।

ঘণ্টাখানেক পড়ার পর বরফ বন্ধ হল। দুপুরের দিকে আকাশে একফালি নিরুত্তাপ রোদ উঠতে পল্লব দেখল, নিচের রাস্তা কঠিন বরফে ঢাকা। মিনিট পনের কুড়ি রোদের পর আকাশে মেঘ জমতে শুরু করল। দুপুর শেষ হওয়ার আগে আবার কালো হয়ে এল পৃথিবী। তিনটের সময় পল্লবের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে সুন্দরলাল বলল, চলো, একটু ঘুরে আসি।

রাস্তায় পুরু কঠিন বরফ, আকাশের মেঘ, হুহু ঠাণ্ডা হাওয়ায় আরও বড় দুর্যোগ শুরুর লক্ষণ দেখেও সুন্দরলালের ঘুরতে যাওয়ার কথাটা বিশ্বাস করতে পারল না পল্লব। তার জন্যে দুশ্চিন্তায় মানুষটা খেপে গেল নাকি? শরীরে জ্বরের তাপ, বুকে সর্দি, গলার কাছে কাঠের টুকরো, বেড়াতে যাওয়া দূরের কথা, বিছানা ছেড়ে পল্লবের ওঠার শক্তি নেই। উঠতে ইচ্ছেও করছে না তার।

চলো, ঘুরে আসি।

দ্বিতীয়বার সুন্দরলাল ডাকতে বিছানায় উঠে বসল পল্লব। সুন্দরলালের আচরণে অবাক হলেও, এই দুর্যোগে সে কোথায় যেতে চায়, পল্লব জিজ্ঞেস করল না। বেতাল শরীরে কোনমতে পোশাক বদলে নিল। ওভারকোট চাপিয়ে পল্লব ঘরের বাইরে যাওয়ার আগে সুন্দরলাল বলল, তোমার ট্রাউজার্স, জ্যাকেট, ওভারকোটের পকেটে যা আছে, রেখে যাও।

কেন?

সুন্দরলাল বলল, রাস্তায় বেরিয়ে বলব।

সুন্দরলালের কথায় কয়েকটা পাউণ্ড, কিছু টুকরো কাগজ, অনিতা, বুবাই-এর লেখা একটা এয়ার লেটার, পকেট থেকে বার করে পল্লব টেবিলের ওপর রাখল। সুন্দরলালের হেঁয়ালি রহস্য ধরতে না পেরেও, এই বোধহয় তার শেষ চাল, এরকম এক অবস্থা ধারণা করল পল্লব। শক্ত, সাদা বরফে ঢাকা পিচ্ছল রাস্তায় সুন্দরলালের সঙ্গে এসে দাঁড়াল পল্লব। সুন্দরলাল বলল, সাবধান, বরফে পা পিছলে পড়ে যেও না।

সুন্দরলালের পাশাপাশি সতর্ক পায়ে রাস্তা হাঁটছে পল্লব। রাস্তায় কদাচিত দু'একজনকে দেখা যাচ্ছে। বাতাস বন্ধ হওয়ায় ছাইরঙা আকাশ আর এক পশলা তুষারপাতের আয়োজন করছে। বাতাস না থাকলেও হিলহিলে তীক্ষ্ন ঠাণ্ডায় পল্লবের নাকের ডগা, কানের লতি জ্বলছে কানের ভেতরেও শুরু হয়েছে কটকটে ব্যথা। একটা দোতলা লাল বাস ধরে

সুন্দরলালের সঙ্গে হোবোর্ন টিউব স্টেশনে এসে পল্লব নামল। গাটে গাঁয়ে ব্যথার জন্যে টিউবের বদলে বাসে যাতায়াত, সুন্দরলালের বেশি পছন্দ। পল্লব সঙ্গে থাকলে তো কথা নেই। পাতালমুখো হয় না সুন্দরলাল। সব স্টেশনে এসকালেটর, লিফ্‌ট থাকলেও দু-দশটা সিঁড়ি ভাঙতে হয়। সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামায় পল্লবের যে সবচেয়ে বেশি কষ্ট, সুন্দরলাল জেনে গেছে। তবু পল্লবকে নিয়ে হোবোর্ন টিউব স্টেশনের কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়াল সুন্দরলাল। পাতাল রেলে এমনিতেই ভিড়, আজ বরফ পড়ায় ভিড় আরও বেড়েছে। বাসে যারা যাতায়াত করে বরফ, বৃষ্টি, ঠান্ডা এড়াতে মাটির তলায় নেমে এসেছে তারা। মাটির নিচে বেশ গরম। রেলের কামরায় গরম আরও বেশি। হাইড্‌পার্ক স্টেশনের টিকিট কিনে পল্লবকে নিয়ে সুন্দরলাল উঠল পিকাডিলি লাইনের একটা ট্রেনে। তাকে নিয়ে সুন্দরলাল কোথায় যাচ্ছে, পল্লব জানে না। মানুষটার কথা, আচরণে ধাঁধা লাগছে পল্লবের। সর্দি, কাশি, জ্বরে অসুস্থ পল্লবও যেন এক ঘোরে আছে। শুয়ে থাকা, হাঁটা, দুটোই তার কাছে সমান। অন্ধকার সুরঙ্গ ফুঁড়ে গমগম শব্দে ট্রেন ছুটে চলেছে। ট্রেনের কামরা বেশ গরম হলেও পল্লবের হাড় পর্যন্ত কাঁপছে। পল্লবের কানের কাছে মুখ এনে সুন্দরলাল বলল, চোখের সামনে এভাবে তোমাকে মরে যেতে দেব না। আজ আমি শেষ চাল, সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথে যাব। তাছাড়া কোন উপায় নেই।

একটা সিগারেট পাকিয়ে বার দুই টেনে পল্লবের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে সুন্দরলাল বলল, হাইডপার্কে আমরা নামবো। পার্কের একটু ভেতরে একটা বেঞ্চে তোমাকে শুইয়ে দিয়ে কাছাকাছি কোথাও আড়ালে অপেক্ষা করব আমি। আজ কাজের দিন, তার ওপর এই দুর্যোগ শীতে পার্কে কেউ আসবে না। আধঘণ্টা বেঞ্চে তুমি শুয়ে থাকলে আমার পরিকল্পনা হাসিল হবে।

কথা বলার ক্ষমতা, ইচ্ছে, কিছুই নেই পল্লবের। ট্রেনের লম্বা, বড় কামরায় দশ বারোজন যাত্রী ছড়িয়ে বসে আছে। কেউ কারও দিকে তাকাচ্ছে না, অন্যের কথা শোনার আগ্রহও কারও নেই। কামরার চারপাশে একবার নজর চালিয়ে সুন্দরলাল বলল, হাইডপার্কে একটা পুলিসচৌকি আছে। সারা বছর, চব্বিশঘণ্টা পার্কের মধ্যে পুলিসের দুটো গাড়ি টহল দেয়। এই শীতের সন্ধ্যেতে বেঞ্চিতে তুমি শুয়ে থাকলে পুলিস ঠিক নজর করবে।

তারপর প্রশ্ন করে সদুত্তর না পেলে তারা অ্যারেস্ট করবে তোমাকে।

একমুহূর্ত চুপ করে থেকে সুন্দরলাল বলল, আমি চাই, পুলিস অ্যারেস্ট করুক তোমাকে। তোমাকে ধরেই পুলিস বুঝবে, তুমি অসুস্থ। তখন তারা হাসপাতালে পাঠাবে তোমাকে। তারপর তুমি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তোমার অপরাধের বিচার বা শাস্তি হবে না।

এক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে সুন্দরলাল বলল, একটা কাজ শুধু করতে হবে তোমাকে। তুমি কথা বলবে না, বোবা সেজে থাকবে।

জ্বরে আচ্ছন্ন হলেও পল্লবের মনে হল, সুন্দরলাল একটা গল্প শোনাচ্ছে। গত তিন চারদিন মন দিয়ে সুন্দরলালকে যে বইটা পল্লব পড়তে দেখেছে, এ কাহিনী কি সেখানে আছে? এভাবে কি চিকিৎসা হয়, বাঁচা যায়?

চিকিৎসার জন্যে অপেক্ষা করে পল্লবের দম, ধৈর্য ফুরিয়ে গেছে। একটা কিছু ফয়সালা সেও চায়। তার ওপর সে সুন্দরলালের অতিথি, আশ্রিত, বোঝার মত তার সংসারে চেপে আছে। এখন সুন্দরলালের ব্যবস্থা, চাল মেনে নিতে কষ্ট হলেও মুখে সে কথা পল্লব বলবে কী করে? বেকার সুন্দরলালকে তার রোজগেরে, যুবতী মেম বৌ হয়ত কড়া কথা শুনিয়েছে। ডরোথিকে দেখে পল্লবের সেরকম মনে না হলেও, বাস্তব যে কঠিন, নিষ্ঠুর সে জানে। নিরুপায় সুন্দরলাল ইচ্ছে না থাকলেও তাই তড়িঘড়ি একটা ছেলেমানুষী পরিকল্পনা এঁটে হাসপাতালে পাঠাতে চাইছে তাকে।

পল্লব আর ভাবতে চায় না। ভাবার শক্তি, ইচ্ছে তার নেই। সে বাঁচতে চায়। বাঁচার জন্যে পাকা মাথার সুন্দরলালের ছেলেমানুষী পরিকল্পনা পল্লব মেনে নিল।

হাইড পার্ক স্টেশন থেকে বেরবার সময় সুন্দরলাল বলল, তোমার শরীর এত তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়ছে যে আমি আর অপেক্ষা করার সাহস পাচ্ছি না।

সুন্দরলালের গলায় হতাশা, বিষাদ, দু-চোখের অসহায় শূন্যতা, এই প্রথম খেয়াল করল পল্লব। ছোট গুহাপথ পেরিয়ে আট-দশটা সিঁড়ি টপকে স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়াল দু'জন। বাঁ দিকে তাকিয়ে পল্লব দেখল, বরফে মোড়া শুধু ফাঁকা মাঠ, পাতাহীন অসংখ্য গাছের কঙ্কাল তুষারের চাদর মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঠাণ্ডা বাতাস শুরু হতে বরফের বদলে ঝিপঝিপ বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টির জল বরফের চেয়ে ঠাণ্ডা। ছাইরঙা আকাশ ঘন কালো হয়েছে। ঠাণ্ডায় বুকের কলিজা পর্যন্ত শুকিয়ে যাচ্ছে। এমন

খারাপ আবহাওয়া গত দু'মাসে পল্লব দেখেনি। এ আবহাওয়ায় পার্কে মানুষ থাকে না। নেইও কেউ। সামনে যতদূর দেখা যায় নিস্পন্দ, নিশ্চুপ, জনহীন বরফের মরুভূমি। মাঠের চারপাশে ডাঁই করা পচা পাতার স্তূপে বৃষ্টির চড়চড় শব্দ। পার্কের বাঁধানো বক্তৃতামঞ্চ ছেড়ে একটু ভেতরে রাস্তার ধারে কাঠের একটা ভিজে বেঞ্চ দেখিয়ে পল্লবকে সুন্দরলাল বলল, শুয়ে পড় এখানে।

সুন্দরলালের গলায় চাপা উদ্বেগ, ব্যস্ততা। খরচোখে রাস্তার দু-দিকে নজর রাখছে। ডুবে যাওয়ার আগে শেষবার খড়কুটো ধরে বাঁচার আশায় পল্লব বলল, কাজটা কি ঠিক হচ্ছে ?

উপায় নেই, সুন্দরলাল বলল, আই ক্যান নট সি ইউ ডায়িং। চোখের সামনে আমি মরতে দিতে পারি না তোমাকে। এদেশে এ ঘটনা আগেও ঘটেছে। বই পড়ে আমি জেনেছি। হারি আপ, আর দেরি নয়। কাছাকাছি আমি থাকব।

বেঞ্চের ওপর লম্বা হয়ে পল্লব শুয়ে পড়তে বড় বড় পা ফেলে বিশ পঁচিশ হাত দূরে ঘন গাছের আড়ালে মিশে গেল সুন্দরলাল। যাবার আগে মনে করিয়ে দিল, পুলিসের সামনে বোবা সেজে থাকবে। ঠাণ্ডা, ভিজে কাঠের বেঞ্চে শুয়ে শরীরের ওপর বৃষ্টি, হাওয়ার যথেচ্ছাচার পল্লব অনুভব করতে পারছে। টের পাচ্ছে মাথার চুল ভিজে সপসপে, আড়ষ্ট ভারী হচ্ছে হাত, পা। নাকে, কানে এত জ্বালা, যেন অঙ্গগুলো খসে গেছে। দুচোখ মেলে তাকাতে কষ্ট হচ্ছে। মরা মুখের মত নিথর আকাশ, কোথাও কোন শব্দ নেই। অনেক দূর থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে গাড়ির ফিকে আওয়াজ। পল্লবের মনে হল, মনোহর পুকুরের বাড়িতে বিছানায় শুয়ে আছে সে। তার সামনে ইজিচেয়ারে বসে বুড়ো ঠাকুরদা একজন লোকের সঙ্গে কথা বলছে। কার সঙ্গে কথা বলছে ঠাকুরদা ? চোখ ঘুরিয়ে দরজার কাছে সমরবাবুকে দেখল পল্লব। কিন্তু দশবছর আগে লিভার ফেটে সমরবাবু মারা গেছে। মৃত সমরবাবু এখানে এল কোথা থেকে। তখনই তার মনে পড়ল, ঠাকুরদাও মৃত। সমরবাবু পাঁচ বছর আগে, তার মানে পনের বছর হল, সেরিব্রাল থ্রম্বোসিসে মারা গেছে ঠাকুরদা। ভারি অবাক হয়ে দরজা থেকে ইজিচেয়ারের ওপর দৃষ্টি ফেলে পল্লব দেখল, চেয়ার খালি, ঠাকুরদা নেই।

হঠাৎ অ্যাম্বুলেন্সের পুলিসের গাড়িও হতে পারে, বাঁশির শব্দ শুনল সে। বুক কাঁপানো তীক্ষ্ম সে ধ্বনি বেঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছে। তার মানে হাসপাতালে, পুলিসে, হাইডপার্কের বেঞ্চে, অজ্ঞাত পরিচয়, অসুস্থ এক বিদেশীর শুয়ে থাকার খবর হয়ে গেছে। এখন তাকে অ্যারেস্ট করবে পুলিস। তারপর বিচার করে সাজা দেওয়ার জন্যে তাকে সুস্থ চাঙ্গা করে তোলা হবে। হর্ন বাজিয়ে ঝড়ের গতিতে ছুটে আসছে একটা দুধসাদা অ্যাম্বুলেন্স। হিটারের তাপে গরম হয়ে আছে অ্যাম্বুলেন্সের খোল, ধপধপে পরিষ্কার চাদর ঢাকা বিছানা। হর্নের শব্দ বেঞ্চের পাশে এসে থেমে গেল। ঘোরলাগা চোখ সামান্য খুলে পল্লব দেখল, ছেঁড়া ছেঁড়া কুয়াশায় নির্জন পার্ক ডুবে আছে। অ্যাম্বুলেন্স নেই। পাহাড়ের মত ঠাণ্ড হুড়মুড় করে নেমে এল পল্লবের দেহের ওপর। হঠাৎ তার মনে পড়ল সুন্দরলাল এবং তার পরিকল্পনার কথা। সুন্দরলালের পরিকল্পনা কি ব্যর্থ হল ?

মেঘে মেঘে দিন শেষ হলেও এখন খাঁটি অন্ধকার ঘনাচ্ছে পৃথিবীতে। রাতের শরীরে কোনও ভেজাল নেই। এই হিমবাতাস, বৃষ্টি, দুর্যোগে আজ রাতে কেউ হাইড পার্কে আসবে না। সুন্দরলাল বলেছিল পার্কের পুলিস চৌকির গাড়ি আধঘণ্টা অন্তর টহল দেয়। কোথায় গেল সে গাড়ি ? প্রাকৃতিক দুর্যোগে তারাও কি চৌকির অফিস ছেড়ে আজ বেরয়নি ?

পল্লবের মনে হল কুয়াশার টলমলে নৌকো চেপে সে ভেসে যাচ্ছে। ছোট নৌকো ভীষণ দুলছে। বেঞ্চের ওপর থেকে তার শরীর শানবাঁধানো মেঝেতে সপাট আছড়ে পড়ল। পড়ে গিয়ে ব্যথা লাগল না তার। ভিজে শানের ওপর শুয়ে থাকল সে।

কেউ ধাক্কা দিতে চোখ খুলে পল্লব দেখল, কানঢাকা বাঁদুরে টুপি পরা একজন অচেনা লোক তাকে টেনে তোলার চেষ্টা করছে। কী যেন বলছে সে। গলা চেনা, কিন্তু লোকটাকে চিনতে পারছে না পল্লব।

জেসাস্ ক্রাইস্ট, পড়ে গেলে কী করে ?

দুহাতে পল্লবকে তুলে দাঁড় করিয়ে সুন্দরলাল বলল, হ্যালো ইয়ংম্যান দাঁড়াও, দাঁড়াবার চেষ্টা কর।

বেশ কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থেকে পল্লব চিনল সুন্দরলালকে। পল্লবকে দাঁড় করাতে বুড়ো মানুষটা হাঁপাচ্ছে, তার শ্বাস পড়ছে ঘনঘন। বাঁদুরে

টুপি মাথা থেকে খসে গলায় ঝুলছে। এলোমেলো চুল। হাওয়ায় পচা পাতার নড়াচড়ার শব্দ। সুন্দরলালকে প্রায় জাপটে ধরে দাঁড়িয়ে আছে পল্লব। তার হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠে আসছে মুখের কাছে। শক্ত হাতে তাকে ধরে আছে সুন্দরলাল। পল্লবকে প্রায় ঘাড়ে করে পার্কের বাইরে এনে একটা ট্যাক্সি ধরল সুন্দরলাল। পল্লবকে গাড়িতে তোলায় সুন্দরলালকে সাহায্য করল ট্যাক্সি ড্রাইভার। পল্লবের মুখ দেখে তার শারীরিক সংকটাপন্ন অবস্থার কথা বুঝতে সুন্দরলালের অসুবিধে হল না। আফসোস করছে সুন্দরলাল। তার বোকামিতেই পল্লব মরতে বসেছে। হার্ট ফেল করে না মরলেও অসুস্থ ছেলেটা হয়ত ডাবল্ নিউমোনিয়ায় মারা যাবে। সুন্দরলাল বিড়বিড় করল, জেসাস ক্রাইস্ট, হোয়াট এ্যা ব্ল্যাডি ফুল আই অ্যাম!

ট্যাক্সির দরজা জানলা বন্ধ। হিটারের ভেতরটা বেশ গরম। জানলার বন্ধ কাঁচের বাইরে রাস্তার আলো ফুলকির মত উড়ে যাছে। ভিজে রাস্তায় চাকার ঘসটানির শব্দ। পল্লবের মাথা কোলে নিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সুন্দরলাল। তার চশমার মোটা কাঁচে পিছলে যাচ্ছে রাস্তার আলো।

পল্লব বলতে চাইল, আমি মরে যাচ্ছি। আই অ্যাম ডাইং।

তার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরল না। বোবা সাজতে গিয়ে সে সত্যি বোবা হয়ে গেছে। কখন, কীভাবে বাড়ি ফিরল, পল্লবের মনে নেই। চোখ খুলে দেখল ঘরের তিনটে আলোই জ্বলছে। ফায়ারপ্লেসে বেলচায় তুলে কয়লা দিচ্ছে সুন্দরলাল। পায়ের কাছে জ্বলছে প্যারাফিন হিটার। এত আলো, তাপ সত্ত্বেও পল্লবের মনে হল কনকনে শীত, অন্ধকারে, ফাঁকা হাইডপার্কের বেঞ্চে সে শুয়ে আছে। ভেলার মত ডুবছে, ভাসছে কাঠের বেঞ্চ।

দু-দিন চামচ কড়া ব্র্যান্ডি পল্লবকে খাওয়াল সুন্দরলাল। সব পেটে গেল না, কষ বেয়ে কিছুটা বাইরে গড়িয়ে পড়ল। পল্লবের পায়ে হটব্যাগের সেক দিচ্ছে ডরোথি। পল্লবের বুকে কান পেতে হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে গিয়ে রেলইঞ্জিনের আওয়াজ শুনল সুন্দরলাল। মানুষের হৃৎপিণ্ডে এমন শব্দ হয়, সুন্দরলাল জানত না। পল্লবের নাকের কাছে আঙুল তুলে তার নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা, সুন্দরলাল দেখে নিল। প্রশ্ন করল, হ্যালো ইয়ংম্যান

এখন কেমন লাগছে ?

শূন্য চোখে তাকিয়ে পল্লব ঠোঁট নাড়তে তার কথা শোনার জন্যে ঝুঁকে পড়ল সুন্দরলাল। একটা শব্দ শুনল না। বাড়ি ফিরে সুন্দরলাল ফোনে জরুরী তলব পাঠিয়েছে স্মিথকে। যে কোনও মুহূর্তে ডাক্তার এসে যাবে। আচ্ছন্নের মত বিছানায় পড়ে আছে পল্লব। ঘরের মধ্যে হঠাৎ গমগম আওয়াজ, কাঁধে আলতো ঝাঁকুনিতে চোখ খুলে পল্লব দেখল, তার সামনে লম্বা চওড়া দশাসই এক কালো মানুষ। পল্লব চিনল স্মিথকে। পল্লবের দিকে তাকিয়ে ঝকঝকে দুপাটি দাঁত, স্মিথ হাসছে। পল্লবের বুকে স্টেথো। হাতে ব্লাডপ্রেশার মাপার ফিঁতে লাগিয়ে পরীক্ষা করল স্মিথ। তার দু-হাতের ফিকে সবুজ আঙুলগুলো নেড়েচেড়ে দেখে স্মিথ বলল, এখনই হাসপাতালে পাঠাতে হবে। অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করছি আমি। রিসিভার তুলে স্মিথ যখন ফোন করছে, তার জন্যে কফি নিয়ে ডরোথি ঘরে ঢুকল। কফির কাপ হাতে পল্লবের বিছানার পাশে স্মিথ বসল। ঘরের তিনটে আলো স্মিথের মুখের চারপাশে যেন জড়ো হয়েছে। ঈশ্বরবিশ্বাসী না হলেও পল্লবের মনে হল তার বিছানার পাশে চেয়ারে ভগবান বসে আছে। ভগবানের গায়ের রঙ কালো।

এবার সত্যি দূর থেকে ভেসে আসা অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনের কাঁপাকাঁপা ধ্বনি শুনল পল্লব। চোখ বুজে অন্ধকার ফুঁড়ে এগিয়ে আসা মাথায় ঘুরন্ত বেগুনি আলো লাগানো একটা সাদা অ্যাম্বুলেন্স দেখতে পেল পল্লব। অ্যাম্বুলেন্সের গরম পেটের মধ্যে নরম বিছানায় সে শুয়ে আছে। স্বপ্ন ভেঙে যাবার ভয়ে চোখ না খুলেও পল্লব টের পেল, পোশাক বদলে তাকে রাত্রিবাস পরাচ্ছে সুন্দরলাল। ডরোথির সঙ্গে দুজন স্বাস্থ্যবান লোক স্ট্রেচার নিয়ে ঘরে ঢুকল। এক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে দুজন সতর্কভাবে পল্লবকে স্ট্রেচারে তুলে কম্বলে ঢেকে দিল তার শরীর। তুলোর মত নরম, মসৃণ কম্বল তাপ ছড়াচ্ছে তার শরীরে। ডান হাতের বুড়ো আঙুল তুলে মুখে সেই অসামান্য হাসি ছড়িয়ে পল্লবকে স্মিথ বলল, টেক ইট্ ইজি বাই। আবছা তন্দ্রার মধ্যে পল্লব ভাবল, ইজি মানে সহজ। রোগ, মৃত্যু, ভালো, মন্দ. সবকিছু সহজভাবে নিতে হবে।

ঝকঝকে তকতকে বিশাল ওয়ার্ডে দু সারিতে মোট আটটা বেড। অক্সিজেনের টিউব নাকে ফর্সা চাদর পাতা গদির বিছানায় পল্লব শুয়ে আছে। মাথার

ওপর দেওয়ালের তাকে রাখা ছোট টেলিভিশনের মত কার্ডিওস্কোপ যন্ত্রের একটা তার ফিতে দিয়ে বুকের যেখানে হৃৎপিণ্ড সেখানে লাগানো রয়েছে। কার্ডিওস্কোপের পর্দায় পল্লবের হৃৎস্পন্দন আলোর রেখাচিত্রে একটানা ফুটে উঠছে। পর্দার একপাশ থেকে আর একপাশে ছোটাছুটি করছে জোনাকি রঙের আলোর বিন্দু। পল্লবের বাঁপাশে রাজপুত্রের মত চেহারা, বছর চোদ্দর ছেলেটার নাম আইভ্যান। সুইমিং পুলে ডাইভ্ দিতে গিয়ে ঘাড়ে চোট লেগে গত একবছর আইভ্যান শয্যাশায়ী। নড়াচড়া করতে পারে না। সারাক্ষণ চিত হয়ে শুয়ে আছে। ঘাড়ের কোন একটা স্নায়ু নষ্ট হয়ে গেছে। পল্লবের ডানপাশে লম্বা, মজবুত শরীর, একাত্তর বছরের রোগীর নাম ইস্রায়েল মোজেস্। হীরের ব্যবসায়ী, মোজেস হল ইহুদী। পল্লব মুসলমান নয় জেনে খুশি হয়ে তার সঙ্গে নিজে আলাপ করল মোজেস্। একতরফা আলাপ। পল্লব কথা বলতে পারছে না। কথা বলতে গেলে তার গলা থেকে অদ্ভুত ফ্যাঁসফেঁসে আওয়াজ বেরচ্ছে। হাইডপার্কের কুয়াশা, বরফ, শীত, পচা পাতার হাওয়ায় কাল সন্ধ্যেতে সেই কাঠের টুকরোটা তার কণ্ঠনালীতে আটকে গেছে।

সামনের ক্রিমরঙ দেওয়ালে একটা বড় গোল ঘড়ির সেকেণ্ডের লম্বা হাত তির তির করে এগিয়ে চলেছে। ঘড়ির তলায় মোজেসের মুখোমুখি বেডে বয়স্ক রোগীর চোখ দুটো টিকটিকির মত, মুখে চোখে বিরক্তি। সকালে ঘুম থেকে উঠে পল্লবকে দেখে সে খুশি হয়নি। নাকে চশমা, বুকে খবরের কাগজ, লোকটা এখন ঘুমোচ্ছে। নাকের বদলে মুখ দিয়ে শ্বাস নিচ্ছে। ফুরুৎ ফুরুৎ আওয়াজ বেরচ্ছে মুখ থেকে। পল্লবের সামনের বিছানায় বৃদ্ধ মিঃ সাবেনির বয়স আশি, নব্বই, এমনকি একশও হতে পারে। বিছানার তলায় রাখা ইউরিনালের ওপর কালো কালিতে লেখা মিঃ সাবেনি দেখে বৃদ্ধের নামটা পল্লব জেনেছে। আটটা বেডের দুটো খালি। দুটোয় রোগী নেই। ওয়ার্ডের ডানদিকের বড় বড় জানলার বন্ধ কাঁচ দিয়ে মাথায় অ্যাণ্টেনার জট দরজা, জানলা বন্ধ ওয়েস্ট এণ্ডের প্রাসাদের মত বাড়িগুলো দেখা যায়।

ফাইলবন্দী কাগজপত্র হাতে পল্লবের বিছানার পাশে এসে একজন নার্স প্রশ্ন করল, হাউ আর য়ু দিস্ মর্নিং, মাইডিয়ার, কেমন আছ আজ ?

পল্লবের গলায় দুর্বোধ্য আওয়াজ শুনে তার মুখের কাছে কান এনে কথা-

গুলো বুঝতে চেষ্টা করল নার্স। পারল না। অ্যাম্বুলেন্সে চেপে কাল রাতে পল্লবের সঙ্গে হাসপাতালে এসে রোগীর নাম, ঠিকানা, রোগের বিবরণ ডাক্তারকে জানিয়েছিল সুন্দরলাল। নিজের পরিচয় দিয়েছিল পল্লবের কাকা। ওয়ার্ডের ফিকে সবুজ আলোয় পল্লবের বিছানা ঘিরে তখন দাঁড়িয়েছিল দুজন ডাক্তার, দুজন নার্স। ডেটলের গন্ধমাখা থার্মোমিটার পল্লবের জিভের তলায় একজন নার্স রাখতে তার হাত তুলে পালস্ পরীক্ষা করতে শুরু করল এক ডাক্তার। আর একজন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছিল সুন্দরলাল। তার কথার জরুরী খবরগুলো সাদা কাগজে দ্বিতীয় নার্স চটপট লিখে নিচ্ছিল। আবছা চেতনার মধ্যে চারপাশে কী ঘটছে বুঝতে চাইছিল পল্লব।

সামনের বড় ঘড়িতে এগারটা বাজল। পল্লবের একটা কথাও বুঝতে না পেরে নার্স প্রশ্ন করল, তুমি কী কর ?

পল্লব কিছু বলতে চাইল, পারল না। ফাইল খুলে ছাপানো ফর্মে নার্স লিখল, স্টুডেণ্ট, ছাত্র।

তোমার জি পি-র নাম কী ? ন্যাশনাল হেলথের কার্ডের নম্বর কী ?

নার্সের একটার পর একটা প্রশ্ন শুনে জবাব দেওয়ার তীব্র বাসনা বুকে পাকা দিলেও টুঁ শব্দ করতে পারল না পল্লব। শব্দ, ভাষা তার গলা থেকে মুছে গেছে। হোর্স ভয়েস, ভাঙা গলা, বলে বিরক্তমুখে নার্স চলে যেতে চোরা-পথে ন্যাশনাল হেলথের কার্ড ছাড়া হাসপাতালে ঢোকার ভয়ে অস্থির হল পল্লব। স্মিথের দেওয়া কার্ড অনুযায়ী তার এখনও হাসপাতালে ভর্তির সময় হয়নি। রোগীদের ওয়েটিং লিস্টে সবে তার নাম উঠেছে। সে ছাত্র নয়, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী বা এদেশের নাগরিক নয়, চিকিৎসার জন্যে ছ-মাসের ভিসা নিয়ে এদেশে ঢুকেছে। কথা বলতে পারলেও এসব ঘটনা সে জানাত কিনা সন্দেহ। কিন্তু সত্য গোপন করেই বা কী লাভ। সে যে বেআইনী রোগী, আজ অথবা কাল জানাজানি হবে। তখন ঠগ, জোচ্চোর ভেবে তাকে তাড়িয়ে দেবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তীরে এসে ডুবে যাবে নৌকো।

পল্লব ভাবে, মাঝখান থেকে নষ্ট হয়ে গেল কণ্ঠস্বর। বোবা হয়ে গেলাম আমি। কেন হলাম ? হার্টের অসুখ থেকে কি মানুষ বোবা হয় ? মরার আগে বাকি পঁয়তাল্লিশ দিন যদি বাঁচি, আমি কি কথা বলতে পারব না ?

সেন্ট্রাল হিটিং হাসপাতাল এমন গরম যে একটার বেশি কম্বল লাগে না। দুর্ভাবনায় চোখের পাতা ভারি হয়ে ঘুম আসে পল্লবের। নিজেকে লুকিয়ে রাখার জন্যে কম্বল মুড়ি দিয়ে চোখ বুজে সে শুয়ে থাকে। বারটা বাজার কিছু পরে খয়েরি ইউনিফর্ম পরা শিক্ষানবিস দুজন নার্স চাকা লাগানো ট্রলি ঠেলে ওয়ার্ডের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। ট্রলিতে সাজানো ঢাকা দেওয়া খাবারের প্লেট। ঢাকা সরিয়ে ধোঁয়া ওঠা গরম খাবার রোগীদের বেডে পেঁছে দিল তারা। পল্লবের নাকের অক্সিজেন নল, বুকে লাগানো কার্ডিওস্কোপের তার খুলে দিয়ে একজন নার্স বলল, খেয়ে নাও।

আইভ্যানের মাথার কাছে বসে তাকে খাওয়াতে শুরু করেছে আর একজন। খাওয়ার ইচ্ছে না থাকলেও বালিশে ঠেস দিয়ে আধশোয়া হয়ে বসে প্লেট থেকে একটুকরো পাঁউরুটি আর সেদ্ধ মাংস নিয়ে মুখে ঢোকাল পল্লব। মাংসের গন্ধে গা গুলিয়ে উঠল। কাঁচা লেটুস পাতা স্পর্শ করল না সে। মোজেসের জন্যে রাংতায় মোড়া প্যাকেটে ইহুদিদের ধর্মীয় খাবার, কোশের লাঞ্চ এসেছে। টকটকে লাল রঙ, ছ'ফুট লম্বা, হাতে পায়ে মোটা মোটা হাড়, তীক্ষ্ণ, খাড়া নাক, মাথায় টাক মোজেস খাওয়া সেরে পল্লবের বিছানার পাশে এসে বলল, তুমি ছাত্র, ভাল করে খাও।

হাসতে চেষ্টা করল পল্লব।

যে কোন মুহূর্তে বিতাড়িত হওয়ার ভয়ে হাসপাতালে পল্লবের চার দিন কেটে গেল। দিন যায় আর পল্লবের উদ্বেগ, আতঙ্ক ঘন হয়। ডাক্তার, নার্স কেউ ওয়ার্ডে ঢুকলে হাসপাতাল থেকে খারিজের নোটিস আসছে ভেবে পল্লব কাঁপতে থাকে। সে ভাবে, আমার চালাকি, ফিকির নিশ্চয় ধরা পড়ে গেছে।

নার্স, ডাক্তার ওয়ার্ডের কাজ নির্বিকার মুখে সেরে চলে গেলেও পল্লব নিশ্চিন্ত হতে পারে না। সাবেনি, আইভ্যান ছাড়া ওয়ার্ডের বাকি তিনজন রোগীরই অপারেশন নিয়ে দুশ্চিন্তা, ভয় আছে। কিন্তু তাদের ভয়ের সঙ্গে পল্লবের ভয়ের তফাত আছে। অপারেশন হবে ভেবে তাদের ভয়, আর অপারেশনের সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে ভেবে ভয় পাচ্ছে পল্লব। বুকে অনিশ্চয়তার ছটফটানি নিয়ে পল্লব ভাবে, ওয়ার্ডের এই রোগীরা কত নিরাপদ, ভাগ্যবান, শুধু আমি হতভাগা। অসুস্থ হৃৎপিণ্ড অপারেশন করাতে এসে সে কাজ তো হল না, গলার স্বর হারিয়ে বোবা হয়ে গেলাম।

পল্লবের বেডের মুখোমুখি বিছানায় শীর্ণ, পাকানো শরীর, মুখে বিরক্তি, রাগ ঊনসত্তর বছরের বৃদ্ধ রোগীর নাম, ডেভিড হিল। হৃৎপিণ্ডের মাই-ট্রাল ভালভ্ অপারেশনের জন্যে সে একমাস এই ওয়ার্ডে অপেক্ষা করছে। যখনই তার অপারেশনের দিন ঠিক হয়, তার চেয়ে একজন সংকটাপন্ন রোগী তখন এসে যায়। বেশ কয়েকবার এভাবে তার অপারেশন বাতিল হয়েছে। পল্লব যে গুরুতর অসুস্থ, তার বুকের দুটো ভালভ্ খারাপ, প্রথম রাতে জানার পর থেকে তার সঙ্গে কথা বলছে না হিল।

একবার পল্লবের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ঘড়াৎ করে একটা ঢেঁকুর তুলে নিজের মনে হিল বলল, এক্সকিউজ মি।

সারাদিনে কম করে পনেরবার এই অদ্ভুত শব্দ করে, এক্সকিউজ মি বলে হিল। এখান থেকে তিনতলার পোস্ট অপারেটিভ ওয়ার্ডের রোগীদের সঙ্গে রোজ সকালে একবার হিল দেখা করতে যায়। তাদের কাছ থেকে অপারেশনের আগে, পরে, চব্বিশ ঘণ্টায়, আটচল্লিশ ঘণ্টায় কী হয়, কেমন লাগে, জেনে আসে।

দুপুরে খাওয়ার পরে মোজেসের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে হিল বলল, বুক-কাটা লোকগুলোর সঙ্গে রোজ দেখা করে, কথা বলে মাথাটা এমন গুলিয়ে গেছে, যে মনে হচ্ছে, আমারই দশবার অপারেশন হয়ে গেছে। আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে কে জানে!

হিলকে খোঁচাতে মোজেস বলল, রোজ ওপরে যাওয়ার দরকার কী?

হিল বলল, আছে। নিজের মনকে তৈরি করছি আমি।

পল্লবের দিকে আড়চোখে একপলক দেখে মোজেসকে হিল বলল, হাস-পাতালে উটকো বিদেশীরা ভিড় না করলে কবে অপারেশন হয়ে যেত আমার!

না শুনতে চাইলেও হিলের কথাগুলো পল্লবের কানে যেতে অপমানে, আতঙ্কে সে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। মোজেসের সঙ্গে কথা বলে ওয়ার্ডের শেষ মাথায় ডাক্তার, নার্সদের কাঁচের ঘরে গিয়ে ঢুকল হিল। তারপর কাঁচের ঘর থেকে টিকটিকির চোখের মত দুচোখের নজর পল্লবের ওপর রেখে, ডাক্তার নার্সকে কিছু বলতে শুরু করল। হিল যে তার নামেই অপবাদ, অভিযোগ ছড়াচ্ছে, বুঝতে পল্লবের অসুবিধে হল না। হিলের সঙ্গে কথার মধ্যে ডাক্তার, নার্স তাকাচ্ছে পল্লবের দিকে। কাঁচের আড়ালে থাকলেও তাদের চোখের অসন্তোষ দেখতে পেল পল্লব। আতঙ্কে হিম

হয়ে পল্লব ভাবল, আমার দফা শেষ। এবার আমাকে এখান থেকে যেতে হবে।

বিকেল শুরু হওয়ার আগে সরকারী ডাঃ মার্টেলিকে নিয়ে ওয়ার্ডে ঢুকে কলিন্স সোজা পল্লবের বেডের পাশে চলে এলেন। অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে কলিন্স পরীক্ষা করলেন পল্লবকে। পল্লবের চোখের সামনে কলিন্সের খয়েরি ছিট দেওয়া প্রশস্ত টাক। এই শীতেও টাকে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমে আছে। গম্ভীর মুখে, যেন পল্লবকে প্রথম দেখছেন, এভাবে পরীক্ষা করলেন কলিন্স। একটা কথা বললেন না পল্লবের সঙ্গে। পল্লব চাইছিল যে কথা বলে কলিন্স জেনে যান যে তাঁর রোগী বোবা হয়ে গেছে। মাথায় বাদামী চুল, দু'চোখের তারায় চাপা হাসি বছর চল্লিশের ডাঃ মার্টেলি ইটালির লোক। মার্টেলি যে চটপটে মজাদার, দেখেই বোঝা যায়। পল্লবের সঙ্গে চোখাচোখি হলেই মার্টেলি চোখ মারে। কলিন্সের সঙ্গে ওয়ার্ডে এসে একটু আগেও পল্লবের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপেছে মার্টেলি। মার্টেলি কেন এমন করে, এটা তার স্বভাব, না কোনও সংকেত, পল্লব বুঝতে পারেনি এখনও। মার্টেলির পেছনে নরম শরীর, কচি মুখ একগাদা ফাইল হাতে মিস শার্লি দাঁড়িয়ে আছে। সদলে কলিন্স চলে যাওয়ার পর পল্লব দেখল, মোজেস তার বিছানার পাশে চেয়ারে গম্ভীর মুখে বসে আছে। হাসিখুশি মোজেস কেন গম্ভীর, পল্লব ধরতে পারল না। মিনিট পাঁচ, সাত পরে মোজেসই কারণটা বলল পল্লবকে। আজ দুপুরে মোজেসের ওপর রাগ করে পাশের ওয়ার্ডে হিল চলে গেছে। দোষের মধ্যে রোজ, সকাল, সন্ধ্যে ফ্রেস এয়ারের জন্যে জানলার স্কাইলাইটের শার্সি দশ, পনের মিনিট খুলে রাখত মোজেস। শীতকাতুরে, পিটপিটে হিল বিছানায় বসে দু-তিন দিন কেশে, টিসু পেপারে নাক ঝেড়ে বাইরের ঠাণ্ডা যে তার সহ্য হয় না, জানান দিয়েছে। মোজেস বুঝতে পারেনি। কাল সকাল, দুপুরের খাবার হিল ফিরিয়ে দিতে নার্স এসে প্রশ্ন করল, কী ব্যাপার?

স্কাইলাইটের খোলা শার্সির দিকে তাকিয়ে হিল বলেছিল, ঠাণ্ডা লেগে শরীর, মাথা ভার হয়ে আছে। মনে হচ্ছে, জ্বর হবে।

হিলের দৃষ্টি অনুসরণ করে শার্সি খোলা স্কাইলাইট দেখেছিল নার্স। অভিজ্ঞ নার্সের ঘটনা বুঝতে দেরি হয়নি। শার্সির দড়ি ধরে মোজেসের

চোখের সামনে সে কাঁচ বন্ধ করে দিয়েছিল। অপমানে লাল হয়ে গিয়েছিল মোজেস। আজ সকাল থেকে সে একটা কথা বলে নি হিলের সঙ্গে। দুপুর পর্যন্ত কম্বল মুড়ি দিয়ে বিছানায় শুয়ে থেকেছে। বেগতিক দেখে ডাক্তারকে বলে পাশের ওয়ার্ডে জায়গা করে নিয়েছে হিল।

নিজের নাম লেখা ইউরিনালের মুখে ঠোঁট লাগিয়ে থুথু ফেলছে সাবেনি। অথর্ব, বৃদ্ধ সাবেনি ধর্মভীরু। সময়ের ধারণা এলোমেলো হয়ে যাওয়ায় ভোর হয়েছে ভেবে রোজ মাঝরাতে উঠে বাইবেল পড়তে শুরু করে। আবছা সবুজ আলোয় বিছানায় বসা সাবেনির কুঁজো, শীর্ণ শরীর আবেগে দুলতে থাকে। শ্লেষ্মা, কান্না জড়ানো গলায় বাইবেল পাঠের সময় তার চোখের জলে জীর্ণ পুরনো ধর্মগ্রন্থটা ভিজে যায়। অনেক চেষ্টা করেও নিস্তব্ধ মাঝরাতে একটা শব্দ পল্লব বুঝতে পারেনি। অন্ধকারে অন্ধের মত সাবেনির বাইবেলের পাতা ওল্টানো দেখে, পল্লব বুঝেছে যে পাঠের সঙ্গে পাতার আদপে মিল নেই। গতকাল মাঝরাতে পল্লব জেনেছে যে, পুরো বাইবেল সাবেনির মুখস্থ। পাতা ওল্টানোর অভ্যেসে সে পাতা উল্টে যায়। বাইবেল হাতে না থাকলে সে অস্থির হয়, তার স্মৃতি কাজ করে না।

পাঁচ নম্বর বিছানায় তিনমাস হল, সাবেনি আছে। অপারেশনের জন্যে সাবেনি হাসপাতালে এলেও, তার অপারেশন হবে না। জরাজীর্ণ শরীর, এবং বয়সের দরুন তাকে অপারেশন করার সিদ্ধান্ত বাতিল হয়েছে। সাবেনিকে দেখার কেউ নেই বলে হাসপাতালে রেখে দেওয়া হয়েছে তাকে। মৃত্যু পর্যন্ত এই পাঁচ নম্বর বেডে হয়ত সাবেনি থেকে যাবে।

মার্টেলি, শার্লিকে নিয়ে কলিন্স চলে যেতে ওয়ার্ড হঠাৎ খুব নিস্তব্ধ, শান্ত হয়ে গেল। মিনিট পনের পরে শুরু হবে ভিজিটিং আওয়ার। আত্মীয় বন্ধুদের আসার প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে উঠছে রোগীরা। শব্দহীন সে অধীরতা দোতলার তিনটে ওয়ার্ডে, মেয়েদের একটা পুরুষদের দুটো, স্থির হয়ে আছে। চারটে বাজতেই ফুল, ফল, স্কোয়াসের বোতল হাতে ভিজিটর আসা শুরু হল। মোজেসের বিছানা ছাড়া আর কোথাও ভিড় নেই। বাকি বেডের রোগীদের কাছে এক বা দু'জন ভিজিটর। সাবেনির বিছানার পাশে এক পাদরি। হপ্তায় এই একজনই নাকি দেখতে আসে সাবেনিকে। রোগীদের আত্মীয় বন্ধুদের ঝকঝকে চেহারা, রঙীন, উজ্জ্বল পোশাক, মুখ দেখে পল্লব খুব একা, নিঃসঙ্গ বোধ করল। অনিতা, বুবাই, ফুলি, মা, বাবা,

আরও অনেকের কথা ভেবে আনচান করতে থাকল তার মন। বন্ধ জানালার বাইরে ফ্যাকাসে আকাশের গায়ে কুয়াশা জড়ানো অ্যাণ্টেনার দাঁত, মহাশূন্যকে কামড়াতে চাইছে।

মুমুকে নিয়ে সুন্দরলালকে আসতে দেখে খুশিতে ভরে গেল পল্লবের মন। রোজ বিকেলে সুন্দরলাল একা অথবা মুমুকে সঙ্গী করে আসে। রঞ্জন, ডরোথিও একবার করে এসে গেছে। বাকি বন্ধুরা খবর পেলেও এখনও এসে উঠতে পারেনি। এদেশে জীবন এত দ্রুত, কাজে ঠাসা যে উইকএণ্ড ছাড়া দম ফেলার সময় পায় না মানুষ। সামাজিক দেখাসাক্ষাৎ, লোকলৌকিকতা উইকএণ্ডেই সারতে হয়। শুক্রবারের সন্ধ্যে থেকে রবিবারের রাত পর্যন্ত উইকএণ্ডের এই মরুদ্যানের দিকে তাকিয়ে হপ্তার নীরস মরুভূমি মানুষ পার করে। উইকএণ্ডে অনেকে হাসপাতালে যে তাকে দেখতে আসবে পল্লব জানে।

পল্লবের বিছানার পাশে টুলে বসে সুন্দরলাল প্রশ্ন করল, হ্যালো ইয়ংম্যান, শরীর কেমন ?

কথা বলার ক্ষমতা নেই। পল্লব হাসল।

কলাফুলের মত একগোছা লাল ফুল পরশু দুপুরে ডরোথি দিয়ে গিয়েছিল পল্লবকে। হাসপাতালের ফুলদানিতে সে ফুল সাজিয়ে পল্লবের মাথার কাছে টেবিলের ওপর রেখে দিল নার্স। ফুলগুলো আজও একরকম তাজা আছে। শীতের দেশে কিছুই খুব তাড়াতাড়ি মরে না, শুকোয় না, নষ্ট, খারাপ হয় না। মানুষগুলোও কি দীর্ঘকাল এমন তরতাজা থাকে ?

পল্লবের জন্যে আপেল, আঙুরের দুটো ঠোঙা টেবিলের ওপর রেখে সুন্দরলাল প্রশ্ন করল, খাবে নাকি ?

ঘাড় নেড়ে পল্লব জানাল, খাবে না।

তার শুকনো, ফ্যাকাসে মুখ দেখে কিছু আঁচ করে সুন্দরলাল বলল, স্মিথের হাত হয়ে যখন হাসপাতালে ঢুকেছ, তুমি তখন সরকারি রোগী। অপারেশন তোমার হবেই।

মুখে সাহস দিলেও পল্লবের বাক্‌শক্তি হারানোর ঘটনায় ঘাবড়ে গেছে সুন্দরলাল। ওয়ার্ডের অফিসঘরে ডাক্তার, নার্সদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেও সঠিক কারণ সে জানতে পারেনি। নিজের কাছে সুন্দরলাল যে অপরাধী হয়ে আছে, পল্লব বুঝতে পারে। সুন্দরলালের কোন দোষ, অপরাধ খুঁজে

পায় না সে। তার মঙ্গলের জন্যেই যা করার প্রকৃত বন্ধু হিসেবে সুন্দরলাল করেছে। কাজ করলে ভুলচুক হয়। এ কাজেও হয়েছে। সে জন্যে সুন্দরলালকে দায়ী করে না পল্লব। বরং সুন্দরলালের প্রতি কৃতজ্ঞতায় পল্লব আপ্লুত। কণ্ঠস্বরের চেয়ে রুগ্ন, জখম হৃৎপিণ্ড নিয়ে পল্লবের বেশি চিন্তা। অপারেশন হবে তো হাসপাতাল থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়াবে না তো, এ দুটো প্রশ্ন সারাক্ষণ তাকে খোঁচাচ্ছে। তার অপারেশন সম্পর্কে গত চার, পাঁচ দিনে ডাক্তার, নার্স, কেউ একটা কথা বলেনি। এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে গিয়ে পরিচয় ফাঁস হওয়ার ভয়ে পল্লব চুপ করে থেকেছে। তাছাড়া গলার যা অবস্থা, তার প্রশ্ন ডাক্তার, নার্স বুঝত কিনা সন্দেহ।

মোজেসের বিছানার পাশে তার স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, ছেলের বৌ, জামাই, সুখী যৌথ পরিবারের ছবি। তাদের পেছনে মুমু গিয়ে দাঁড়িয়েছে। চৌকোনা, মিষ্টি মুখ, রোগা, খাটো শরীর, দু-চোখের তারায় হাসি, বিষাদ, মোজেসের সুন্দরী বৌকে স্বামীর চেয়ে বিশ বছরের ছোট মনে হয়।

সুন্দরলাল বলল, জয়া, শান্তা ফোনে খবর নিয়েছে তোমার। এই উইকএন্ডে শান্তা দেখা করতে আসবে তোমার সঙ্গে।

দেওয়াল ঘড়িতে ছ'টা বাজতে টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সুন্দরলাল। রোগীদের কাছে থাকার সময় শেষ। এখনই ওয়ার্ড খালি হয়ে যাবে। আইভ্যানের মাথায় সজল চোখে তার রূপবতী মা হাত বোলাচ্ছে। মুমুকে ধরতে ওয়ার্ডের মধ্যে দৌড়ে বেড়াচ্ছে সুন্দরলাল। মুমুর ভাগ্যে যে আজ থাপ্পর আছে, পল্লব বুঝতে পারল।

দিন শেষ। পল্লবের জীবনের একটা দিন শেষ হল। হাতে রইল একচল্লিশ দিন। মাত্র একচল্লিশ দিনের পরমায়ুর কথা মনে এলেও এখন ভয় করছে না পল্লবের। এই সুরক্ষিত কেল্লায় একচল্লিশ দিন সে যদি নির্ভয়ে থাকার সুযোগ পায়, তাহলেও সে বর্তে যাবে। মৃত্যুর সঙ্গে শেষপর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চায় সে। বিনা-চিকিৎসায় মরার পরাজয়, লজ্জা সে মানতে রাজী নয়।

দর্শনার্থীরা চলে যেতে খালি হয়ে গেছে ওয়ার্ড। চারপাশ নিস্তব্ধ, চুপচাপ। ভিজিটিং আওয়ার শুরুর ঠিক আগে এবং পরে একই রকম উৎকণ্ঠ-নীরবতা ওয়ার্ডে থমথম করে। ছ'টা বালিশে মাথা, পিঠ রেখে সারা দিন, রাত বিছানায় আধশোয়া বসে থাকে। এটাই তার শোয়া। বালিশ সরিয়ে লম্বা

হয়ে শুলে তার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। সুন্দরলালের ছেড়ে যাওয়া টুলে উদ্বিগ্ন, গম্ভীর মুখে মোজেস এসে বসল। একমুহূর্ত চুপ থেকে পল্লবকে মোজেস বলল, কাল আমার হার্টে ক্যাথিডার হবে, আগামী হপ্তায় ঠিক সাতদিন পরে অপারেশন।

চিন্তিত মোজেসকে খুশি করার জন্যে পল্লব ডানহাত মুঠো করে বুড়ো আঙুল দেখাল। বুড়ো আঙুল সফলতা, সিদ্ধি শুভেচ্ছার প্রতীক।

পল্লবের খাটের বাজুতে হাত রেখে মোজেস বলল, একাত্তর বছর পৃথিবীতে থেকেও জীবনটাকে খুব ছোট মনে হচ্ছে আমার। কত সাধ, আকাঙ্ক্ষা এখনও অপূর্ণ রয়েছে। ভোগের ইচ্ছেও মরেনি। পৃথিবীর কাছ থেকে পুরো পাওনা একাত্তর বছরেও উসুল করতে পারিনি আমি।

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে মোজেস বলল, হঠাৎ অসুস্থ শয্যাশায়ী হব, একবছর আগেও ভাবতে পারিনি। জীবনে এত কাজ, আনন্দ, আরাম যে অসুখ বিসুখের কথা ভাবার সময় পাইনি। হীরে কিনতে, বেচতে দেশে দেশে ঘুরেছি। তোমাদের বোম্বেতে গেছি তিনবার। এত কাজ ঘোরা-ঘুরিতেও আমার মজবুত শরীর সামান্য টস্‌কায়নি। অথচ দ্যাখো।

কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল মোজেস। কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ বসে থেকে বলা ঠিক হবে কিনা ভেবে নিয়ে আবার কথা শুরু করল, একবছর আগে একটা পার্টি থেকে সস্ত্রীক মাঝরাতে বাড়ি ফিরলাম। আমার বৌ এমনিতে সুন্দরী, তুমি দেখেছ। সে রাতে বোধহয় নিখুঁত সাজার জন্যে আরও সুন্দরী দেখাচ্ছিল তাকে। বিয়ের বিয়াল্লিশ বছর পরে মাঝরাতে নিজের বৌকে দেখে স্বর্গের অপ্সরা মনে হয়েছিল আমার। কামনায় আতুর হয়েছিলাম আমি। এই আতুরতার মধ্যেই শুরু হল শ্বাসকষ্ট, মনে হল, পৃথিবীতে অক্সিজেন কমে গেছে, একটা কাঠের টুকরো আটকে আছে আমার শ্বাসনালীতে। কষ্টে, ভয়ে ঘেমে উঠলাম আমি।

আমার স্ত্রী খুব ধীর, স্থির, বুদ্ধিমতী, বিচক্ষণ মহিলা। আমার অসুস্থতা টের পেয়ে সে শান্ত করতে চাইল আমাকে। বলল, ঘুমোলে ঠিক হয়ে যাবে সব।

কিন্তু তার কথা আমি শুনব কেন? হেরে যাওয়ার লজ্জায় কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থেকে আবার আমি ফুঁসে উঠলাম। কিন্তু গর্জন বৃথা, হাঁপাতে থাকলাম, আবার হেরে গেলাম।

দু-দিন পরে আমাকে দেখে ডাক্তার বলল, ডায়ালেটেড হার্ট, হার্টের সাইজ বেড়ে গেছে, অপারেশন করাতে হবে। ডাক্তারকে বললাম, সুস্থ, স্বাভাবিক জীবন কাটাতে পারলে আমি অপারেশনে রাজী।
ডাক্তার বলল, পারবেন।
একটু থেকে মোজেস বলল, অপারেশন করিয়ে তাড়াতাড়ি, অন্তত একরাতের জন্যেও সুস্থ হতে চাই আমি। পরাজিত হয়ে মরে যাওয়া কাজের কথা নয়। সে মৃত্যুতে আমার আত্মা চিরকাল অশান্তি পাবে।

একদম দিশি মতে মুরগির মাংস রেঁধে ভিজিটিং আওয়ার শেষ হওয়ার পরে প্রায় সাড়ে ছ-টায় হাসপাতালে এল শান্তা। ভারতীয় দোকান থেকে এক-শিশি আচারও এনেছিল পল্লবের জন্যে। ঢাকা খুলে আচারের শিশিটা পল্লবের নাকের সামনে ধরে শান্তা প্রশ্ন করল, কেমন গন্ধ ?
শিশির ওপর নাক রেখে জোরে শ্বাস টানতে চেনা, লোভনীয় একঝলক গন্ধ পল্লবের প্রায় বুকে গিয়ে ঠেকল। হাসপাতালের খাবার পল্লব খেতে পারে না। খাবার উপাদেয়, স্বাস্থ্যকর হলেও পল্লবের রুচি হয় না। শুধু স্বাস্থ্যের তাগিদে যে মানুষ খায় না, পল্লব জানে। কথা বলার শক্তি না থাকায় সে অভিমতটা জানাতে পারল না শান্তাকে। রঞ্জনও আজ দেরিতে হাসপাতালে এসেছে। ওঠার মুখে শান্তা এসে যাওয়ায় রঞ্জন বসে গেল। একটু আগে রোগীদের ডিনার দেওয়া হয়েছে। টেবিলে রাখা প্লেটের খাবার পল্লব যখন ঘাঁটাঘাঁটি করছে, তখনই শান্তা ঢুকল। বলল, আর একটু দেরি হলেই খাওয়া হয়ে যেত তোমার। ঠিক সময়ে এসে গেছি।
নিজের রান্না মাংসর বাটি খুলে টেবিলের ওপর রেখে শান্তা বলল, ইচ্ছে করে ভাত আনলাম না। পাঁউরুটি, মাংস খারাপ লাগবে না তোমার। পেট ভরে খাও। না খেলে অপারেশনের ধকল সইবে কী করে ?
বাটিভরা মাংসের রং, গন্ধে পল্লব মুগ্ধ। জিভে জল এল তার। মাংসর ঝোলে রুটির টুকরো ডুবিয়ে খুব আগ্রহ নিয়ে খেতে শুরু করল সে। হাসপাতালের ডিনারের থালায় রয়েছে বিফরোস্ট, সেদ্ধ স্প্রাউট আর কাঁচা লেটুসপাতা।
রঞ্জন বলল, ওই খাবারগুলোর ওপর আচার ছড়িয়ে খেলে ভাল লাগবে।

বিফরোস্ট না ছুঁয়ে আচার মাখিয়ে তিন, চারটে সেদ্ধ স্প্রাউট খেয়ে মন্দ লাগল না পল্লবের। চারটের বেশি স্প্রাউট অবশ্য সে খেল না। আচারের গন্ধ পেয়ে জোরে শ্বাস টেনে মোজেস প্রশ্ন করল, ইজ দিস ইণ্ডিয়ান কারি? প্রশ্ন শুনে পল্লব হাসল। রঞ্জন বলল, নো দিস ইজ মিক্সড পিকিলস্। আচার।

পল্লবের হঠাৎ মনে হল, শান্তা, রঞ্জনের আলাপ নেই, এখনই দুজনের পরিচয় হওয়া উচিত।

কিন্তু সে বোবা, দুজন অপরিচিতকে চেনাবে কী করে? শান্তাকে দেখিয়ে রঞ্জনের কাঁধে হাত রেখে কিছু বলতে চাইল পল্লব। ফ্যাঁসফেঁসে কিছু আওয়াজ, গুঞ্জন ছাড়া একটা শব্দ বের হল না পল্লবের গলা থেকে। হঠাৎ সে কাশতে শুরু করল। কাশির দমকে জল এসে গেল তার চোখে। পল্লব যে আলাপ করাতে চাইছে বুঝতে পেরে শান্তা, রঞ্জন নিজেরাই আলাপ করে নিল। লণ্ডনে কে কোথায় থাকে জানার পর দুজনে যখন কলকাতার গল্প শুরু করেছে, পল্লবের তখন খাওয়া শেষ, প্লেট থেকে সে হাত গুটিয়ে নিল। আধবাটি মাংস পড়ে আছে দেখে শান্তা বলল, প্লিজ খেয়ে নাও।

মৃদু হেসে আঙুল দিয়ে পেটে যে আর জায়গা নেই, বুঝিয়ে দিল পল্লব। মাংসর বাটি প্লেট ঝোলায় ঢুকিয়ে শান্তা বলল, আগামী শনিবার আবার আসব।

রঞ্জন কিছু বলল না। হাসপাতালে সে রোজ আসছে। মৃদু হেসে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল রঞ্জন। পল্লব ভাবছিল, শান্তা গাড়ি এনে থাকলে তার সঙ্গে কিছুটা পথ রঞ্জন যেতে পারে। তখনই রঞ্জনকে শান্তা বলল, গোল্ডার্স গ্রীনে যাচ্ছি আমি। ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে যেতে পারেন।

অক্সফোর্ড স্ট্রিট টিউব স্টেশনে আমি নেমে যাব, রঞ্জন বলল।

নির্জন ওয়ার্ড ধরে পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে শান্তা, রঞ্জন। ওয়ার্ডের দরজার কাছে গিয়ে প্রথমে শান্তা, তারপর রঞ্জন পেছন ফিরে পল্লবের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল। পল্লবের মুখেও হাসি, কাকতালীয় এক অনিবার্য তাকে সে যেন দেখতে পাচ্ছে। আইভ্যানের ক্যাসেট প্লেয়ারে পল্লবের চেনা একটা বাংলা গানের সুর বাজছে। বৃষ্টির ফোঁটার মত নানা স্মৃতি ঘটনা গানের সুর থেকে টুপটুপ করে পল্লবের বুকের ওপর ঝরে পড়ছে। ভিজে উঠছে তার বুক। পল্লব দেখল, দুচোখ বুজে গান শুনছে আইভ্যান। তার মুখ

উজ্জ্বল, নিষ্পাপ।

কিছুদিন আগে শান্তার সঙ্গে দেখা হতে রঞ্জনের কথা এবং রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হবার পর শান্তার কথা মনে পড়েছিল পল্লবের। আজ শান্তা, রঞ্জন দু'জনকে একসঙ্গে দেখে অন্যরকম এক নকশা, ছক, সম্ভাবনা পল্লবের মাথায় বিদ্যুতের মত থেকে থেকে চমকে উঠছে। শান্তা, রঞ্জনের কথা পল্লবের মাথায় ঘুরছে। দু'জন হতাশ, ব্যর্থ মানুষ মিলে কি একটা সফলতা তৈরি করতে পারে, পল্লব ভাবল। মহৎ গল্প, উপন্যাসে এরকম কাহিনী অনেক আছে। আসলে এরকম কাহিনীই মহৎ হয়। দু-জন সফল লোকের তৈরি সাফল্যের চেয়ে দুজন ব্যর্থ, হতাশ মানুষের গড়া সাফল্য অনেক বেশি মজবুত, আকর্ষণীয় এবং মানবিক। মরার আগে একটা সফলতার শুরু দেখার প্রত্যাশায় খুশি হল পল্লব।

গতকাল মোজেসের ক্যাথিডার হওয়ার কথা থাকলেও হয় নি। না হওয়ায় মোজেস ক্ষুব্ধ বা বিরক্ত নয়। বরং এক চাপা খুশিতে তার লাল মুখ আরও রক্তাভ দেখাচ্ছে। হিলের সঙ্গে হাত, মুখ নেড়ে কথা বলছে মোজেস। হিলের উদ্যোগেই দুই বৃদ্ধের ভাব হয়ে গেছে। মোজেসের হার্টের ক্যাথিডার হবে শুনে গতকাল সকালে তার সঙ্গে মিটমাট করে নিল হিল। মোজেসের মুখ থেকে ক্যাথিডার করার বিবরণ শোনার জন্যেই তার সঙ্গে হিল হাত মেলাল। অপারেশনের আগে হিলেরও ক্যাথিডার হবে। ক্যাথিডারও ছোটখাট মিনি সার্জারি, অপারেশন থিয়েটার টেবিলে শুইয়ে করা হয়। বেশ যন্ত্রণাদায়ক অপারেশন। অনেকের মুখ থেকে ক্যাথিডার করার কাহিনী শুনেও আরও একবার মোজেসের কাছেও শুনতে চায় হিল। ক্যাথিডারের কথা, অপারেশনের কাহিনী, হিলের ধারণা, বারবার শুনলে নিজের অপারেশনের সময় কষ্ট, যন্ত্রণা তার কম হবে। মোজেসের ক্যাথিডার গতকাল বাতিল হলেও দু-একদিনের মধ্যে হবে।

বিছানার পাশে চেয়ারে মোজেস এসে বসতে সজাগ হল পল্লব। আইভ্যানের রেকর্ডারে নিচু লয়ে বাজনা হচ্ছে। মোজেস বলল, কাল সকালে বাড়ি যাচ্ছি। পরশুদিন আবার হাসপাতালে ফিরব।

অবাক চোখে পল্লব তাকাতে মোজেস বলল, গতকাল ক্যাথিডার না করায় আমার ভাল হয়েছে। মনে হচ্ছে, আমি সেরে গেছি। অপারেশনের দরকার হবে না আর।

মোজেসের এ ধারণার কারণ জানার ইচ্ছে থাকলেও অসম্ভব বুঝে চুপ করে থাকল পল্লব।

কারণ মোজেস নিজেই বলল, কেন মনে হচ্ছে জানি না। বোধহয় হাসপাতালে থাকা, চিকিৎসা, বিশ্রামে সুস্থ হয়ে গেছি আমি। আমার ধারণা সঠিক কিনা, কাল রাতে বুঝতে পারব।

খুশি, উত্তেজনায় বুড়ো মানুষটার ধূসর দু'চোখ ঝকঝক করছে। মোজেস আবার বলল, হ্যাঁ, কাল রাতে জানা যাবে। আমি হীরের ব্যবসায়ী, জহুরি, যাচাই না করে কথা বলি না। আমি সুস্থ, না অসুস্থ কাল রাতে যাচাই করব।

মোজেসের কথার মধ্যে সবুজ ইউনিফর্ম পরা বছর বাইশ বয়স, কুচকুচে কালো রঙ, ঝকঝকে সাদা দু-পাটি দাঁত, রাতের নার্স, লিন্ডা এসে গেল। হৈচৈ করা, আমুদে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান মেয়ে লিন্ডা। তাকে দেখে নিজের বেডের পাশে গিয়ে মিটসেফ খুলে একটা বড়ো চকোলেট বার করল মেজেস। চকোলেট দিল লিন্ডাকে। খুশিতে মোজেসকে জড়িয়ে ধরে তার ডান গালে চুমু খেয়ে লিন্ডা বলল, থ্যাঙ্ক য়ু।

দৃশ্যটা দেখে প্রশান্তিতে ভরে গেল পল্লবের বুক।

পল্লবের বিছানার পাশে এসে মোজেস বলল, টগবগ তেজী ঘোড়ার মত মৃত্যু না হাওয়া পর্যন্ত বাঁচতে হবে। বাঁচার ইচ্ছেকে বাঁচিয়ে রাখাই বড় কাজ।

টেলিভিশন ঘর থেকে বিরক্ত মুখে এসে মোজেসকে হিল বলল, পায়রার মত মেয়েরা এমন বকবক করে যে তাদের সঙ্গে বসে টেলিভিশন দেখা অসম্ভব। কী কথাই যে ওরা বলতে পারে! গল্প করতে হলে মেয়েরা নিজেদের ওয়ার্ডে বসে করতে পারে।

নারীনিন্দা শুনে গম্ভীর হল লিন্ডা। তারপর পল্লবকে বলল, একটা সুখবর আছে, কাল তোমার ক্যাথিডার, সম্ভবত আগামী হপ্তায় অপারেশন হবে।

কথাটা শুনে অবশ, অসাড় হয়ে গেল পল্লবের শরীর, মন, নিজের কানকে সে বিশ্বাস করতে পারছে না। তার চারপাশের পৃথিবী, আকাশ, মাটি, আলো, অন্ধকার আনন্দে দু-হাত ছড়িয়ে শিশুর মত বনবন করে ঘুরছে, এ ঘোরার বিরাম নেই, শেষ নেই। দু-চোখ বুজল পল্লব। আয়েস করে চকোলেট চিবোচ্ছে লিন্ডা। পল্লবের কাঁধে আলতো হাতে চড় মেরে মোজেস বলল; তোমার ভয় কী? অল্প বয়স, এখন তুমি লোহা চিবিয়ে খাবে।

এক মুহূর্ত থেমে মোজেস বলল, অনেক দিন বাঁচবে, তুমি।

পল্লবের ক্যাথিডার হবে শুনে রাগে, বিদ্বেষে হিলের কপাল, মুখ কুঁচকে গেছে। আগুন ছুটছে তার দুচোখে। পল্লবকে শুনিয়ে হিল বলল, ছ-মাস আমাকে ঝুলিয়ে রেখেছে। অপারেশন দূরের কথা, আজ পর্যন্ত ক্যাথিডারও হল না। আর এইসব উটকো বিদেশীরা……।

অভিমানে, আক্রোশে কথা আটকে যেতে উত্তেজনায় ঠকঠক করে কাঁপতে থাকল হিল। খবরটা দেওয়ার অপরাধে আধখানা চকোলেট হাতে শুকনো মুখে লিন্ডা দাঁড়িয়ে আছে। হিলের অজান্তে লিন্ডাও তার ঘৃণার লক্ষ্য হয়ে গেছে। হিলের দু-কাঁধে হাত দিয়ে শান্ত গলায় মোজেস বলল, পৃথিবীর সুখ, আনন্দ সত্তর বছর তুমি ভোগ করছ, আমিও করছি। আমাদের অর্ধেকেরও কম বয়সী এই অসুস্থ ভারতীয় বন্ধুটির এখনও অনেক পাওনা, অনেক কাজ বাকি আছে। ঈশ্বরের দিব্যি, তুমি হিংসে কর না ওকে।

মোজেসের কথায় হিল বোধহয় লজ্জা পেল। কয়েক সেকেন্ড গুম হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের ওয়ার্ডের দিকে চলে গেল সে। কৃতজ্ঞতায় মোজেসের দিকে তাকিয়ে আছে পল্লব। ক্লান্ত দেখাচ্ছে মোজেসকে। পল্লবের দিকে তাকিয়ে মোজেস বলল, আমি জানি বাঁচার আকাঙ্খা বয়স মানে না। বরং বয়সের সঙ্গে আকাঙ্খা, সবরকমের আকাঙ্খা বেড়ে যায়। কমবয়সীদের বাড়ে প্রাণের তাপে, বুড়োদের বাড়ে মৃত্যুর আতঙ্কে। এক সেকেন্ড চুপ থেকে মুচকি হেসে মোজেস বলল, সেজন্যেই বোধহয় কাল বাড়ি যাবার ছুটি নিয়েছি।

মোজেসের সব কথা, এমন কি হিলের অপমানও পল্লবের কানে অনেকক্ষণ ধরে ঢুকছে না। তার মাথার মধ্যে কোলাহল, আনন্দ, সংশয়, দুটো খবর, কাল আমার ক্যাথিডার, এক হপ্তা পরে অপারেশন, সোনালি ঢেউ-এর মত ভেঙে পড়েছে। খবরটা বিশ্বাস করতে রোমাঞ্চে শিউরে উঠছে তার বুক। আশ্চর্য ঘটনা আজও পৃথিবীতে ঘটে! খবরটা লিন্ডাকে ডেকে ভাল করে শোনার ইচ্ছে থাকলেও গলার শত্রুতায় সম্ভব নয়। নিজের কথা সে বোঝাতে পারবে না লিন্ডাকে। কথা বলার জন্য তার ধস্তাধস্তি চেষ্টা দেখে, লিন্ডা ভাবতে পারে, ক্যাথিডার হওয়ার কথায় ভয় পেয়েছে পল্লব। কথাটা ভেবে পল্লব হাসল। লিন্ডাকে ডাকল না। মনে মনে বলল, এই একটা কাজের জন্যে ছ-হাজার মাইল দূরে থেকে আমি এখানে এসেছি। আমার জীবনের আর ছত্রিশ দিন বাকি। আমি ভয় পাব কেন? বরং আমি খুশি,

ভীষণ খুশি। অপারেশনের পর সুস্থ, নীরোগ জীবনের স্বাদ পাব আমি। সুস্থ থাকতে কেমন লাগে, সে অভিজ্ঞতা আমার হবে। আমি ভয় পাব কেন? আসলে তোমাদের দেখায় ভুল হচ্ছে। হয়ত তোমাদের পক্ষে এ ভুল স্বাভাবিক। তোমাদের কাছে অপারেশন করানো কোনও সমস্যা নয়। ফলাফল নিয়ে দুশ্চিন্তা। আমার সমস্যা একেবারে আলাদা, অন্যরকম। অপারেশন করার সুযোগ মিলবে কিনা, এই আমার দুশ্চিন্তা। এই দুশ্চিন্তা, অনিশ্চয়তায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছি আমি। আমার মৃত্যু ভয় নেই। আমি জানি, অপারেশন হলে মরব না, বাঁচব, বেঁচে যাব, বেঁচে থাকব আমি। বাঁচতে আমাকে হবেই। অনেক কাজ বাকি আছে আমার। দুই শিশুসন্তান বুবাই, ফুলিকে মানুষ করতে হবে আমাকে। স্ত্রী অনিতা, আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমি ছাড়া তাদের কেউ নেই। তাদের কাছে ফিরে যেতে হবে আমাকে। কিন্তু ক্যাথিডার করার পর অপারেশন হবে তো? ক্যাথিডারের পরেও অপারেশন বাতিল, বিলম্বিত হয়। বেশিদিন অপেক্ষার সময় আমার নেই। মাত্র ছত্রিশ দিন আমার হাতে আছে। ছত্রিশ দিনের মধ্যে অপারেশন না হলে। নাহ, এসব আমি ভাবতে চাই না। ক্যাথিডার হলে এক হপ্তার মধ্যে অপারেশনও হবে। এটাই নিয়ম। এই বিছানায় শুয়ে, দুএকটা কেস বাদ দিলে, এ নিয়মই আমি দেখেছি। কিন্তু আমার ব্যাপারটা একটু ঘোরাল। আমি এদেশের নাগরিক বা এমিগ্রান্ট নই। আমার কোনও পরিচয়পত্র, দলিল, কাগজ নেই! হাসপাতাল থেকে কাল ঘাড় ধরে আমাকে বার করে দিলে কোনও আইন বাঁচাবে না।

একটার পর একটা চিন্তা আবছা সবুজ আলোয় পল্লবকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলে, আজ বিকেলে কলিন্স ওয়ার্ডে এসেও পল্লবকে দেখেনি। বিছানার পাশ দিয়ে গম্ভীর মুখে কলিন্স চলে যেতে পল্লবের মনে হয়েছিল, তার মত অনাহূত ঘাড়ে পড়া রোগীর অবহেলা ছাড়া আর কিছু পাওনা নেই।

চাকা লাগানো ওষুধের বাক্স নিয়ে রোগীদের ওষুধ দিচ্ছে লিন্ডা। পল্লবকেও দেবে। ক্যাথিডারের জন্যে বাড়তি ওষুধও দিতে পারে। বুকের ধকধক শব্দ, রাত যত বাড়ে, চার পাশ নিস্তব্ধ হয়, তত জোরালো হয়ে ওঠে। পল্লবের মনে হয়, তার বুকের মধ্যে বড় ড্রাম বাজাচ্ছে কেউ। বাঁ পাশ ফিরে শুলে আর রেহাই নেই। ড্রামের বিকট শব্দে কান ফেটে যায়। তুলোর বিছানা দিয়ে হৃদযন্ত্রের লাবডুব লাবডুব শব্দ সোজা কানে এসে ঢোকে। ডান

দিকে ফিরে শুলে শব্দ কমলেও শ্বাসকষ্ট হয়। ছ-টা বালিশে মাথা রেখে পল্লব চিত হয়ে থাকে।

বিছানার পাশে গাড়ি রেখে ফিসফিস করে লিণ্ডা বলল, মেডিসিন।

হাত বাড়িয়ে পল্লব ওষুধ নেওয়ার পর জলের গ্লাস এগিয়ে দিল লিণ্ডা।

মাথায় মনোরম চিন্তা এলে পাশ ফিরে শুতে পল্লব ভালবাসে। ক্যাথিডার, অপারেশন, আরোগ্যের স্বপ্নে মশগুল হয়ে বাঁদিকে ফিরল পল্লব। বুকের মধ্যে ঢাঁড়া পেটার শব্দ সে শুনতে পেল না।

পিঠের ওপর ভারি হাতের স্পর্শে চমকে উঠে পল্লব দেখল, আবছা আলোয় তার সামনে মার্টেলি আর শার্লি দাঁড়িয়ে আছে। পল্লবের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে চোখ মারল মার্টেলি। এক লহমা মার্টেলির দিকে নজর করে পল্লবকে শার্লি বলল, টাকাপয়সা নিয়ে তোমাকে দুশ্চিন্তা করতে মিঃ কলিন্স নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, তোমার অপারেশন হবে।

শার্লির কথায় অভিভূত হয়ে যায় পল্লব। তার দিকে তাকিয়ে মার্টেলি, শার্লি দুজনে হাসছে। ঘরের-হাল্কা সবুজ আলো সবুজ কুয়াশার মত পল্লবের সামনে উড়ছে। এত আনন্দ, সুখ যে জীবনে আছে, পল্লব জানত না। বিকেলে কলিন্সকে ভুল বোঝার জন্যে অনুতাপ হল পল্লবের। কলিন্স যে এমন মহৎ, উদার, সে বুঝতে পারেনি। তার মনে হল, কালো রঙের ঈশ্বর স্মিথের পাশাপাশি সাদা ঈশ্বর কলিন্সও আছেন।

মার্টেলি, শার্লির হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে গিয়ে চোখে জল এসে গেল পল্লবের। তার পিঠে আস্তে চাপড় মেরে মার্টেলি বলল, চিরি-আও ওল্ডবয়।

মার্টেলি, শার্লির পালিশ করা ঝকঝকে দুজোড়া জুতো ওয়ার্ডের দরজার দিকে মিলিয়ে যেতে একবার আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করল পল্লবের। অনেক কষ্টে নিজেকে সে সামলে নিল।

রাত বাড়ে। আনন্দ উত্তেজনায় ঘুম আসছে না পল্লবের। মুখ না দেখেও তার দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, ভয় টের পেয়ে তাকে অভয়বার্তা পাঠিয়েছেন কলিন্স। সবুজ আলোয় সাদা, সবুজ ইউনিফর্ম পরা তিন, চারজন নার্স আলতো, নিঃশব্দ পায়ে ওয়ার্ডে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের হাঁটা যেন নিত্য, পল্লবের মনে হচ্ছে মসৃণ মেঝেতে ব্যালে নাচছে কয়েকজন পরী। ছটা বালিশে মাথা রেখে পল্লব ভাবে, আমি জয়ের কাছাকাছি, জীবনের সেরা বাজি জিততে

চলেছি আমি। গত দু-মাস, তারও বেশি, রোজ মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, ঝরঝরে হয়ে গেছি। এক মুহূর্ত শান্তি, স্বস্তি পাইনি। নিষ্ঠুর অকরুণ জীবনের উদাসীনতার কথা ভেবে ভয় পেয়ে দু'মাস পরের কথা চিন্তায় আনতে চাইনি। তেইশে মার্চ, মঙ্গলবার, জীবনের শেষ দিন হিসেবে দেগে রেখেছি। আর আমার ভয় নেই। এখন আমার মুঠোর মধ্যে আমার অভীষ্ট।

আরাম, স্বস্তিতে পাশ ফিরে শুলো পল্লব। আজ যদি ঘুম না আসে, সে ঘুমোবার চেষ্টা করবে না। ঘুমের ওষুধের ঘোর, নেশা মাথায় নিয়ে জেগে জেগে স্বপ্ন দেখবে। এরকম রাত জীবনে খুব কম আসে।

টেলিভিশন রুম থেকে ফুটবল খেলা দেখে পা টিপে ওয়ার্ডে ঢুকল মোজেস। ড্রেসিং গাউন ছেড়ে চোখ বুজে প্রার্থনা করার ভঙ্গীতে স্থির হয়ে দাঁড়াল। মোজেস কী প্রার্থনা করছে, জানতে ইচ্ছে হল পল্লবের। প্রার্থনা শেষ করে মোজেস বিছানায় শুয়ে পড়ল। জেগে থাকার কথা ভেবেও ওয়ার্ডের সকলে ঘুমিয়ে পড়তে পল্লবের অস্বস্তি হচ্ছে। পাশে আইভ্যান, উল্টোদিকে সাবেনি ঘুমোচ্ছে। ওয়ার্ডের মধ্যে ঘুমন্ত মানুষের নিঃশ্বাসের ধীর, গভীর উঁচুনিচু শব্দ, শুধু পল্লব জেগে আছে। জেগে থাকলেও আজ তার কোনও কষ্ট উদ্বেগ নেই। সে ভাবছে, সেরে উঠে আমি কী করব? অনেকদিন পর ভবিষ্যৎ ভাবার ছাড়পত্র পেয়ে তার কল্পনার ঘোড়া লাগামহীন ছুটে চলল।

বাড়ির কথা, কলকাতার কথা ভাবতেই পল্লবের মনে হল, নীল আকাশ, ঝলমলে রোদে শীতের কলকাতা এখন তুলনাহীন। ফেব্রুয়ারির দুপুরে ময়দানের সবুজ ঘাসের ওপর শুয়ে থাকার, নানা সুখী মুহূর্ত তার স্মৃতিতে জেগে উঠল। অনিতা আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে এই শীতে তার বোটানিকাল গার্ডেন, পরেশনাথের মন্দির, চিড়িয়াখানা ঘোরার কথা ছিল। সবুজ অন্ধকারে পল্লব দেখল বুবাই-এর মুখ। রোজ ভোরে ঘুম থেকে পল্লবকে জাগাত বুবাই। ঘুম ভেঙে গেলে পল্লব দেখত, তার মাথার কাছে সকালের খবরের কাগজ বুবাই আগেই রেখে গেছে। রোজ সকালে বাবার সঙ্গে বাড়ির কাছে পার্কে বেড়াতে যাবার জন্যে অপেক্ষা করত বুবাই। পল্লব কোনদিন

যেত, কোনদিন যেত না। পল্লব না গেলে ম্লান হত বুবাই। বাবার চোখের সামনে আর থাকত না। সকালের খবরের কাগজ পেলে পল্লব গোঁতো বনে যেত, বেরতে চাইত না আর। বুবাই বলত, কত লোক পার্কে বসে কাগজ পড়ে, তুমিও কাগজ নিয়ে চল।

ছেলের আবদারে কান দিত না পল্লব। কিন্তু একদিন না গেলে পরের দিন রেহাই ছিল না। ছেলের ওপর বেশ কয়েকবার নিষ্ঠুর হয়েছে পল্লব। ঘটনাগুলো মনে পড়তে টনটন করছে পল্লবের বুক।

শিশু থেকেই পল্লবের ন্যাওটা হয়েছে বুবাই। অফিসে বেরবার আগে পর্যন্ত তার পায়ে পায়ে জড়িয়ে থাকত ছেলেটা। বুবাই যখন দু-তিন বছরের শিশু তখন মাঝে মাঝে হঠাৎ দৌড়ে এসে পল্লবের গালে চুমু খেত। দিনে এরকম পাঁচ, সাতবার হত। তার চুমু খাওয়ার ঠেলায় অস্থির হয়ে উঠত পল্লব। বারণ করলেও শিশু বুবাই শুনত না। বুবাই চুমু খেলে তার মুখে হালকা, মিষ্টি একটা গন্ধ পেত পল্লব। বয়স বাড়তে বুবাই-এর মুখ থেকে সে সুগন্ধ চলে গেছে। দেড় বছরের ফুলির মুখে এখন সে সুবাস পল্লব পায়। গত দু-মাসে ফুলিকে কেমন দেখতে হয়েছে কে জানে! তার মাথার ঘন, কালো চুল নিশ্চয় আরও লম্বা হয়েছে। আটটা দাঁতের ফোকলা মুখে আরও কয়েকটা নতুন দাঁত গজিয়েছে।

সবুজ আলোয় অসুস্থ পল্লবকে দুই সন্তান হাজার চোখে ঘিরে রাখে। পল্লব অসুস্থ, শয্যাশায়ী হওয়ার পর পার্কে বেড়াতে যাবার জন্যে তাকে আর জোর করত না বুবাই। শরীরে একটু জোর পেলে ছেলেকে নিয়ে তখন পল্লব নিজেই যেতে চাইত। বুবাই যেত না। বলত, স্কুলের হোমটাস্ক্ করতে হবে আমাকে।

পার্কে বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্যে অনিতা ডাকলে বুবাই সোজা বলে দিত, তোমার সঙ্গে যাব না।

অসুস্থ বাবার জন্যে সকালে পার্কে বেড়াতে যাবার কথাটাই বুবাই ভুলে গেল একদিন।

দুটো বাচ্চার সঙ্গে পল্লবের মনে পড়ল অনিতার মুখ। বেচারি অনিতা! অনিতার কথা ভাবলেই পল্লবের অপরাধী লাগে নিজেকে। অনিতার মত সুশ্রী, শিক্ষিতা, গুণী মেয়ের জীবন বরবাদ করে দিয়েছে সে। কত ভাল বিয়ে হত অনিতার! সুখে, সম্পদে ভরপুর, তৃপ্ত থাকতে পারত সে। তার

বদলে অসুস্থ, আধমরা পল্লবকে বিয়ে করে তার দুর্ভোগ, হেনস্তার শেষ নেই। পল্লবের একটাই সান্ত্বনা, রোগের কথা গোপন করে সে ঠকায়নি অনিতাকে। বরং নিজের অসুস্থতার কথা অনিতাকে বিশদ জানিয়ে ছাত্রজীবনের ঘনিষ্ঠতায় পল্লব ছেদ টানতে চেয়েছিল। অনিতা রাজী হয়নি। বাইশ বছর বয়সের জেদ, সাহস তাকে যমের গলায় মালা দিতে প্ররোচনা দিয়েছিল।
হেমন্তের সেই সন্ধ্যার ঘটনা পল্লবের মনে পড়ছে। তোলা উনুনের ধোঁয়া আর কুয়াশায় কলকাতার রাস্তায় তখন সন্ধ্যে নেমেছে। অফিস, কাছারি ছুটি হতে পিলপিল করে বাড়ি ফিরছে মানুষ। ট্রাম, বাস, মানুষ ধোঁয়ার হিজিবিজি জটের মধ্যে দিয়ে কলেজ স্ট্রিট ধরে পল্লব, অনিতা পাশাপাশি চুপচাপ হাঁটছিল। ফিকে অন্ধকারে রোগা, শ্যামলা চেহারা, ধারালো নাক, তীক্ষ্ন চিবুক, লম্বা মোটা বিনুনি অনিতাকে একটা ধূসর রেখার মত দেখাচ্ছিল। গভীর চিন্তায় ডুবে থাকলে মানুষকে বোধহয় একটু আবছা দেখায়। একটু আগে ডাক্তার রায়ের চেম্বার থেকে বেরিয়েছে ওরা দু-জন। ডাক্তার রায়ের পুরনো রোগী পল্লব। পল্লবের শরীরের সঙ্গে তার পরিবারের অনেক খুঁটিনাটি খবর ডাক্তার রায় রাখতেন। একদিন কথার ফাঁকে অনিতার সম্পর্কে ডাক্তারকে বলেছিল পল্লব। অনিতাকে পল্লব বিয়ে করতে চায় শুনে গম্ভীর হয়ে ডাক্তার বলেছিলেন, তোমার বিয়ে করা উচিত নয়।
এ নির্মম সত্য জানা থাকলেও ডাক্তারের কথায় কেঁপে উঠেছিল পল্লব। বলেছিল, আমি যে তাকে ভালবাসি।
করুণায় প্রসন্ন হয়েছিল ডাক্তারের মুখ। নরম গলায় ডাক্তার বলেছিলেন, ভালবাস বলেই তাকে বিয়ে করা উচিত নয় তোমার।
কেন?
তোমার জীবনের কোনও স্থিরতা নেই।
ডাক্তারের কথা শুনে চুপ হয়ে গিয়েছিল পল্লব।
তার মুখ দেখে ডাক্তারের মমতা হয়েছিল। ডাক্তার বলেছিলেন তোমার বান্ধবীকে নিয়ে একদিন আমার কাছে এস। তাকে বুঝিয়ে বলে দেব আমি। ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করেই সেদিন তাঁর চেম্বারে অনিতাকে হাজির করেছিল পল্লব। ডাক্তারের সঙ্গে রোগী দেখার ঘরে অনিতা যখন কথা বলছে, বাইরে বসার ঘরে তখন একবুক শূন্যতা, হাহাকার নিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছিল পল্লব। পল্লব জানত অনিতাকে ডাক্তার কি বলবেন।

তাই ডাক্তার ভেতরে ডাকলেও পল্লব যায়নি। বসার ঘরে থেকে গিয়েছিল। প্রায় মিনিট দশ পরে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে শান্ত, স্বাভাবিক মুখে বেরিয়ে এল অনিতা। সামান্য দুশ্চিন্তায় তার মুখ যে ঈষৎ গম্ভীর পল্লব ছাড়া কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না। শাড়ি ঠিকঠাক করে, ব্যাগ হাতে অনিতা এসে দাঁড়াল পল্লবের পাশে। রোগী দেখার ঘরের দরজা খুলে ডাক্তারও বেরিয়ে এসেছেন। পল্লবের বুকের মধ্যে ডুকরে ওঠা কান্নার ধ্বনি, এই শেষ, আর দেখা হবে না অনিতার সঙ্গে। অনিতার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছিল না পল্লব। অনিতাকে ঠকাতে না চাইলেও তাকে যে হারাতে হবে, পল্লব কখনও ভাবেনি। পল্লবের মনে হল তার বুকের মধ্যে রক্ত ঝরছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে বুক। স্বার্থপরের মত সে শব্দহীন মিনতি করল, ডাক্তারের কথা তুমি বিশ্বাস করো না অনিতা। আমি অনেকদিন বাঁচব। আবেগে, স্নেহে জ্বলজ্বল করছিল ডাক্তারের মুখ। অনিতার দিকে আঙুল তুলে পল্লবকে ডাক্তার বলল, শি ইজ এক্সট্রা-অর্ডিনারি, গ্রেট, এমন মেয়ে কখনও আমি দেখিনি।

ডাক্তারের গলায় বিস্ময়, মুগ্ধতা চলকে উঠেছিল। কী ঘটেছে, ঘটছে, বুঝতে পারল না পল্লব। কিন্তু তার মনে হল, ঘটনার হাওয়া তার দিকে। ডাক্তার বললেন, পল্লব তুমি ভাগ্যবান।

সাহস করে অনিতার দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছিল পল্লব।

ডাক্তার বলল, তোমার শরীর, অসুস্থতা, অনিশ্চিত জীবন, যা যা বলার ছিল, অনিতাকে বলেছি। সব শুনে তোমার হবু স্ত্রী, হ্যাঁ আমি স্ত্রী বলছি, বলল, পল্লবের হাতের আয়ুরেখা দেখে ওর সঙ্গে আমি মিশিনি। চিরকাল কেউ বাঁচে না, পল্লব হয়ত অন্যদের একটু আগে মারা যাবে। সেরকম কিছু ঘটলে মেনে নেব।

অনিতার কথাগুলো পল্লবকে শুনিয়ে ডাক্তার নিজেও বেশ উদ্বেল হচ্ছিলেন। ডাক্তার বললেন, অনিতা বলল, একজন সুস্থ সবল মানুষকে আমি বিয়ে করার পর সে যদি হঠাৎ মারা যায় ?

ঠিক কথা। এরকম হতেই পারে।

এক মুহূর্ত থেমে ডাক্তার আবার বললেন, অনিতার সব চেয়ে দামী কথা, ও প্রশ্ন করল, বিকেলে বৃষ্টি হবে জেনে একজন মানুষ কি সকালে কাজে যাবে না ? সারাদিন বাড়িতে বসে থাকবে ?

পল্লবের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার বলেছিল, আমার আর কিছু বলার নেই। আমার বিশ্বাস, বিয়ের পর অনিতা নতুন পরমায়ু দেবে তোমাকে।

মুখের সামনে প্রশংসা শুনে লজ্জায়, সংকোচে লাল, কিছু বলতে গিয়ে চুপ করে গেল অনিতা। চেম্বারের দরজা পর্যন্ত দু-জনকে এগিয়ে দিয়ে ডাক্তার বললেন, আমার বাবা বলতেন আয়ু আর পরমায়ুতে অনেক তফাত। আয়ু মানে নিছক বেঁচে থাকা। আয়ুর সঙ্গে সুখ শান্তি, ভালবাসা মিশে হয় পরমায়ু। পরমায়ু চাই, আয়ু নয়।

আধো অন্ধকার, ভিড় রাস্তায় পাশাপাশি, একই চিন্তা, পরমায়ু, জীবন এবং আরও নানা কথা মাথায় ঘুরলেও দু-জনেই চুপচাপ ছিল। একটু এগিয়ে মেডিকেল কলেজের লালবাড়ি, গেটের কাছে এমার্জেন্সিতে ভিড়, জটলা সারাক্ষণ থাকলেও একটু ভেতরে গেলে বেশ নির্জন, ফাঁকা ট্রপিকাল মেডিসিনের পাশের মাঠে ঘাসের ওপর দু-জন বসল। নিয়নের মৃদু আলো লেগে চকচক করছে সবুজ ঘাসের ডগা। কপালের ঘাম মুছে একটা সিগারেট ধরাল পল্লব। হাসপাতালের রাস্তায় হেডলাইট জেলে একটা ট্যাক্সি যেতে মুহূর্তের আলোয় অনিতার মুখ স্পষ্ট দেখল পল্লব। চোখে আলো পড়তে চোখ বুজেছিল অনিতা। আলোর জোরালো ঝলকের পর মাঠে হঠাৎ ঘন হয়েছিল অন্ধকার। অনিতা প্রশ্ন করল, ভয় পেয়েছ ?

কেন ?

তুমি ভেবেছিলে, ডাক্তার রায়ের পরামর্শ শুনে আমি হয়ত সিদ্ধান্ত বদলাব। অনিতার কাছে ধরা পড়ে গিয়ে চমকে উঠেছিল পল্লব। অন্ধকারে চিকচিক করছে অনিতার দু-চোখ।

তুমি এটা ভাবলে কী করে ?

প্রশ্ন শুনে অনিতার হাত ধরেছিল পল্লব। কিছু সময় চুপ থেকে পল্লব প্রশ্ন করেছিল, অনুতাপ করবে না তো পরে ?

পরে কি হবে জানি না। অনুতাপ যদি করি, অন্য কারণে করব, বিয়ে করার জন্যে নয়।

ওয়ার্ডের দেওয়াল ঘড়িতে দুটো বাজল। রাত গড়িয়ে চলেছে। আজ আর ঘুম হবে না পল্লবের। ঘুমোতে সে চায়ও না। অনেকদিন অনিতার কথা, বিয়ের আগের জীবনের সুখে, শোকে বিজড়িত স্মৃতিগুলো নিয়ে পল্লব ভাবেনি। দু-হাজার মাইল দূরে, হাসপাতালের বিছানায়, বহু বছর

পরে সেই সব দিন, রাত্রি মানুষ উঠে এসেছে। ছ-টা বালিশে মাথা রেখে, চোখ বুজে বিছানায় পড়ে আছে পল্লব। কাল ক্যাথিড্রার আর একটু ঘুম হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ঘুম না এলে কী করবে পল্লব। বিছানায় উঠে বসে এক গ্লাস জল খেল সে। নিঃশব্দে হেঁটে এসে নরম গলায় লিণ্ডা প্রশ্ন করল, এনি ট্রাবল, মাই লাভ? ঘুম হচ্ছে না?

পল্লব একটা অর্থহীন শব্দ করল। পল্লবের মাথার বালিশগুলো একটু অন্যভাবে নিপুণ হাতে সাজিয়ে দিয়ে লিণ্ডা বলল, এবার হবে।

পল্লব শুতে তার গলা পর্যন্ত কম্বল টেনে, কপালে ছড়ানো এলোমেলো চুল নরম হাতে গুছিয়ে দিল লিণ্ডা। বলল, স্লিপ ওয়েল, মাই লাভ।

ভোর পাঁচটায় ওয়ার্ডের সব আলো যখন জ্বলল, পল্লব তন্দ্রায় ডুবে আছে। এই তন্দ্রাচ্ছন্নতাই এখন পল্লবের ঘুম। জেগে নয়, ঘুমিয়ে নয়, রাতের এই তন্দ্রায় ডুবে বেঁচে আছে পল্লব। টেম্পারেচার নেওয়ার জন্যে পল্লবের মুখে থার্মোমিটার রেখে লিণ্ডা বলল, কিছু খাবে না, জলও নয়।

সূর্য ওঠা বন্ধ হতে, দুপুরে দু-তিন ঘণ্টা ছাড়া, ঘরের আলোগুলো এখন সারাদিন জ্বলে। শুধু বাড়িঘর নয়, আজকাল রাস্তাঘাটও মেঘ, কুয়াশায় সারাদিন অন্ধকার। জাতীয় মোটর সড়কগুলোতে এসময়ে আলো নেভানো হয় না। বাড়ি যাবার পুলকে আজ তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙেছে মোজেসের। এই সাতসকালে ক্ষুর হাতে দাড়ি কামাতে বসেছে সে। গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা একটা সাদা আলখাল্লা পল্লবকে দিয়ে লিণ্ডা বলল, এটা পরে নাও।

পল্লবের বেডের তিন পাশের ভারি পর্দা লিণ্ডা টেনে দিতে, একটা ঘর হয়ে গেল। আলাদা করতে সব বেডেই এরকম পর্দার ব্যবস্থা আছে। রাতের ডিউটি শেষ করে যাবার আগে লিণ্ডা এখন খুব ব্যস্ত। পর্দা ঢাকা ঘরে রাত-পোশাক ছেড়ে আলখাল্লা পড়ল পল্লব। আধঘণ্টা পরে একটা ছাপানো ফর্ম হাতে পর্দা সরিয়ে হাউস সার্জেন ডাঃ ব্যারেট ভেতরে এসে দাঁড়াল। পল্লবের প্রায় সমবয়সী ব্যারেট গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। বিছানার পাশে টেবিলের ওপর ফর্মটা রেখে ব্যারেট বলল, সই করো।

পল্লব সই করল। ফর্মে লেখা, অপারেশনের সময় কোনও দুর্ঘটনা আমার মৃত্যু ঘটলে, কেউ দায়ী নয়।

সাদা অ্যাপ্রনের পকেটে সই করা ফর্মটা রেখে পল্লবকে অ্যাট্রোপিন ইঞ্জেকশন দিল ব্যারেট। অপারেশনের রোগীকে অ্যানেসথেসিয়ার বেঁহুশ করার পর্ব

অ্যাট্রোপিন ইঞ্জেকশন দিয়ে শুরু হয়। শরীরে অ্যাট্রোপিন ঢুকে স্নায়ু, শিরা, আচ্ছন্ন করে, ঘোর লাগে মাথায়। আদুল শরীরে আলখাল্লা জড়িয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর পল্লব টের পেল ঘরের আলো ম্লান, কথা, শব্দ মিহি হয়ে যাচ্ছে। পল্লব হিসেব করল, আজ থেকে পঁয়ত্রিশ দিন একমাস পাঁচদিন পরে তেইশে মার্চ, মঙ্গলবার, নব্বই দিন শেষ হবে। তার আগেই আমার অপারেশন নিশ্চয় হয়ে যাবে। তারপর? যদি বেঁচে থাকি বাঁচবই, তখন কী করব? অপারেশনের পর কতদিন শুয়ে থাকতে হবে? কলকাতায় ফিরব কবে?

অ্যাট্রোপিনে আচ্ছন্ন পল্লব এক, দুই করে জরুরী কাজের একটা ফন্দি বানাতে থাকে। পর্দা ফাঁক করে মুখ গলিয়ে মোজেস বলল, অল দ্য বেস্ট বাড়ি যাচ্ছি। কাল দেখা হবে।

ওষুধের ঝিমুনির মধ্যেও মোজেসের ভারি পায়ের জুতোর শব্দ শুনল পল্লব। অনুগত ঝর্নার স্রোতের মত ভারহীন সময় মসৃণ বয়ে যাচ্ছে। শরীরে কোনও কষ্ট ক্লান্তি গ্লানি পল্লব অনুভব করছে না। ট্রলির শব্দ, কাঁচের বাসনের আওয়াজ শুনে পর্দার আড়াল থেকে পল্লব বুঝল, দুপুর বারটা খাবার এসেছে। পর্দার ঘরে, চোখের সামনে বাইরের পৃথিবী ছোট হয়ে গেলেও এক বড় পৃথিবী তার মাথায় ঢুকে পড়েছে। যা দেখা যায় এবং যা যা না, সব দেখতে পাচ্ছে সে। প্রথমে পায়ের কাছের পর্দা, তারপর দুপাশে পর্দা নড়ে উঠে সরে গেল। সাদা পোশাক, সাদা টুপি পরা দু-জন লোক চাব লাগানো একটা ট্রলি বিছানা ঠেলে পল্লবের বিছানার সঙ্গে জুড়ে দিল তারপর পল্লবের বিছানার চাদর সমেত তাকে ট্রলি বিছানায় তুলে নিল বাহকেরা। ট্রলিতে তোলার আগে তার শরীর থেকে কম্বল সরিয়ে দিয়েছিল একজন। ট্রলির লাল, নরম কম্বলে সে ঢেকে দিল পল্লবকে। দুচোখের ভারী পাতা খুলতেই পল্লব নজর করল, ওয়ার্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে হিল টিকটিকির মত গোল্লাপাকানো চোখে লোকটা তাকে দেখছে। লিফট চেপে একতলার নিচে বেসমেণ্টে এল ট্রলি বিছানা। বেসমেণ্টে অপারেশ থিয়েটার। থিয়েটারের মাঝখানে অপারেশন টেবিলের ওপরে জ্বলছে গন-গনে আলো, কয়েকটা স্পটলাইট। সাদা অ্যাপ্রন, মুখোশ, টুপি, হাতমোজা পরা দুজন ডাক্তার, তিন নার্স টেবিল ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। দুই চালক ট্রলি থেকে তুলে অপারেশন টেবিলে শোয়াল পল্লবকে। পল্লবের ডান হাতে

কনুই-এর ওপরে একটা ইঞ্জেকশন্ দিল একজন নার্স।
কোথায় পড় তুমি, এক ডাক্তার প্রশ্ন করল পল্লবকে।
এদেশে কতদিন আছ, প্রশ্ন করল দ্বিতীয় ডাক্তার।
কনুই-এর উল্টোদিকে, ওপরের নরম জায়গায়, যেখানে নার্স ইঞ্জেক্শন ফুঁড়ল, ধারাল ছুরির স্পর্শ পেল পল্লব। মাংস কাটছে বুঝলেও যন্ত্রণা বোধ করল না সে। ক্যাথিডার, পল্লব শুনেছে মামুলি অপারেশন, পুরো অ্যানেসথেসিয়ার দরকার হয় না। বাইসেপস্ এর তলায় অপারেশনের জায়গাটা অসাড় করে মাংস কেটে, শিরা ফুঁড়ে, শিরার ভেতর দিয়ে ছুঁচের মত সরু স্টিলের একটা টিউব ধীরে ধীরে ঠেলে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত ঢোকানো হয় হৃৎপিণ্ডের ফ্লুইড, তরল পদার্থ, পরীক্ষার জন্যে টিউবে সংগ্রহ করা হয়। এই ফ্লুইড পরীক্ষাই হৃৎপিণ্ডের অসুস্থতা নির্ণয়ের সবচেয়ে নির্ভর-যোগ্য উপায়।
শিরা ভেদ করে ছুঁচের মত সরু, লম্বা হিলহিলে টিউব কাঁধের দিকে এগতেই তীব্র যন্ত্রণা শুরু হল। লোকাল অ্যানেসথেসিয়ায় পল্লবের কনুই থেকে কাঁধের তলা পর্যন্ত অসাড় হয়েছিল। অসাড় অংশ পেরিয়ে টিউব এগতেই শুরু হল অমানুষিক যন্ত্রণা। সে বুঝতে পারল, একজন ডাক্তার হালকা চাপে খুব ধীরে ধীরে টিউবটা ঢোকাচ্ছে। টিউব যত এগচ্ছে, শরীরের প্রতিটা কোষ ব্যথায় ফেটে পড়ছে। অসহ্য কষ্টে গোঙাতে গিয়েও পল্লব দাঁত টিপে শুয়ে থাকল। বুকে ভর দিয়ে সে শুয়ে আছে। তার দুটো পা, মাথা ধরে আছে দু-জন নার্স। দুই ডাক্তারকে সাহায্য করছে তৃতীয় জন।
আর য়ু অলরাইট?
কেউ একজন প্রশ্ন করল।
পল্লব চুপ। একটা শিরার বিষব্যথায় শরীরের সব শিরা, স্নায়ু ছিঁড়ে খুঁড়ে, তছনছ হয়ে যাচ্ছে। তার মনে হচ্ছে একটা জ্বলন্ত আগুনের সাপ শিরার মধ্যে তীব্র, তীক্ষ্ন ছোবল দিতে দিতে হৃৎপিণ্ডের দিকে এগচ্ছে। ফুল-ঝুরি জ্বলছে মাথায়। আগুনের ফুলকি মাথার কোষে কোষে ঝরে পড়ছে। কুলকুল করে ঘাম ছুটছে পল্লবের। এখনই গোটা শরীর প্রচণ্ড বিস্ফোরণে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। হৃৎপিণ্ডে পেঁছে সেই টিউব কয়েকবার পাক খেল। যন্ত্রণায় হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে।

নিচু গলায় দুই ডাক্তার, নার্স কথা বলছে।

কষ্ট হচ্ছে, প্রশ্ন করল কেউ।

চোখ বুজে, মুখ থুবড়ে গোঙানি সামলাচ্ছে পল্লব।

জলি গুড্ বলল একজন।

ক্যাথিডার শেষ করে পল্লবকে ওয়ার্ডে তার বিছানায় যখন পাঠানো হল, তার মাথার মধ্যে তখন আগুনের ফোয়ারা ছুটছে। হাতে অসম্ভব ব্যথা, শরীর জুড়ে যন্ত্রণা, সীমাহীন ক্লান্তি। সারারাত সে ঘুমোতে পারল না।

পাঁচ দিন পরে হাতের সেলাই শুকোতে, ব্যথাও কমে গেল। রোজ একটা দুটো ই সি জি, এক্সরে, রক্তপরীক্ষা হচ্ছে। হাসপাতালে ভর্তির পর পল্লবের গলা থেকে ফ্যাঁসফেঁসে, ভাঙা যে আওয়াজ এতদিন বেরুচ্ছিল, ক্যাথিডারের পর তাও বন্ধ হয়ে গেছে। এখন সে ষোল আনা বোবা, মূক। পরপর তিনদিন সকালে তার থুথু, সোয়াব্ পরীক্ষার জন্যে নেওয়া হয়েছে। বুকের সঙ্গে গলার চিকিৎসা চলছে। গরম জলের কুলি করছে রোজ তিনবার। মুখে কিছু না বললেও তার গলার অবস্থা দেখে মার্টেলি, ব্যারেট যে খুশি নয়, বুঝতে পারছে পল্লব। আবার এক অশুভ সম্ভাবনা, দুশ্চিন্তা ভর করছে তাকে।

পল্লবের দুটো সিট পরে একজন নতুন রোগী, নাম পিটার হপ্‌কিন্স, ওয়েলস-এর বাসিন্দা, চারদিন হল এসেছে। গোল, ভারি মুখ, চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা, ব্যাকব্রাশ চুল, চমৎকার স্বাস্থ্য, হপ্‌কিন্সকে দেখতে অনেকটা হেন্‌রি কিসিঞ্জারের মত। হপ্‌কিন্স্ পড়ুয়া, সারাদিন পড়ে। তার পড়ার বিষয় হল মৌমাছি। বিকেল হলেই আত্মীয়স্বজনের জন্যে হপ্‌কিন্স্ ছটফট করে। আত্মীয় মানে তার বৌ, মেয়ে। দু-জন রোজ আসে। হপ্‌কিন্সের স্বজন হল, ষাট হাজার পোষা মৌমাছি। তারা হাসপাতালে আসতে পারে না। এই ষাট হাজার মৌমাছির জন্যেই মধু ব্যবসায়ী হপ্‌কিন্স্ দুর্ভাবনায় আছে। তার মুখে ষাট হাজার মৌমাছির কথা শুনে পল্লব ভেবেছে, মৌমাছির হিসেব হপ্‌কিন্স্ রাখে কী করে? ষাট হাজার মৌমাছি রোজ কি গুনে গেঁথে নিতে পারে ও?

বিকেলে বৌ মেয়ে আসতেই মৌমাছিদের খবর শুনে মুখ কালো হয়ে গেল

হপ্‌কিন্সের। আজ দুটো মৌমাছি মারা গেছে। হপ্‌কিন্সের হার্টে বাইপাস্ সার্জারি হবে। পা থেকে একটা শিরা কেটে জুড়ে দেওয়া হবে হৃৎপিণ্ডে। পল্লবের ক্যাথিডার হওয়ার আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে মোজেসের ক্যাথিডার হয়েছে। এক রাত বাড়িতে কাটিয়ে মোজেস বুঝেছে, অপারেশন ছাড়া উপায় নেই। বিকেল পাঁচটায় জয়া, টুকাইকে নিয়ে বিনয় এল হাসপাতালে। আজ নিয়ে পল্লবকে দ্বিতীয়বার দেখতে এল ওরা। খুব হাসিখুশি দেখাচ্ছে জয়াকে। বিনয় সহজভাবে কথা বলছে। গলার জন্যে ডাক্তার সমীর মজুমদারের কথা ইচ্ছে থাকলেও জিজ্ঞেস করতে পারল না পল্লব।

জয়া বলল, একটা দারুণ খবর আছে। আমি ড্রাইভিং পাস করেছি, লাইসেন্স পেয়েছি এবং একটা গাড়ি কিনেছি। যাতায়াতের অসুবিধে এতদিনে ঘুচল। এখানেও গাড়ি নিয়ে এসেছি। এখন থেকে তোমাকে প্রায়ই দেখতে অসা হবে।

ইউস্টন স্ট্রিটের ভারতীয় দোকান থেকে আনা গরম সিঙাড়া, চানাচুর প্লেটে সাজিয়ে পল্লবের সামনে রেখে জয়া বলল খাও।

প্লেট থেকে একটা সিঙাড়া তুলে টুকাই-এর দিকে এগিয়ে ধরল পল্লব।

জয়া বলল, ও এসব খায় না।

সিঙাড়ায় কামড় দিল পল্লব। কলকাতার মত না হলেও অল্প বিস্তর সিঙাড়ার স্বাদ পেল সে। তার গলার হাল দেখে বিনয়, জয়া ঘাবড়ে গেছে। বিনয় প্রশ্ন করল, গলাটা একদম বুজে গেল কেন ?

প্রশ্ন করেই বিনয় বুঝেছে যে, যার কথা বলার ক্ষমতা নেই, তাকে প্রশ্ন করা বোকামি।

জবাব দিল বিনয় নিজে। বলল, হাসপাতালে ভর্তির আগেই জোর ঠাণ্ডা লেগেছে।

ঠাণ্ডা লেগেই যে গলা বুজে গেছে পল্লবও তা জানে। হাইডপার্কের সেই সন্ধ্যেতে যে তার বাক্‌শক্তি মরে গেছে, একথা পল্লব ভুলে যেতে চায়। ভুলেও গেছে। সুন্দরলালের অসম্মান হয়, এমন কথা সে কখনও বলতে পারবে না। একগোছা হলুদ ফুল নিয়ে রঞ্জন আসার পাঁচ মিনিট পরে সপরিবারে এল সুন্দরলাল।

গেট ওয়েল, ভাল হয়ে ওঠ, লেখা একটা চমৎকার কার্ড মুমু দিল পল্লবকে।

কার্ডে স্বহস্তে গোটা গোটা হরফে, ওপরে পল্লবের নিচে নিজের নাম লিখেছে মমু। সকলের শেষে, একটা ফরাসি শেখার বই, ইংলিশ টু ফ্রেঞ্চ হাতে এল শান্তা। পল্লবের বালিশের কাছে বইটা রেখে শান্তা বলল, ইংরেজীতে ফরাসি লেখার এটা সেরা বই। কারও সাহায্য ছাড়াই এ বই পড়ে ফরাসি শেখা যায়। একটু চেষ্টা করলে তুমিও শিখে যাবে। দরকার হলে আমি তো আছি।

কথাটা বলে খুব মিষ্টি করে হাসল শান্তা। সে যে ফরাসি ভাষা শিখেছে, পল্লবের বুঝতে অসুবিধে হল না।

শান্তার কথায় সায় দিয়ে রঞ্জন বলল, সময় কাটাতে, বিশেষ করে হাসপাতালে, ভাষা শেখার চেয়ে ভাল কাজ আর নেই।

শান্তার দিকে তাকিয়ে পল্লব হাসল। খুশি, লজ্জায় একটু নড়ে চড়ে দাঁড়াল শান্তা। বিছানা ঘিরে এত বন্ধু, চেনা মানুষ দেখে পল্লবের বুক ভরে উঠেছে। বন্ধ জানালার বাইরে মেঘলা আকাশের দিকে তাকিয়ে সাবেনি একা শুয়ে আছে। প্লেটে একজোড়া স্যান্ডউইচ নিয়ে পল্লবের বিছানার পাশে এসে মোজেসের বউ বলল, খাও।

সুন্দরী মহিলার মুখে, বিষন্ন দু-চোখে হাসি ছড়িয়ে আছে। পল্লব থ্যাঙ্ক য়ু, বলতে চাইল, পারল না। প্লেট নিয়ে দুটো স্যান্ডউইচ ধীরে ধীরে খেল পল্লব। জননীর মত দাঁড়িয়ে মিসেস মোজেস। সুখ, তৃপ্তি ছড়িয়ে গেল তার মুখে।

হপ্‌কিন্সের বিছানার একপাশে বসেছে তার বউ, আর একপাশে তার কুড়ি-একুশ বছরের রূপসী মেয়ে। রূপসী মানে একেবারে ডানা কাটা পরী। কাঁচা, সুন্দর মুখ, টানা টানা গভীর চোখ, বালি রঙ চুল, ছাল ছাড়ানো কলাগাছের চকচকে থোড়ের মত গলা, লাল পাতলা ঠোঁট, স্থির বিদ্যুতের মত মেয়েটা হপ্‌কিন্সের কাঁধে চিবুক রেখে বাবা, মা-র গল্প শুনছে। নিজেও দু-একটা কথা বলছে। হপ্‌কিন্সের স্ত্রীর বয়স চুয়াল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ। মুখ দেখে আরও কম মনে হয়। স্বামীর দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে আছে মিসেস হপ্‌কিন্স। স্ত্রীকে হঠাৎ জড়িয়ে ধরে গভীর লম্বা চুমু দিল হপ্‌কিন্স্। মেয়ের দু-চোখে ঝিকিয়ে উঠল কৌতুক।

পল্লবের কাছে যারা এসেছে, তাদের সকলের বসার জায়গা নেই। জয়া, শান্তা একটা চেয়ার ভাগাভাগি করে বসেছে। সুন্দরলাল আসতে

তাকে বসার টুল ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে বিনয়। রঞ্জন আগেই তার টুল ডরোথিকে ছেড়ে দিয়েছে। পল্লবের পায়ের কাছে পাশাপাশি বিনয়, রঞ্জন দাঁড়িয়ে আছে। ওয়ার্ডের শানবাঁধানো বিশাল দালান পেয়ে মুমু, টুকাই প্রাণ ভরে খেলছে। জয়া বলল, সতুমামা একদিন দেখতে আসবে তোমাকে। নামটা শুনে পল্লব তাকাল জয়ার দিকে। জয়া বলল, মামার সঙ্গে মাসখানেক কথা বলেনি অঞ্জলিদি। এখন মিটমাট হয়ে গেছে। অক্সফোর্ড স্ট্রিটে, একটা ঘর নিয়ে সতুমামা ট্রাভেলিং এজেন্সি শুরু করেছে। টাকা দিয়েছে অঞ্জলিদি। টিকিট বিক্রি করে কমিশনের টাকায় এক, দু-বছর ছাড়া সতুমামা কলকাতায় যেতে পারবে। কিন্তু গরুর গুঁতোয় হাত ভেঙে যাওয়ায় মামার আর কলকাতায় যাওয়ার মন নেই।

এক সেকেন্ড দম নিয়ে জয়া বলল, পরশু সতুমামা, অঞ্জলিদি রাত নটায় আমাদের বাড়িতে এসেছিল। আগামী বছর কলকাতায় যাবার সময় সতু-মামার কাছ থেকে আমরা টিকিট কিনব। তোমার ফেরার টিকিট সতুমামার কাছ থেকে নিতে পার।

বিনয় যে এসব আলোচনা পছন্দ করছে না, তার মুখ দেখে বোঝা যায়। জয়া গ্রাহ্য করল না বিনয়কে, পল্লবকে বলল, হাসপাতাল থেকে যেদিন তুমি ছাড়া পাবে, আমি গাড়ি নিয়ে আসব। ভাড়া লাগবে না।

জয়ার কথায় শান্তা, রঞ্জন হাসল। গাড়ি কিনে জয়া আরও স্মার্ট, চনমনে হয়েছে। ডরোথিকে অফিস যেতে হবে। সে উঠে পড়েছে। ওয়ার্ডের আলোগুলো জোরালো হতে বোঝা গেল বাইরে অন্ধকার ঘন হচ্ছে। সুন্দরলালের গুটিয়ে বসার ভঙ্গি দেখে পল্লব বুঝল, বাইরে আজ নিদারুণ শীত। ওয়ার্ডে বসেও দাঁতে দাঁত ঠুকে যাচ্ছে তার। ছ-টা বাজতে দেরি নেই। ভিজিটররা বাড়ি ফেরার তোড়জোড় করছে। রোগা, ধারালো চেহারা, দুচোখে খরবুদ্ধি, বয়কাট চুল, নীল ইউনিফর্ম পরা মাঝবয়সী মেট্রন মিস বুরম্যান, পাশে ব্যারেট, হঠাৎ ওয়ার্ডে হাজির হল। ব্যারেট বা বুরম্যানের এখন ওয়ার্ড ভিজিটের সময় নয়। অসময়ে ডাক্তার, মেট্রনকে দেখে রোগী এবং দর্শনার্থীরা নতুন কোনও খবর শোনার জন্যে তৈরি হল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে বুরম্যান নিজেই সকলকে ওয়ার্ডে আসার কারণ জানিয়ে দিল। বুরম্যান বলল, হাসপাতালের হাউসস্টাফদের সঙ্গে তাদের কয়েকদফা দাবি নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের ঝগড়া পেকে উঠেছে। আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে ডাক্তারদের অনির্দিষ্টকালের জন্যে ধর্মঘট। কতদিন চলবে কেউ জানে না।

এ অবস্থায় রোগীদের হাসপাতালে রাখার ঝুঁকি কর্তৃপক্ষ নিয়ে রাজী নয়। ফলে কাল থেকে শুরু হবে হাসপাতাল খালি করার কাজ। দু-একজন এমার্জেন্সি রোগী ছাড়া সকলকে ছেড়ে দেওয়া হবে। অবস্থা স্বাভাবিক হলে প্রথমেই তাদের ডেকে নেবেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। রোগীদের আত্মীয়, বন্ধু যারা এসেছেন, যাবার আগে ওয়ার্ড অফিসে বলে যাবেন, কাল কে কখন, তাঁর রোগীকে এখান থেকে নিয়ে যাবেন।

বক্তৃতার ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে বুরম্যান থামলে, রোগীদের নামের তালিকা নিয়ে ব্যারেট পড়তে শুরু করল। প্রথমদিকে বুরম্যানের কথা না বুঝলেও, দু-এক সেকেন্ডের মধ্যে ঘটনাটা আঁচ করে ধড়ফড় করে উঠল পল্লবের বুক। আজ সকালের খবরের কাগজে হাসপাতালের হাউসস্টাফদের ধর্মঘটের নোটিস এবং চিকিৎসার জগতে অচলাবস্থা, সঙ্কট নিয়ে লেখা বড় একটা রচনা পল্লব পড়েছে। ধর্মঘট হলে দেশের সমস্ত সরকারি হাসপাতাল থেকে বেশির-ভাগ রোগীকে যে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হবে, এরকম আভাস সে লেখায় ছিল। লেখাটা পড়ে পল্লব তখন কিছু ভাবেনি। বুরম্যানের ঘোষণা শুনে তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

একটার পর একটা নাম পড়ে যাচ্ছে ব্যারেট। নিজের নামটা শোনার আতঙ্কে দম বন্ধ হয়ে আসছে পল্লবের। জীবনের আর ঊনত্রিশ দিন তার হাতে আছে। এই ঊনত্রিশদিনের মধ্যে যদি হাউসস্টাফদের ধর্মঘট না মেটে, তাহলে? ধর্মঘট মিটলেও হাসপাতালে আবার সে ঢুকতে পাবে, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। তার চোখের সামনে থেকে সব আশা, আলো মিলিয়ে গেল।

যে সব রোগীদের বাড়িতে বা অন্য হাসপাতালে কাল পাঠানো হবে, তাদের নাম জানিয়ে ব্যারেট, বুরম্যান ফিরে যেতে রঞ্জন বলল, তোকে রেহাই দিয়েছে।

রঞ্জনের কথা শুনতে পাচ্ছে না পল্লব। কিছু আগে, নামের তালিকা পড়া ব্যারেট যখন শেষ করে এনেছে, তখনই কালা হয়ে গেছে পল্লব। ফর্দের শেষদিকের একটা নামও সে শুনতে পায়নি। শান্তা বলল, সাবেনি, মোজেস, পল্লব ছাড়া সকলকেই বাড়ি যেতে হবে। আইভ্যান যাবে ব্রমটন্ হাসপাতালে।

সাময়িক বধিরতা কেটে যেতে শান্তার কথা শুনতে পেল পল্লব। তার মনে

হল এক অদৃশ্য শিকারির বন্দুকের অব্যর্থ গুলি থেকে অল্পের জন্যে সে বেঁচে গেছে। বাড়ি ফেরার হুকুম শুনে হপ্‌কিন্স ছাড়া সকলেই মনমরা, গম্ভীর। পাশের ওয়ার্ডে যেখানে হিল আছে, সে ওয়ার্ড কাল একদম খালি হয়ে যাবে। বাড়ি যেতে হবে হিলকেও।

অনেকক্ষণ ধরে ওঠার জন্যে বিনয় তাড়া দিলেও জয়া গায়ে মাখছে না। শান্তার সঙ্গে আড্ডা, গল্পে সে মশগুল। কড়া গলায় বিনয় বলল, আমি চললাম।

এবার শান্তা উঠে দাঁড়াল। ওয়ার্ডের কোণে সোফায় পাশাপাশি বসে নিজেদের মত একটা খেলা বানিয়ে মুমু, টুকাই মেতে আছে। মেয়েকে ডেকে নিয়ে জয়া, বিনয় চলে যেতে মুমু এসে সুন্দরলালের পাশে দাঁড়াল। রঞ্জন বলল, চললাম, কাল আসব।

টুল থেকে উঠে শান্তার দিকে একপলক তাকিয়ে রঞ্জন প্রশ্ন করল, আপনি কোন দিকে?

আবছা হেসে জয়া বলল, বাড়ি।

সুন্দরলাল, মুমু আপনার সঙ্গে যেতে পারে।

ওয়েল্‌কাম্‌, শান্তা বলল।

আমি কিন্তু অক্সফোর্ড স্ট্রিট টিউব স্টেশন।

আপনিও স্বাগত।

কথাটা বলে ভারি সুন্দর করে হাসল শান্তা।

সঙ্গে বাচ্চা মেয়ে থাকলেও সুন্দরলালের ওঠার তাড়া নেই। বিনয়ের আচরণে চটে গিয়ে সে বলেছে, বিলেতে বিদেশীদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী আফ্রিকানরা, আর সবচেয়ে ভীতু হলাম আমরা, ভারতসন্তানরা। ভীতু ভারতীয়দের মধ্যে আবার ভীতুর ডিম হল বাঙালীরা। বিলেতের বেশির-ভাগ বাঙালী সবজান্তা, গবেট, আত্মকেন্দ্রিক। আত্মকেন্দ্রিক শব্দটা বলা বোধহয় ঠিক হল না, বরং সঠিক শব্দ হল, পাকস্থলীকেন্দ্রিক, বাঙালীরা পেটসর্বস্ব, তাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটাই যন্ত্র, তার নাম পাকস্থলী, পেট। সবসময় খাইখাই করছে। নিজেদের সংসার, ছেলেমেয়ে, রান্না, খাওয়া ছাড়া এই বাঙালীরা আর যা জানে, তা হল পরনিন্দা, পরচর্চা। এরা অনেক ভাল জিনিস খায়, কিন্তু হজম করতে পারে না। ডিস্‌পেপসিয়া, ডিসেন্ট্রি, ডায়রিয়া হয়ে এদের শরীর থেকে খাবারের ফুডভ্যালু, সার, শাঁস বেরিয়ে যায়, আর

রান্দি, অপাচ্য অংশ মাথায় গোবর হয়ে জমে থাকে।

তুমি কি সব বাঙালীর কথা বলছ?

রঞ্জন প্রশ্ন করতে সুন্দরলাল বলল, নাহ্। বেশিরভাগ বাঙালীর কথা বলছি। তুমি, শান্তা, একদম আলাদা।

যাবার জন্যে মুমুর হাত ধরে সুন্দরলাল উঠে দাঁড়ালেন।

রঞ্জন, শান্তাও বেরবার জন্যে তৈরি।

পল্লবকে শান্তা প্রশ্ন করল, ইলিশ মাছ খাবে?

ব্যারেটের ঘোষণার ঝাঁকুনিতে পল্লবের মাথার ঘিলু তখনও কাঁপছে। তবু শান্তার প্রশ্নের জবাবে মুখে হাসি টেনে ঘাড় নেড়ে সে জানাল, হ্যাঁ।

সামনে সুন্দরলাল, মুমু, তাদের পেছনে শান্তা, রঞ্জন দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। শান্তা, রঞ্জন পাশাপাশি এমন ঘনিষ্ঠভাবে হাঁটছে যে, গায়ে গা লেগে যেতে পারে দুজনের। চাপা গলায় কিছু বলছে তারা। দরজার বাইরে গিয়ে পেছন ফিরে পল্লবকে হাত নাড়াল দুই বন্ধু। এত ঝামেলার মধ্যেও পল্লবের মনে হচ্ছে, দুটি মানুষের ব্যর্থতা মিশে একটি সফলতার জন্ম বোধহয় অসম্ভব নয়।

বন্ধুরা চলে যেতে ফাঁকা, নিস্তব্ধ হয়ে গেল ওয়ার্ড। শরীর জুড়ে অস্বস্তি, কাঁপুনি নিয়ে পল্লব ভাবল, ব্যারেটের ফর্দে আমার নাম থাকলে কী হত? নাম না থাকায় বেঁচে গেছি। সত্যি কি বাঁচলাম? ডাক্তারদের এই ধর্মঘট লাগাতার চললে আমার কি অপারেশন হবে? আর মাত্র ঊনত্রিশ দিন সময়।

বিশ্বাস না করলেও পল্লবের মনে হল, তার দিকে কোনও দুষ্টগ্রহ তাকিয়ে আছে। পাকা ঘুটি তাই কেঁচে যাচ্ছে বারবার। জীবন এবং মৃত্যুকে খুব কাছাকাছি, দু-হাতের তালুতে দাঁড় করানো দুটো জ্যান্ত পুতুলের মত পল্লব দেখতে পেল। সে যেন এক নচিকেতা, রূঢ়, ভয়ঙ্কর মৃত্যুরহস্য ভেদ করতে এগিয়ে চলেছে।

হাসপাতাল থেকে ছুটি হয়ে যাবে শুনে বেজায় খুশিতে মোজেস আর পল্লবের বিছানার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গল্প জুড়েছে হপ্‌কিন্স। তার নকল গাম্ভীর্য খসে গেছে।

হপ্‌কিন্স বলল, মার্গারেট ফিরে এসেছে।

মার্গারেট কে?

মোজেস প্রশ্ন করতে হপ্‌কিন্স বলল, সাতনম্বর চাকের পুরনো রানী। চাকের নতুন রানী লিজার সঙ্গে ঝগড়া করে চলে গিয়েছিল মার্গারেট। লিজা আবার মার্গারেটের মেয়ে।

বিছানায় শুয়ে অনেক রাত পর্যন্ত হপ্‌কিন্সের মৌমাছির গল্প শুনল পল্লব। হপ্‌কিন্স বলছিল, দু-বছরে মার্গারেট পঞ্চাশ হাজার বাচ্চার জন্ম দিয়েছে। হাসপাতাল থেকে কিছুদিনের ছুটি পেয়ে আমার ভালই হল। অনেক কাজ শীত ফুরবার আগে সেরে রাখতে হবে আমাকে। বসন্তে গাছে গাছে নতুন পাতা, ফুল এলে আমার বাগানের সাঁইত্রিশটা চাক মধুতে ভরে যাবে। এ বছর চাকের সংখ্যা অনেক বাড়বে। পঞ্চাশটা তো হবেই। আমি না থাকলে দেখাশোনা হবে না। একসময়ে খুব ভাল বেলিডান্স্ করত মার্গারেট।

হপ্‌কিন্সের মৌমাছিতত্ত্ব বলার মধ্যে রাতের পানীয়, চা, কফি, কোকো, হরলিক্‌স ট্রলি চেপে এসে গেল। এককাপ হরলিক্‌স পল্লবের টেবিলের ওপর রেখে লিন্ডা বসল, ইওর ড্রিংক, মাই লাভ।

পল্লবের পছন্দ লিন্ডা জেনে গেছে।

পরদিন সন্ধ্যেতে, ভিজিটিং আওয়ার শেষ হওয়ার পাঁচ-দশ মিনিট আগে মেট্রন বুরম্যান এসে পল্লবকে বলল, কাল দুপুর দুটোয় তোমার অপারেশন! আজ রাতে স্নান করবে।

মুখে হাসি ছড়িয়ে বুরম্যান চলে যেতে সুন্দরলাল-রঞ্জন তাকাল পল্লবের মুখের দিকে। ওরা দুজন ছাড়া পল্লবের কাছে আজ কেউ আসেনি। সকালেই খালি হয়ে গেছে ওয়ার্ড। হাসপাতাল থেকে যাওয়ার আগে হপ্‌কিন্স বলেছে, বাড়িতে ফিরে প্রথমেই সে মোজেস আর পল্লবকে তার খামারের দু-শিশি মধু পাঠাবে। আইভ্যান গেছে ব্রমটন হাসপাতালে। আইভ্যান চলে যেতে মন খুব খারাপ হয়েছিল পল্লবের। আইভ্যানের ওপর তার মায়া পড়ে গেছে। এ-কদিনে পল্লবকে গান শোনার নেশা ধরিয়ে দিয়ে গেছে আইভ্যান। সকাল দশটায় আইভ্যানের ক্যাসেট রেকর্ডার চালু হত। সারা সকাল, দুপুর, বিকেলে ভিজিটিং আওয়ারের আগে পর্যন্ত বেজে যেত ইতালির গান, বিশেষ করে লোকসঙ্গীত। দু-চোখ বুজে তন্ময় হয়ে গান শুনত আইভ্যান। কখনও ঘুমিয়ে পড়ত। প্লেয়ার বেজে যেত। আইভ্যানের ক্যাসেট শুনেই অনেক-

গুলো চেনা বাংলা গানের হদিস পেয়েছে পল্লব। ইতালির ভাষায় ধিতাং ধিতাং বোলে, কে মাদলে তান তোলে, বা ফুলের মতন ফুটল ভোর, ভাঙল মাঝির ঘুমের ঘোর, গান দুটো শুনে রোমাঞ্চিত হয়েছে পল্লব। তার স্বদেশ-বিদেশ একাকার হয়ে গেছে।

আইভ্যান চলে গেলেও তার বিছানা খালি নেই। হাসপাতাল ছেড়ে না যাওয়ার জেদ ধরায় হিলকে রাখা হয়েছে আইভ্যানের বেডে। ব্রমটন হাস-পাতালে যাবার আগে পল্লবের দিকে করুণ চোখে আইভ্যান তাকিয়েছিল। তার খাটের নিচের প্লাস্টিকের যে ব্যাগে সারাদিন তার পেচ্ছাপ ফোঁটা ফোঁটা জমা হত, খালি বেডে আইভ্যান চলে যাওয়ার পরেও হলুদ পেচ্ছাপ ভরা সে থলি ঝুলতে থাকল। আধঘণ্টার মধ্যে অবশ্য সাফা হয়ে গিয়েছিল বেড। রবারের টিউব শরীরে লাগিয়ে পায়খানা, পেচ্ছাপ করানো হত আইভ্যানকে। সারাদিন, রাত তার শরীরে লাগানো থাকত দুটো টিউব। আড়ষ্ট শরীরে আইভ্যান কিছুই টের পেত না।

অপারেশনের খবর শুধু পল্লব নয়, সুন্দরলাল, রঞ্জনকেও এমন চমকে দিয়েছে যে কিছুক্ষণ তারা কথা বলতে পারল না। প্রথম কথা সুন্দরলাল বলল, জেসাস ক্রাইস্ট অনেকদিন পরে একটা সুখবর শুনলাম!

কোনও কথা না বলে পল্লবের বুকে হাত রাখল রঞ্জন। ভিজিটিং আওয়ার শেষ হলেও পল্লবকে ছেড়ে যেতে সুন্দরলাল, রঞ্জন দেরি করছে। ওয়ার্ড টহল শেষ করে ফেরার সময় সুন্দরলালকে বুরম্যান বলল, অফিসে একবার দেখা করবেন।

মিনিট পাঁচ পরে ওয়ার্ড অফিসে বুরম্যানের সঙ্গে দেখা করতে গেল সুন্দরলাল। রঞ্জনও সঙ্গী হল। রাতের খাবার শেষ হতে পল্লবকে লিন্ডা বলল, বাথ্‌টবে জল ভরা হয়েছে। তুমি স্নানে যাও।

পল্লব কলঘরে ঢোকার আগে তার হাতে শ্যাম্পুর ছোট একটা প্যাকেট আর চারটে ইউন্‌কিন্‌সন্‌ ব্লেড দিয়ে লিন্ডা বলল, শ্যাম্পু করার আগে মাথা ছাড়া শরীরের সব চুল কামিয়ে নেবে। অসুবিধে হলে বাথরুমের বেল বাজিয়ে আমাকে ডেকো, আমি সাহায্য করব।

অনায়াসে কথাগুলো পল্লবকে বলে মোজেসের বিছানার দিকে গেল লিন্ডা। কত অসংকোচে কাজের কথা এরা সেরে নিতে পারে! বোধহয় এর নামই দক্ষতা!

বাথরুমের দরজা বন্ধ করে নির্লোম হতে হাঁপিয়ে গেল পল্লব। শরীরের সক্ষমতা, জোর কমে গেছে। হাত কাঁপছে। গত দু-মাস না কামানোয় মুখে দাড়ি. গোঁফের ঘন জঙ্গল। মুখ থেকে হাঁটু পর্যন্ত ধারাল ব্লেডে সাফাই করতে রক্তারক্তি হল পল্লব। কামানো শেষ করে স্নান, শ্যাম্পুর পর যখন সে বিছানায় ফিরল, হাজার মাইল পথ পায়ে হাঁটার কষ্ট, ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়েছে তার শরীর। বিছানায় শুয়ে পল্লব ভাবছে অপারেশনের পর আমি কি বাঁচব? যদি মরে যাই?

অপারেশনের মুখোমুখি হয়ে এই প্রথম মৃত্যুর কথা মনে হল তার। সে ভাবে, মৃত্যুর পর মানুষের শরীরে কোনও রোগ, ব্যাধি থাকে কিনা, এ নিয়ে তর্ক থাকলেও দুঃখ, কষ্ট, ভয়, হতাশা থেকে যে সে রেহাই পায়, কয়েক-ঘণ্টা, দেহ পচে ওঠার আগে পর্যন্ত, সন্দেহ নেই, অমলিন, নিশ্চিন্ত থাকে। দু'চোখ বুজে মৃত্যুর মধ্যেও আরাম, প্রসন্নতা খুঁজতে থাকে পল্লব। পেয়েও যায়। তার শরীর থেকে রক্ত শুষে ঢোল হয়ে যাওয়া কিছু জোঁক একটা একটা করে খসে পড়তে থাকে।

দুজন অচেনা ডাক্তার নিয়ে বুরম্যান বিছানার পাশে এসে দাঁড়াতে পল্লব একটু অবাক হল। নতুন কোন দুঃসংবাদ শুনতে হবে ভেবে ভয়ও পেল। মুখে স্মিত হাসি বুরম্যান বলল, ডক্টর ম্যাকগ্রেগার আর ডক্টর এ্যাশ ই এন টি স্পেশালিস্ট, তোমার গলা পরীক্ষা করবেন।

সব আলো জ্বলছে ওয়ার্ডে, রোগীরা জেগে আছে। বিছানার তিন পাশের পর্দা বুরম্যান টেনে দিতে ম্যাকগ্রেগার, এ্যাশ পর্দার ঘরে পল্লবের গলা পরীক্ষা শুরু করল। এক কাচের অদ্ভুত চশমা পরে প্রথমে এ্যাশ পরে ম্যাকগ্রেগার জোরালো পেন্সিল টর্চ পল্লবের হাঁ মুখে ফেলে অনেকক্ষণ ধরে তাকে পরীক্ষা করল। বুরম্যানকে এ্যাশ বলল, অপারেশন স্টপ করার দরকার নেই।

এ্যাশের কথার মানে খুঁজে পেল না পল্লব। তার গলার দুপাশের নালি-হাড় বাইরে থেকে আলতো হাতে টিপে পরীক্ষা করে ম্যাকগ্রেগার বলল, হ্যাঁ, অপারেশন করার কোনও অসুবিধে নেই।

এ্যাশের দিকে কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে পল্লবকে ম্যাকগ্রেগার বলল, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তোমার ভোকাল কর্ড, শব্দনালী প্যারালিসিস হয়ে গেছে। সম্ভবত এ পক্ষাঘাত টেম্পোরারি, সাময়িক, কিন্তু তাতে কিছু যায়

আসে না। অপারেশনের আগে মিঃ কলিন্স ই এন টি ওপিনিয়ন্ চেয়েছেন। আমাদের কোনও আপত্তি নেই। অপারেশন হতে পারে।

বুরম্যানের সঙ্গে ম্যাকগ্রেগার, এ্যাশ চলে যাওয়ার পর তাজ্জব বনে গেছে পল্লব। সে হাসবে, না কাঁদবে ভেবে পাচ্ছে না। কাল অপারেশন, এ সুখবরের সঙ্গে ভোকাল কর্ড প্যারালিসিস্ হওয়ার দুঃসংবাদ তাকে জবুথবু করে দিয়েছে। পক্ষাঘাতে তার কণ্ঠনালী পঙ্গু, আর কোনদিন সে কথা বলবে না, এই একটা চিন্তা পাথর করে দিয়েছে তাকে। একটু আগে মৃত্যুর মধ্যে আরাম, আনন্দ খুঁজে পেলেও এখন বোবা হয়ে যাওয়ার খবরে তার নিজের তৈরি দার্শনিকতার তাসের প্রাসাদ ছত্রখান হয়ে ভেঙে পড়ল। তার মনে হল মৃত্যুর চেয়ে দগ্ধে দগ্ধে মরা, আধমরা হয়ে বাঁচার কষ্ট অনেক বেশি। কুলি করার জন্যে ওষুধ মেশানো গরম জল দিয়েছে লিন্ডা। জলের গ্লাস নিয়ে বেসিনে যাওয়ার শক্তি নেই পল্লবের। গরম জল জুড়িয়ে যাচ্ছে।

বিছানার পাশে পায়ের শব্দ শুনে পল্লব দেখল, মার্টেলি, সঙ্গে শার্লি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। হাসিমুখে পল্লবকে চোখ মারল মার্টেলি। অপারেশনের সেই চেনা হলফনামা ছাপা কাগজে পল্লবকে সই করাল শার্লি। মার্টেলি প্রশ্ন করল, হ্যাভ্ য়ু এনিথিং টু আস্ক্? বলার আছে কিছু?

পল্লব ঘাড় নাড়ল। যার অর্থ এ্যাব্সলুটলি নাথিং, আমার কিছু বলার নেই।

গুড, মন্তব্য করল মার্টেলি।

মার্টেলি, শার্লি চলে যেতে ওয়ার্ডের আলো নিভে ফিনফিনে সবুজ বাতি জ্বলল। পল্লবের বিছানার পাশে দাঁড়ানো শক্ত, মজবুত শরীর একাত্তর বছরের মোজেসকে সামান্য বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। মোজেস বলল, কবে যে আমার অপারেশন হবে।

আলো নেভার আগেই সাবোনি, হিল ঘুমিয়ে পড়েছে। হালকা সবুজ আলোয় ঘুমিয়ে থাকা দুই বৃদ্ধকে ঘুমন্ত দুটি শিশুর মত দেখাচ্ছে। ঘুমের মধ্যে দু-জনের ফুৎকার, কথা, হাসি, হাত, পা নাড়ার ভঙ্গি প্রায় শিশুর মত। সন্ধ্যেবেলায় বুরম্যানের মুখে অপারেশনের খবরে যে চমক, আনন্দ, তিরতির শিহরণ, শরীরে, মনে ছড়িয়ে পড়েছিল, গত কয়েকঘণ্টায় তা ভোঁতা হয়ে গেছে। হিথ্রো বিমানবন্দরে দু-মাস, বাটদিন আগে নামার পর থেকে মেঘ, বৃষ্টি,

তুষারপাতের এই শীতলতম দিনগুলোতে প্রতি মুহূর্তে বাঁচার কথা, অপারেশন ছাড়া কিছু ভাবেনি পল্লব। তখন কি সে জানত যে অপারেশনের আগেই শব্দনালী পঙ্গু, অসাড় হয়ে যাবে? অপারেশনের পর বেঁচে থাকলেও কথা বলতে পারবে না? এই বাঁচায় কী লাভ?

মাথার মধ্যে ঘুমের ওষুধের কাজ শুরু হয়েছে। দুশ্চিন্তার ধার, জ্বালা কমে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। হঠাৎ তার মনে হল, কাল অপারেশন টেবিলে সে যদি মারা যায়, তাহলে কাল রাত সাড়ে এগারটায় ঠিক এই সময়ে, ফিকে সবুজ আলোর দিকে তাকিয়ে পল্লবের চিন্তা স্তব্ধ হয়ে গেল। সে ভাবল, আমি মরে গেলে পৃথিবীর কোনও ক্ষতি নেই। পৃথিবীতে যত মানুষ, এখন চারশ কোটি যদি জীবিতের সংখ্যা হয়, তাহলে তার বহুগুণ বেশি মানুষ ইতিমধ্যে মারা গেছে। পৃথিবীতে মানুষের আবিভাব থেকে আজ পর্যন্ত মৃত মানুষের সংখ্যা কত হিসেব করতে গিয়ে মাথা ঘুরে গেল তার। তবু মানুষ বাঁচতে চায়, বাঁচার আকাঙ্ক্ষা তার মরে না। পল্লব ভাবল, তাহলে আমি কেন মরার কথা ভাবছি? মৃত্যুর বিরুদ্ধে আপসহীন লড়ে কেন মৃত্যুর কাছে নতজানু হব? মৃত্যুকে যদি হারাতে পারি, শব্দনালীর পক্ষাঘাতও হয়ত একদিন সেরে যাবে। নতুন একটা রোগের খবর শুনে মৃত্যুর কাছে আমি মাথা নোয়াব না।

সামনের বিছানায় সাবেনি হঠাৎ ডুকরে উঠতে পল্লব দেখল, নাহ, সে যা ভেবেছে তা নয়, বাইবেল পড়ছে সাবেনি। রাত বারটায় ঘুম ভাঙতে সকাল হয়েছে ভেবে বালিশের তলা থেকে বাইবেল বার করেছে সাবেনি। দু-চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে বৃদ্ধ, অথর্ব সাবেনির ভাঁজ পড়া মুখ, চিবুক। নিঃশব্দে সাবেনির বিছানার পাশে এসে নিচু গলায় লিন্ডা বলল, এখনও সকাল হতে দেরি, মাই লাভ। ঘুমিয়ে পড়ুন।

সাবেনির বুকে হাত রেখে, মুঠোয় ধরা বাইবেলটা বন্ধ করে তার বালিশের তলায় রেখে দিল লিন্ডা।

সকাল আটটায় আবার সেই সাদা আলখাল্লা এনে পল্লবকে লিন্ডা বলল পরে নাও।

বিছানার তিন পাশের পর্দা টেনে দিয়ে সে চলে যাবার পর রাতের পোশাক ছেড়ে আলখাল্লার মধ্যে ঢুকে গেল পল্লব। সকাল থেকে একগ্লাস জলও পল্লব খায়নি। আধঘণ্টা পরে ফিজিওথেরাপিস্ট মিসেস কুপারকে নিয়ে ডাঃ

ব্যারেট এল। পল্লবকে একটা এ্যাট্রোপিন্ ইঞ্জেকশন দিয়ে ব্যারেট বলল, মিসেস কুপার কয়েকটা ব্যায়াম দেবে। অপারেশনের পর সেগুলো করতে হবে তোমাকে, আর একটা কথা। জ্ঞান ফিরলে তুমি দেখবে, তোমার মুখের মধ্যে লোহার একটা বল পোরা আছে। নিঃশ্বাসের সুবিধের জন্যে বলটা রাখা হয়। কথা বলতে না পেরে ভয় পেও না। মেজর এই অপারেশনের জন্যে তোমার শরীরে অনেক নল, টিউব লাগানো থাকবে। ছ-ঘণ্টা সময় লাগবে অপারেশনে। প্রথমে কাটা হবে বুক। বুকের দেওয়াল সরিয়ে হৃৎপিণ্ড বাইরে এনে, হৃৎপিণ্ডের রক্ত হার্টলাঙ মেশিনে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। হার্টলাঙ মেশিন হ'ঘণ্টা তোমার হৃৎপিণ্ড আর ফুসফুসের কাজ করবে। হার্টলাঙ মেশিন চালু করে হৃৎপিণ্ড বার করব আমরা। গাইজ থেকে অপারেশন সেরে মিঃ কলিন্স এসে তখন তোমার হৃৎপিণ্ড মেরামত করবেন। অকেজো মাইটাল্ আর এওটিক্ ভালভ্ দুটো কেটে বাদ দিয়ে নতুন, কৃত্রিম দুটো ভালভ্ বসিয়ে দেবেন। ভালভ্ লাগানো হয়ে গেলে হৃৎপিণ্ড সেলাই করে ইলেকট্রিক শক দিয়ে ফের চালিয়ে দেওয়া হবে যন্ত্রটা। হৃদ্‌যন্ত্র কাজ শুরু করলে হার্টলাঙ মেশিন থেকে সেখানে রক্ত ফিরে আসবে। আধঘণ্টা, পঁয়তাল্লিশ মিনিট নতুন ভালভ্ লাগানো যন্ত্রটা অবজারভেশনে রেখে তারপর আমরা বুক সেলাই করব।

অপারেশনের খুঁটিনাটি পল্লবকে শুনিয়ে ব্যারেট প্রশ্ন করল, হ্যাভ্ য়ু এ্যানিথিং টু আস্ক? কোনও প্রশ্ন আছে?

পল্লব ঘাড় নাড়ল। যার অর্থ, এ্যাবসলিউট্‌লি নাথিং, কিছু বলার নেই আমার।

তাবছা হেসে ব্যারেট বলল, গুড্।

ব্যারেট চলে যেতে ফিজিওথেরাপিস্ট, মিসেস কুপার বলল, অপারেশনের বাহাত্তর ঘণ্টা পার হলে তোমাকে কয়েকটা ব্যায়াম করাব আমি। প্রথম দু-তিনদিন নিঃশ্বাসের তারপর দেহ এবং নিঃশ্বাসের ব্যায়াম তোমাকে করতে হবে। আজ তোমাকে যে ব্যায়াম বলব, তা হল কাশির ব্যায়াম। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে কাশতে চেষ্টা করবে। যত কাশবে, কফ্ তুলবে, তত তাড়াতাড়ি সুস্থ হবে। কীভাবে কাশবে?

প্রশ্নটা করে মিসেস কুপার নিজে দু-তিনবার কেশে শিখিয়ে দিল কাশার পদ্ধতি। মিসেস্ কুপারের পদ্ধতিতে নতুন কিছু না পেলেও অপারেশনের পর

কাশি এবং কফ্ তোলা যে জরুরী, পল্লব বুঝতে পারল।

পর্দা টানা ফাঁকাঘরে পল্লবের মাথায়, শরীরে এ্যাট্রোপিনের নেশা ঘনীভূত হচ্ছে। একটা ধূসর চাদরে ঢেকে যাচ্ছে পৃথিবী, পায়ের শব্দ, টুকরো কথা। কাল রাতে অপারেশনের খবর জানিয়ে অনিতাকে একটা চিঠি লেখা ঠিক করেছিল পল্লব। এয়ার লেটার, কলমও তৈরি ছিল। এ্যাশ, ম্যাকগ্রেগার আসার পর ভেস্তে গেল সব। চিঠি লেখার ইচ্ছে মরে গেল। পক্ষাঘাতে গলার শব্দনালী পঙ্গু হওয়ার কথা অনিতাকে কী করে লিখবে পল্লব? তবু অপারেশনের আগে একটা চিঠি অনিতাকে লেখা উচিত ছিল। অপারেশন টেবিলে যদি জ্ঞান না ফেরে সে কথা চিন্তা করেও কিছু পরামর্শ অনিতার জন্যে রেখে যাওয়ার দায়িত্ব ছিল তার। বুবাই, ফুলিকে নিয়ে যে আশা, কল্পনা তার ছিল, সব সে কখনও বলতে পারেনি অনিতাকে। ছ-হাজার মাইল দূরে থেকে ছেলে-মেয়ে সম্পর্কে তার সেই সুপ্ত, গোপন আকাঙ্ক্ষার কথা স্বচ্ছন্দে অনিতাকে জানাতে পারত সে। কেন লিখল না, সে নিজেও জানে না। হয়ত মৃত্যুর সঙ্গে একটানা দ্বৈরথ শুদ্ধ পৃথিবী, সংসার সম্পর্কে তাকে নির্লিপ্ত, উদাসীন করে দিয়েছে। সে ভেবেছে, মানুষের কোন্ সাধ, আকাঙ্ক্ষা পুরোপুরি মেটে? অতৃপ্তি, অপূর্ণতাই মানুষের ভবিতব্য। ভবিতব্য শব্দটায় খটকা লাগল। ভবিতব্য, নিয়তি, অদৃষ্ট, দৈবে তার কোনকালে বিশ্বাস ছিল না। আজও নেই। ফলে অতৃপ্তি, অপূর্ণতা মানুষের ভবিতব্য নয়, বেশিরভাগ মানুষের পরিণাম, এভাবেই সে ভাবল। তাছাড়া তার পরামর্শ, বুদ্ধি কোন কাজে লাগবে অনিতার? জীবনের কোনও কাজ, দায়িত্ব শেষ না করে সে মারা যায়, সেই দায়িত্বজ্ঞানহীনের পরামর্শের কী দাম আছে? তবু অনিতাকে চিঠি লেখার বাসনা পল্লবের প্রবল হয়। আচ্ছন্ন চেতনায় এয়ার লেটার, কলম হাতে এখনই চিঠিটা লিখে ফেলার তাগিদ বোধ করে। এ অবস্থায় যা লেখার ঠিকঠাক, গুছিয়ে লেখা যাবে না ভেবে পল্লব যেমন শুয়েছিল, সেভাবে শুয়ে থাকল। মরার আগে চিঠিভর্তি আবোলতাবোল কথা লিখে সে নিজের বোকামি জাহির করতে রাজী নয়।

ট্রলির আওয়াজ, কাঁচের বাসনের ঠুং ঠাং ধ্বনি, সুপের বাটি খোলার শব্দ হদিস দিল বারটা বেজেছে। ফিকে ঘুমের মধ্যে পল্লব টের পেল সময় বয়ে যাচ্ছে। এখন যে কোনও মুহূর্তে গাড়ির বিছানা এসে যাবে। দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি।

পর্দা ঠেলে বিছানার পাশে নীল পোশাক পরা বুরম্যান এসে দাঁড়াতে চোখ-মেলল পল্লব। এক সেকেন্ড তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বুরম্যান বলল আজ তোমার অপারেশন হচ্ছে না। কবে হবে, পরে জানতে পারবে তুমি।

ফ্যালফ্যাল করে পল্লবকে তাকিয়ে থাকতে দেখে, সে কথাটা বোঝেনি ভেবে দ্বিতীয়বার বলল বুরম্যান। তারপর পর্দা সরিয়ে চলে গেল।

বুরম্যানের খবরটা আগুনের ছররার মত মাথায় ঢুকে পল্লবের অ্যাট্রোপিনের নেশা ফুটিফাটা করে দিল। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে খটখট করছে পল্লবের বিছানার পর্দার ঘেরা টোপ চটপট সরিয়ে দিয়ে দিনের নার্স, অ্যান্ড্রু, ইংরেজ তরুণী বলল, পোশাক বদলে নাও। তোমার খাবার নিয়ে আসছি।

টলমল পায়ে বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে বুককাটা আলখাল্লা ছেড়ে পাজামা, পাঞ্জাবি পরে নিল পল্লব। মোজেস, হিল যে লক্ষ্য করছে, পল্লব খেয়াল করল না। দারুণ ভয়, আশঙ্কার একতাল হতাশার মত বিছানায় লুটিয়ে পড়ল সে। অপারেশন পাকা হয়েও, কেন বাতিল হল, সে কি ধরা পড়ে গেছে, বিদেশী বেআইনী রোগী হিসেবে তার পরিচয় কি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষর কানে উঠেছে, এখন কি তাকে হাসপাতাল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে, নানা প্রশ্নে তোলপাড় হচ্ছে পল্লবের মন।

টেবিলে খাবার ট্রে রেখে অ্যান্ড্রু চলে যাবার পরে খেতে আগ্রহ বোধ করল না পল্লব। তার মুখ, মুখের ভেতরে জিভ শুকনো, খেতে ইচ্ছে নেই। চাকা লাগানো উঁচু টেবিল বিছানার মাঝখানে টেনে খাবারের দিকে তাকিয়ে বসে আছে পল্লব। এক টুকরো রুটি এখন তার গলা দিয়ে নামবে না।

খবর শুনে খুব দুঃখের সঙ্গে মোজেস বলল, এদের কাণ্ড আমি বুঝি না। হাসপাতালগুলোতে আজকাল যা চলেছে।

চিত হয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে গোল্লা চোখে সিলিং দেখছে হিল। পল্লবের অপারেশন বাতিল হওয়ার খবরটা শোনার পর থেকে এই অল্প সময়ে সে সাতবার ঘড়াং করে ঢেঁকুর তুলে সাতবার এক্সকিউজ মি. বলেছে। একগ্লাস জল খাওয়ার কথা হিলকে বলবে ভেবেও পল্লব পারেনি। পল্লবের অপারেশন বাতিল হওয়ায় চাপা খুশিতে ফেটে পড়ছে হিল। খুশির চোটে দুপুরে সে ঘুমোয়নি। আতঙ্ক, অনিশ্চয়তা উদ্বেগে পাথর হয়ে গেছে পল্লব। সে ভাবছে, হেরে গেলাম আমি। শব্দনালীতে পক্ষাঘাত অপারেশন হল না। মৃত্যুর সঙ্গে শেষ লড়াই বাতিল করে দিল রেফারি। রেফারি কে? কেন বাতিল

করল ; অনেক ভেবেও হদিস পেল না সে। জীবনের বাকি সাতাশ দিন এভাবেই কাবার হয়ে যাবে। সত্যিকারের একটা লড়াই এতদিন চালিয়েও শেষ চূড়ান্ত লড়াইটা সে দিতে পারল না। নিজের মনে পল্লব বলল, সাঁতরে মহা-সমুদ্র পাড়ি দিতে রাজী ছিলাম আমি। কিন্তু হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দেওয়া হল আমাকে। সাঁতার কাটার সুযোগ পেলাম কই? আজ চব্বিশে ফেব্রুয়ারী। ফেব্রুয়ারী মাস শেষ হতে চারদিন বাকি। এ মাসের শেষ চার-দিন আর মার্চের বাইশ দিন, মোট ছাব্বিশ দিন কাটলেই তেইশে মার্চ, মঙ্গলবার।

মেঘ, হাওয়া ঝিপ ঝিপ বৃষ্টিতে ধূসর, ভিজে ভয়ংকর দিনটাকে অনিবার্য গতিতে এগিয়ে আসতে দেখল পল্লব।

কিন্তু এরকম কেন হল? একটা কারণ নিশ্চয় আছে। সকালের কাগজে পল্লব পড়েছে যে, ডাক্তারদের ধর্মঘট সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ধর্মঘটী ডাক্তারদের সংখ্যা বাড়ায় ব্যাপক, বিস্তৃত হয়েছে ধর্মঘটের পরিধি। কর্তৃপক্ষের আশংকা, সহজে এ ধর্মঘট মিটবে না।

ডাক্তারদের ধর্মঘটের জন্যেই হয়ত তার অপারেশন বাতিল হয়েছে, পল্লব ভাবল। ঘটনা, সে রকম হলে, ভরসা হল, ধর্মঘট মিটে গেলে তার অপারেশন হবে। কিন্তু আগামী সাতাশ দিনের মধ্যে যদি ধর্মঘটের মীমাংসা না হয়, তাহলে পাশাপাশি আর একটা দুশ্চিন্তা, ভয়, সেটাই প্রধান, পল্লবকে নিঃশব্দে থেঁতো করে ফেলছে। তার মনে হচ্ছে, সে যে জাল, বেআইনী রোগী তিনহাজার পাউন্ড ফাঁকি দিয়ে ফাঁকতালে অপারেশন সারতে হাসপাতালে ঢুকে পড়েছে, সে খবর সরকারি স্বাস্থ্য দপ্তরে জানাজানি হয়ে গেছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের হস্তক্ষেপে বন্ধ হয়েছে তার অপারেশন। নিদারুণ অস্বস্তিতে পল্লবের হৃৎপিণ্ড মোচড়াতে থাকে। চোখ তুলে পল্লব বিছানা থেকে তার দিকে তাকিয়ে আছে হিল। পল্লবের সঙ্গে চোখাচোখি হতে ঘড়াং করে একটা ঢেঁকুর তুলে হিল বলল, এক্সকিউজ মি।

পল্লব চোখ নামাল। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতেই সুন্দরলাল এল। পল্লবকে বিছানায় দেখে এতটুকু অবাক না হয়ে সুন্দরলাল বলল, দুপুর দুটোয় ফোন করে আমি জেনে গেছি যে আজ তোমার অপারেশন হবে না। কবে হবে, জানতে চেয়ে জবাব পাইনি।

পল্লবের শুকনো, ম্লান মুখ দেখে সুন্দরলাল বলল, মনে হল দু-তিন-

দিনের মধ্যে হয়ে যাবে।

সুন্দরলালের কথার মধ্যেই ওয়ার্ডের দরজা দিয়ে মার্টেলিকে ঢুকতে দেখল পল্লব। মার্টেলি একা, সঙ্গে কেউ নেই। ঝকমকে চেহারা, সোনালী চুল, সোনালি চশমা, মুখে হাসি মার্টেলি এসে পল্লবের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, তোমার সোয়াব পরীক্ষার রিপোর্ট ধর্মঘটের জন্য আসতে দেরি হয়েছে। তোমার সোয়াব, থুথুতে টিবির জীবাণু পাওয়া গেছে। যক্ষ্মার ইনফেকশন আছে তোমার ফুসফুসে। তোমার শব্দনালী, ভোকাল কর্ড অকেজো, প্যারালিসিস হওয়ার কারণও টিবির এই জীবাণু। সাদামাটা প্যারালিসিস হলে আজই আমরা অপারেশন করতাম। কিন্তু বুকে ইনফেকশন রেখে মেজর অপারেশনের ঝুঁকি নেওয়া বিপজ্জনক। টিবির চিকিৎসার জন্যে মিঃ কলিন্স তাই কাল তোমাকে ব্রমটন হাসপাতালে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। টিবি সেরে গেলেই তোমার অপারেশন হবে।

মোজেসের বিছানার সামনে গিয়ে মার্টেলি বলল, কাল আপনার অপারেশন।

স্ত্রী, ছেলেমেয়েদের মাঝখানে বসে প্লেটে বাড়ি থেকে আনা কোন খাবার খাচ্ছিল মোজেস। মার্টেলির কথা শুনে খাওয়া বন্ধ করে সে ফ্যাকাসে মুখে তাকিয়ে থাকল।

পল্লবের অপারেশন বাতিল, টিবির চিকিৎসা হবে শুনে অসম্ভব গম্ভীর হয়ে আছে সুন্দরলাল। কিছু বলার জন্যে উসখুস করলেও বলতে পারছে না সে। পল্লবের কানে তালা লেগে গেছে। কথা বলার ক্ষমতা নেই, কথা সে শুনতেও চাইছে না।

•

কয়লার উনুনের কালচে, সাদা ধোঁয়ারমত জমাট কুয়াশা স্থির হয়ে আছে। থমথমে, গম্ভীর আকাশ। ভারি অসুস্থ, ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে পৃথিবীকে। দু-পাশের কঙ্কালসার গাছের মাঝখান দিয়ে ভিজে, ফাঁকা রাস্তা ধরে অ্যাম্বুলেন্স চলেছে ব্রমটন হাসপাতালে।

য়ু আর রিয়েলি আনফরচুনেট, নিগ্রো অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার গ্রেগরি বলল পল্লবকে।

অ্যাম্বুলেন্সে না শুয়ে গ্রেগরির পাশে হাসপাতালের কম্বল গায়ে জড়িয়ে বসে আছে পল্লব। গ্রেগরির কথায় সে সাড়া করল না। বলার কথা তার কিছু

নেই। সে সত্যি হতভাগ্য, প্রমাণ হয়ে গেছে।

গ্রেগরি আবার বলল, ভাগ্য খারাপ না হলে মানুষের এত দুর্ভোগ হয়? সামনে সামার, বসন্ত, দমভোর ফূর্তির সময়। সে সব ছেড়ে টিবির চিকিৎসা, তারপর হার্টের অপারেশন, বেচারি।

পল্লবকে শুনিয়ে নিজের মনে গলগল করে কথা বলছে গ্রেগরি। ছুটন্ত অ্যাম্বুলেন্সের বন্ধ জানলার কাঁচে, উইণ্ডস্ক্রিনে ধারাল নখে বাতাস আঁচড় কাটছে। পালিশ করা জুতোর মত জলে ভেজা চকচকে কালো পিচরাস্তা এই দুপুরেও অন্ধকার, ছায়া ছায়া। হুসহুস করে গাড়ি যাচ্ছে। রাস্তায় মানুষ প্রায় চোখে পড়ে না। দক্ষিণ লণ্ডনের কেমসিংটনে ব্রমটন হাসপাতাল। অ্যাম্বুলেন্সের ভেতর হিটার জ্বললেও পল্লবের দু-হাতের পাতায় শীতের শিরশির অনুভূতি।

গ্রেসাস গড, হেনরি বিড়বিড় করে বলল, আকাশটা রাস্তায় ঠেকে যাবে নাকি? নরকের শয়তানরা আজ সব বেরিয়ে পড়েছে।

উইণ্ডস্ক্রিনের বাইরে নজর করে পল্লব দেখল, মেঘলা আকাশ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে রাস্তার ওপর। পল্লবকে চোখ মেরে গ্রেগরি বলল, ভয় পেও না ব্রাদার, সুস্থ হয়ে যাবে।

কথা বলার সময়ে গ্রেগরির বিশাল মুখের টানটান চামড়ায় রেখা, অভিব্যক্তি জাগছে না। শুধু ওর চোখের তারা দুটো কথার সঙ্গে ঝলমল করে, ঝিমিয়ে পড়ে। গ্রেগরি বলল, গত শীতেও তোমার মত একজন রোগীকে, তার আলসার অপারেশনের কথা ছিল, টিবির চিকিৎসার জন্যে অপারেশনের দু-দিন আগে তাকে ব্রমটনে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার ধারণা হয়েছিল, বেঁচে যাবে সে। তাকে সে কথা আমি বলেও ছিলাম। কিন্তু বেচারি...।

মুখে আপসোসের চুকচুক শব্দ করে সে বেচারি যে কবরে গেছে বুঝিয়ে দিল গ্রেগরি।

গ্রেগরির কথা শুনে ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে পল্লব অন্যমনস্ক হতে চাইছে। নির্জন, ফাঁকা রাস্তার দুপাশে ধোঁয়াটে কুয়াশায় ঢাকা খাঁখাঁ, শূন্য মাঠ, কাঠি কাঠি লম্বা গাছ, গাছের গুঁড়িতে শ্যাওলা, তলায় পচা পাতার স্তূপ। স্থির কুয়াশায় চোখ রেখে গ্রেগরি বলল, বরফ পড়বে।

গ্রেগরির কথা পল্লব শুনতে চাইছে না। তার মনে পড়ছে ব্যারেটের কথা। গতকাল রাতে ওয়ার্ডে টহল দিতে এসে পল্লবকে চাপা গলায় ব্যারেট বলেছিল,

টিউবারক্লোপিস্ ইনফেকশনের কথাটা তোমার চেপে যাওয়া উচিত হয় নি। ভেরী স্যাড। বুকে টিবির জীবাণু নিয়ে অপারেশন হলে সাঙ্ঘাতিক ক্ষতি হয়ে যেত তোমার।

ব্যারেটের কথায় অপমানে লাল হয়েছিল পল্লবের মুখ। সে যে যক্ষ্মা-রোগী, তার বুকে টিবির জীবাণু বাসা বেঁধে আছে, এ খবর পল্লব জানত না। কথাগুলো বলতে না পেরে অসহায় চোখে ব্যারেটের দিকে তাকিয়ে ছিল সে। পল্লবের মুখে দেখে কিছু একটা অনুমান করে ব্যারেট বলেছিল, টেক ইট ইজি। ব্রমটনে টিবির চিকিৎসা খুব ভাল হয়। আমার ধারণা দেড়, দুমাসের মধ্যে পুরোপুরি সেরে যাবে তুমি। তারপর অপারেশন।

দেড়-দুমাস শব্দদুটো শুনে পল্লবের চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে গেল পৃথিবী। আরও দু-চার কথা বলে ব্যারেট চলে যাবার কিছুক্ষণ পরে ওয়ার্ডের আলো নিভে হালকা সবুজ বাতি জ্বলে উঠল।

গ্রেগরির অনর্গল কথা পল্লবের কানে ঢুকছে না। গত রাত দুঃস্বপ্নের মত এখনও তার মাথায় বিষ নিঃশ্বাস ছড়াচ্ছে। ওয়ার্ডে সবুজ আলো জ্বলে উঠতে পল্লব দেখল, সাবেনি-হিল ঘুমিয়ে পড়লেও বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে মোজেস। লিণ্ডার সঙ্গে একজন নতুন নার্স, শ্বেতাঙ্গিনী ওষুধের গাড়ি ঠেলে ঘুরছে। দুটো ঘুমের বড়ি চাইল মোজেস। হিল নিল পার্গেটিভ, জোলাপ। চার্ট দেখে রোগীদের ওষুধ বিলি করল দুই নার্স। যন্ত্রণায় মাথা ছিঁড়ে পড়ছিল পল্লবের। তার মনে হচ্ছিল মাথার ব্রহ্মতালুতে একটা বিষাক্ত সাপ ছোবল মেরেছে। মাথা থেকে সাপে কাটার বিষযন্ত্রণা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। দেড়-দুমাস শব্দ দুটো ভুলতে পারছিল না সে। তার হাতে ছাব্বিশ-সাতাশ দিন সময় আছে, 'দেড়-দুমাসের হিসেব সে করবে কীভাবে? যক্ষ্মা সারার আগেই সে মরে ফৌত হয়ে যাবে। অপারেশনের সুযোগ আর তার হবে না। অক্ষম, অসহায়, অভিমান, ক্ষোভে ক্রমশ জটিল, কুটিল হয়ে গেল তার চিন্তা। তার মনে হল, বিনি পয়সায় তাকে অপারেশন না করার জন্যেই হাসপাতাল থেকে কায়দা করে ভাগিয়ে দিচ্ছেন কলিন্স। টিবি না হওয়া সত্ত্বেও তাকে টিবি রোগী সাজিয়ে কাল ব্রমটন হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু তাকে এড়াতে কলিন্স এত কৌশল করছেন কেন? তার মত বেআইনী, বেওয়ারিশ রোগীকে সরাসরি হাসপাতাল থেকে বার করে দেওয়া যায়। তা না করে একটা হাসপাতাল থেকে আর একটায় পাঠাবার দরকার

কী ? এ নোংরা কৌশল, চালাকি কলিন্সের মত একজন উদার, নামী সার্জেন করতে পারেন না। এসব করার সময় কই তাঁর ? তাছাড়া গলায় পক্ষাঘাত, বোবা হয়ে যাওয়ারও একটা কারণ নিশ্চয় আছে। কারণ আর কিছুই নয়, তার টিবি হয়েছে। কাল রাতেই প্রথম ডানদিকের বুকে জমাট, ছুঁচোল ব্যথা অনুভব করল পল্লব। মাথার মধ্যে ক্লান্তি, উদ্বেগ, হতাশার সঙ্গে কাজ করছিল রাগ, অভিমান। কার বিরুদ্ধে, কেন রাগ, অভিমান, প্রশ্ন করলে সদুত্তর জানা ছিল না পল্লবের। তবু এই জটিল অনুভবগুলোকে মন থেকে সে ছেঁটে ফেলতে পারল না। কলিন্সের মত একজন বিখ্যাত, অভিজ্ঞ সার্জেন, যিনি পল্লবের তিনমাস পরমায়ুর কথা বলে দিতে পারেন, এবং যে বচন অমোঘ, অনিবার্য হার্টের পাশে ফুসফুসে টিবি রোগের খোঁজ পেতে তাঁর এত সময় লাগল কেন ? অপারেশন ছাড়া যার পরমায়ু আর একমাসও নয়, মৃত্যুর যার সাতাশ দিন বাকি, তাকে কেন দেড়, দু-মাসের চিকিৎসায় জুড়ে দিলেন তিনি ? এত দেরি করা তাঁর উচিত হয়নি। মনের আলোড়ন, আক্ষেপের মধ্যে পল্লবের হঠাৎ মনে হল, তাহলে কি আমার হার্টে কোন রোগ নেই ? আমার সব রোগের উৎস কি আমার পোকা ধরা ফুসফুস ? শুরু থেকে কি আমি ভুল চিকিৎসার শিকার হয়েছি ?

কথাগুলো ভেবে পল্লবের ক্ষোভ অভিমান আবার ঘন হল। তার মনে হল, পৃথিবীর সেরা বিশেষজ্ঞরা সকলে একচক্ষু হরিণ, নিজের বিষয় ছাড়া আর কিছু জানে না, বুকের আধখানার চিকিৎসায় সে তুখোড়, বাকি আধখানায় সে হাতুড়ে। দুঃখে, ক্ষোভে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল তার। কিন্তু হতাশা, দুঃখেও সৌভাগ্যের ফিকে সোনালি একটা রেখা দেখতে পেল পল্লব। হার্টের বদলে তার লাং-অসুস্থ হয়ে থাকলে নব্বই দিনের সময়সীমাও বাতিল হয়ে যায়। যদি তাই হয়, তাহলে সে যক্ষ্মা রোগের বীজাণুকে মুখে রক্ত উঠলেও স্বাগত জানাবে। আতঙ্ক, অস্থিরতা থেকে মুক্তির একটা পথ পেয়ে পল্লবের যুক্তি, বুদ্ধি একটু স্বাভাবিক হল।

কিন্তু সে টিবি রোগী, আগে থেকে এও রোগের কথা জেনেও অপারেশনের জন্যে চেপে গেছে, ব্যারেটের এ অভিযোগ পল্লব নাকচ করেছিল। সবুজ আলোর দিকে তাকিয়ে নিজের মনে সে বলেছিল, আমি টিবি রোগী নই। কখনও ছিলাম না। যে রোগ আমার হয়নি, তার খবর কেন আমি গোপন করব ? কিন্তু আমার থুথু সোয়াবে টিবির জীবাণু এল কোথা থেকে ?

এ প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব না পেলেও নানা আবছা সম্ভাবনাকে পল্লব উড়িয়ে দিতে পারেনি। বরং সেই সম্ভাবনাগুলোকে নিজের এই ব্যাধির ন্যায্য কারণ হিসেবে দাঁড় করাতে চাইল সে। বেশি করে তার মনে পড়ল টিবি রোগী, দুই বন্ধু, পার্থ আর অমূল্যর কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ে তার সঙ্গে একই বছরে পার্থ পড়ত। পার্থর বিষয় ছিল, পলিটিকাল সায়েন্স, পল্লব পড়ত কমার্স। বিষয় আলাদা হলেও পার্থর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কম ছিল না পল্লবের। বলা যায়, কমার্সের যে কোন ছাত্রের সঙ্গে বন্ধুত্বের চেয়ে একটু বেশিই ছিল। একই ছাত্র সংগঠনের কর্মী ছিল পল্লব আর পার্থ। ঘনিষ্ঠতার সেটাও ছিল একটা কারণ। পল্লবের চেয়ে সংগঠক, বক্তা হিসেবেও পার্থ অনেক ভাল ছিল। দমদম গোরাবাজারের কাছে কোথাও থাকত সে। পুজোর ছুটির পর বিশ্ব-বিদ্যালয় খুললে পল্লব শুনল, পার্থর টিবি হয়েছে। খবরটা শুনে প্রথমে আমল দেয়নি পল্লব। ক্লাস শুরু একহপ্তা পরেও পার্থ যখন এল না, তখন ঠিকানা যোগাড় করে তার বাড়িতে গিয়েছিল সে।

দরমার বেড়া, টিনের ছাউনি দুটো ঘরের সেই বাড়িতে অভাব, দারিদ্র্যের বিকট চেহারা দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিল পল্লব। সদর দরজার পাশে ডানহাতের প্রথম ঘরে তক্তপোশে শুয়েছিল পার্থ। শুয়েছিল বললে ভুল হয়, তক্তপোশে পাতা ময়লা বিছানায় মিশে গিয়ে ছল সে। পার্থর বিধবা মা পল্লবকে দেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই পল্লব শুনল অষ্টমী পুজোর দিন থেকে প্রায় একমাস পার্থ শয্যাশায়ী। ডাক্তার দেখেছে। কিন্তু ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রের ওষুধ, পথ্যের আয়োজন হয়নি। ভিজে গলায়, ধীরে সংসারের আর খুঁটিনাটি খবর পার্থর মা শুনিয়েছিলেন পল্লবকে। পার্থ ছিল বাড়ির বড় ছেলে। আরও তিনজন ছোট ভাইবোন ছিল তার। পার্থর টুইশনি আর মা, বোনদের সেলাই, বোনার রোজগারে না চলার মত করে সংসার চলত। সেই সংসারে রাজরোগ।

চাঁদা তুলে, দিনের পর দিন নিজের হাতে সেবা করেও পার্থকে বাঁচাতে পারেনি পল্লব। বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন বন্ধুও পল্লবের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। তাদের অনেকে পালা করে অসুস্থ পার্থর পাশে থেকেছে। সবচেয়ে বেশি থেকেছে পল্লব। দু-একজন হিসেবী বন্ধু পল্লবকে বলেছিল, খুব ছোঁয়াচে রোগ কিন্তু।

হঠাৎ তুষার পড়তে শুরু করল। চলন্ত অ্যাম্বুলেন্সে বসে পল্লব দেখছে

সাদা কাশফুলের মত তুষারকণা হাওয়ায় নেচে নেচে নেমে আসছে মাটিতে। সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে যেন পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে। অ্যাম্বুলেন্সের গতি কমিয়ে হেঁড়ে গলায় গ্রেগরি গান ধরেছে। গানটা ইংরেজী, না আফ্রিকান, না বুঝলেও শুনতে খারাপ লাগছে না পল্লবের। কিন্তু গান শোনার মত মানশিক স্থিতি, স্বস্তি তার নেই। কাল রাত থেকে শুধু একটা প্রশ্ন, কবে কখন আমার বুকে টিবি জীবাণু ঢুকল, খোঁচাচ্ছে তাকে। রাতের সে প্রশ্ন অ্যাম্বুলেন্সেও তাকে ছাড়েনি। তুষারপাত, নিগ্রো, ড্রাইভারের গান, সমস্ত কিছু ছাপিয়ে সে প্রশ্ন এক বিরাট জিজ্ঞাসার মত চোখ পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রোগ গোপন করার অভিযোগ তুলে ব্যারেট পরোক্ষে তাকে তঞ্চক, মিথ্যেবাদী, যা সে নয়, তাই বানিয়ে দিয়েছে।

আর একজন টিবি রোগী অমূল্যর কথা মনে পড়ল পল্লবের। অমূল্য বন্ধু না হলেও ঘনিষ্ঠ ছিল পল্লবের। মেদিনীপুরের ছেলে অমূল্য বাগমারির বস্তিতে একটা ঘরভাড়া নিয়ে একা থাকত। ডালহৌসির একটা চায়ের দোকানে সামান্য চাকরি করত সে। টিবি রোগে ধরল অমূল্যকে। পুরনো অফিস ছেড়ে তখন নতুন একটা চাকরিতে ঢুকেছে পল্লব। অফিস ছুটির পর রোজ বাগমারির বস্তিতে অসুস্থ অমূল্যকে দেখতে যেত সে। দু-তিন ঘণ্টা সেখানে থেকে রাত দশটা, এগারটায় বাড়ি ঢুকত। রবিবার বা ছুটির দিন হলে সকালে গিয়ে বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যে গড়িয়ে যেত। অমূল্যকে বাঁচাতে তিন-চার মাস খুব দৌড়ঝাঁপ করেছিল পল্লব। প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল অমূল্য।

কার শরীরের রোগ জীবাণু তার ফুসফুসে ঢুকে ডেরা গেড়েছিল, পল্লব জানে না। জানার উপায়ও ছিল না। আসলে এরকম যে হতে পারে, পল্লব ভাবেনি। সেই নির্বোধ বন্ধুপ্রীতি, উদারতার মাসুল দিতে হচ্ছে তাকে। রোগটার আভাস যে সে পায়নি, জোর গলায় একথা বলতেও আজ তার দ্বিধা হবে। দেড় বছর আগে রোগের আভাস পেয়েও সে গায়ে মাখেনি। এক দুপুরে বেসিনে মুখ ধুতে গিয়ে গলা থেকে সামান্য রক্ত পড়েছিল। অফিস বোঝাই লোক। তাড়াতাড়ি কল খুলে বেসিন ধুয়ে ফেলেছিল পল্লব। সহকর্মীদের কিছু জানাতে সঙ্কোচ হয়েছিল তার। সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরে কথাটা বলতে পাড়ার চেনাজানা এক ডাক্তারের কাছে তাকে প্রায় জোর করে পাঠিয়েছিল অনিতা। গলা থেকে রক্ত পড়ার খবর শুনে স্টেথো দিয়ে পল্লবের বুক, পিঠ পরীক্ষা করে ডাক্তার বলেছিল, পেট গরম, ডাব, মিছরির জল খান।

সাত, দশ দিন ডাব, মিছরির জল খেয়ে রক্তের কথা ভুলে গিয়েছিল পল্লব। তারপর দু-চার মাস অন্তর কফ্ থুথুর সঙ্গে মাঝে মাঝে রক্তের ছিটে দেখেও তোয়াক্কা করেনি সে। অফিস যাবার পথে পরপর কয়েকদিন ডাব খেয়ে নিয়েছে। ফলে ডাবের ওপর তখন এমন বিশ্বাস রেখেছিল, যে বন্ধুদের কারও মুখ, গলা থেকে রক্ত পড়লে ডাব খাওয়ার পারমর্শ দিত পল্লব।

নিজের বোকামি, হাতুড়েপনাতে আজ অনুতাপ হচ্ছে পল্লবের। বোকামির মূল্য দিতে দেড়-দুমাস ব্রমটন হাসপাতালে থাকতে হবে তাকে।

দেড়-দুমাস আমি কী বাঁচব, পল্লব ভাবে, হয়ত আমার হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, দুটোই ঘায়েল হয়ে আছে। কিছুতেই রেহাই পাব না আমি। বাঘ অথবা কুমীর খেয়ে ফেলবে আমাকে।

পল্লবের আবার মনে হল, মৃত্যু অমোঘ, অনিবার্য, তাকে নিয়ে মৃত্যু, ইঁদুর, বেড়াল খেলায় যেভাবে একটা হুলো বেড়াল দুটো থাবার মাঝখানে বন্দী ইঁদুরকে নিয়ে খেলা করে, একবার ছেড়ে দেয়, আবার লেজ ধরে হিড় হিড় করে টেনে আনে, মেতেছে, তার দৌড় মাপছে মৃত্যু।

নির্জন, ভিজে, কুয়াশা ঢাকা রাস্তায় প্রবল তুষারপাতের মধ্যে চলন্ত অ্যাম্বুলেন্সে বসে পল্লবের ধারণা হল, যে তার টিবি নয়, হার্টের রোগ নয়, আরও বড় ব্যাধি ক্যান্সার হয়েছে। কণ্ঠনালীতে ক্যান্সার হলে মানুষ যে বোবা হয়ে যায়, কয়েকদিন আগে একটা ইংরেজী ম্যাগাজিন পড়ে সে জেনেছে। এক ভয়ঙ্কর দুর্ভাবনায় গুটিয়ে যাচ্ছে পল্লব। নিজের মনে সে বলল, ভাবনার শেষ নেই। আমি আর ভাবব না।

নিজেকে সে বোঝাল, শান্ত থাক। এত ব্যাকুলতা ভাল নয়। সাধারণ আঙ্কিক নিয়মের বাইরে পৃথিবীতে অনেক কিছু ঘটে। অপেক্ষা কর, দেখ। এখনও অনেক শেখার আছে তোমার।

ফাঁকা রাস্তায় অ্যাম্বুলেন্সে গ্রেগরির পাশে বসে পল্লব চেঁচিয়ে বলতে চাইল, আমার টিবি হয়নি, ভুল করছ তোমরা।

তার গলা থেকে শব্দ বেরল না। শরীরটা হঠাৎ থরথর করে কেঁপে উঠতে তার দিকে আড়চোখে তাকাল গ্রেগরি। তার সামনে উইণ্ডস্ক্রিনের ওপর নিঃশব্দে ওয়াইপার চলছে। জল আর বরফের নকশা, আলপনা উইন্ডস্ক্রিনের কাঁচের ওপর তৈরি হয়ে পলকে মিলিয়ে যাচ্ছে। আবার ফুটে উঠছে নতুন নকশা,

আলপনা। পল্লব বোবা। তার কিছু বলার নেই, ভাবা বা করার নেই, সে যেন মুখ বুজে বধ্যভূমির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তবু সে নিজেকে বোঝাচ্ছে, বোকামি কর না। অনেক দুঃখ-কষ্ট মানুষকে সইতে হয়। জেতার জন্যেই মানুষ সব সহ্য করে। নিজেকে নিয়ে এত উতলা না হয়ে লড়ে যাও।

গ্রেগরির কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে সোজা হয়ে বসল পল্লব।

ব্রমটন হাসপাতালের রাজপ্রাসাদের মত বিশাল বাড়ির তিনতলার যে ওয়ার্ডে পল্লবের জায়গা হল, তার নাম ফোলিস্ গ্যালারি। ঝকঝকে, পরিষ্কার ফোলিস গ্যালারিতে থাকা, খাওয়ার রাজসিক ব্যবস্থা প্রায় বিলাস-বহুল স্বাস্থ্যনিবাসের মত। একটা হলঘরে মুখোমুখি চারটে বেডের দুটোয় আগে থেকে দুজন রোগী ছিল। পল্লব হল ওয়ার্ডের তিননম্বর রোগী। হলঘরের সামনে ঢাকা বারান্দার বাঁ পাশে রোগীদের বসার ঘর, ডানদিকে অফিস। বসার ঘরের কাচের দরজায় লাল কালিতে লেখা, শুধু টি বি রোগীদের জন্য। সুস্থ লোকের এ ঘরে ঢোকা নিষেধ। বিকেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সামনে গাছপালায় ভরা বিরাট মাঠের মাঝখানে রঙ ওঠা দোতলা বাড়িটার দিকে তাকিয়ে পল্লব দাঁড়িয়ে আছে। গতকালও ভিজিটিং আওয়ার শুরু হবার আগে সে দাঁড়িয়েছিল এখানে। গাছপালায় ঘেরা এই মাঠ, দোতলা বাড়ি, মাঠের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা পাথরের মূর্তির মত গুটিকয় বিষণ্ণ ঘোড়াকে অনেকক্ষণ ধরে সে দেখেছিল। আজও ভেজা, সবুজ মাঠের মধ্যে চার-পাঁচটা ঘোড়া পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। এই বাগান, ঘেরা মাঠ, দোতলা বাড়ি নিয়ে যে একটা আস্তাবল, পরশু ফোলিস গ্যালারিতে এসে টেডের মুখ থেকে পল্লব শুনেছে। খুব অবাক হয়েছিল কথাটা শুনে। পরশু শেষ বিকেলে কুয়াশা ঢাকা গাছগাছালি, বাগান, মাঠ, একটা দোতলা বাড়ির চেয়ে ঝাপসা আলোয় নির্জন সেই তৃণভূমিতে পাথরের তৈরি তিন-চারটে ঘোড়ার মূর্তি দেখে কোন ব্যাখ্যা পায়নি সে। আস্তাবল সম্পর্কে ধারণা না থাকায়, বলা যায়, ভিন্ন ধারণা থাকায় স্থির মূর্তিগুলোকে স্ট্যাচু, শিল্পীর গড়া ভাস্কর্য, পাথরের ঘোড়া ভেবেছিল সে। ঘন কুয়াশার মধ্যে অনড়, নিশ্চল, ঘোড়াগুলোর দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে ভাস্কর্যের ছাপ ছিল। তাদের গলা, শরীর, পা, লেজে নড়াচড়া, প্রাণের কম্পন ছিল না, অথচ ভারি জীবন্ত দেখাচ্ছিল তাদের। জীবন্ত হলেও বিষাদ ঘিরে ছিল তাদের। কারও

দিকে কেউ তাকাচ্ছে না, ঘাসে রুচি নেই, প্রতিটি ঘোড়াই স্বয়ংসম্পূর্ণ, একা, নিঃসঙ্গ। এই মেঘ বৃষ্টি, কুয়াশা, তুষার, শীতলতার মধ্যে দিন-রাত একা দাঁড়িয়ে থাকা পাথরের মূর্তি ছাড়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তবু সামান্য ধাঁধা ছিল বলেই ঘোড়াগুলো নড়ে উঠবে, চলতে শুরু করবে, এ প্রত্যাশায় প্রায় আধঘণ্টা মাঠের ওপর নজর রেখেছে পল্লব। নাহ্ সেরকম কিছু ঘটে নি। পল্লব তখন ভেবেছে, চারটে জ্যান্ত ঘোড়া, শীতে, দুর্যোগে মাঠের মধ্যে হঠাৎ পাথর হয়ে গেছে। ঘোড়াগুলোর সঙ্গে কোথায় যেন নিজের মিল খুঁজে পেল পল্লব। হাইডপার্কের সেই সন্ধ্যের কথা মনে পড়তে নিজের মনে সে বলল, আমিও পাথর হয়ে যেতে পারতাম! আধঘণ্টা পরে সুন্দরলাল আসবে। রোজই আসছে সে। তার বাড়ি থেকে ব্রমটন হাসপাতাল অনেক দূরে, দশ-বার মাইলের কম নয়। সর্দি, কাশি, রাতের ব্যথায় অসুস্থ সুন্দরলাল রোজ আসে। পল্লব নিষেধ করেও ঠেকাতে পারেনি তাকে। কথা বলার শক্তি থাকলে, কেন রোজ আসার দরকার নেই, বুঝিয়ে বলতে পারত পল্লব। কিন্তু পারেনি। কাগজে লিখে আর কতক্ষণ কথা চালানো যায়? তাছাড়া আসতে বারণ করায় গতকাল বিকেলে সুন্দরলাল এখন মোক্ষম একটা জবাব দিয়েছিল যে, পল্লব কথা খুঁজে পায়নি। সুন্দরলাল বলেছিল, কলকাতার এক বস্তিতে এক টিবি রোগীর কাছে, যার সঙ্গে রোজ দেখা করতে তুমি নিয়ে গিয়েছিলে আমাকে। পরে চিঠি লিখে তুমি জানিয়েছিলে, সে সুস্থ হয়েছে। অসুস্থ সেই ছেলেটির নাম ভুলে গেলেও, ঘটনাটা আমার মনে আছে।

সুন্দরলালের কথায় থ হয়ে গিয়েছিল পল্লব। তার মনে পড়ল সুন্দরলাল যখন তিন-চার দিনের জন্যে কলকাতায়, তখন অসুস্থ অমূল্যের কাছে তাকে একদিন নিয়ে গিয়েছিল পল্লব। সুন্দরলাল সে ঘটনা মনে রেখেছে। কথা না বাড়ালেও পল্লব ভেবেছিল, বন্ধুপ্রীতি উদারতা তার সঞ্চয়। এ সঞ্চয় জমা থাকে। রঞ্জন গতকাল এসেছিল। আজও আসবে। শান্তা আসবে কিনা পল্লব জানে না। তবে রোজ ফৌলিস গ্যালারিতে সে ফোন করে পল্লবের খবর নেয়। পরশু সন্ধ্যেতে সুন্দরলাল চলে যাওয়ার পরে বসার ঘরে বন্ধ দরজায় লেখা বিজ্ঞপ্তি পড়ে, পল্লব যখন ভাবছে যে, সত্যিই সে টিবি রোগী কিনা, তখনই দরজা ফাঁক করে উইলিয়াম বলল, হ্যাল্লো, কাম ইন প্যাল, ভেতরে এস।

উইলিয়ামের আদরের ডাক শুনে বসার ঘরে ঢুকেছিল পল্লব। সোফা,

কৌচ সেণ্টার টেবিল, রঙিন টেলিভিশন, বই ঠাসা কাঁচের দুটো আলমারি, পায়ের তলার নরম কার্পেট, ইলেকট্রিক হিটার জ্বলছে, ছিমছাম, পরিচ্ছন্ন বসার ঘর। বাইরে অন্ধকার তখন ঘন হয়েছে। চারপাশ, হাসপাতাল নিস্তব্ধ। ফিকে সবুজ আলো জ্বলছিল ঘরে। সেই অল্প আলোয় প্রথমে কিছু দেখতে পেল না পল্লব। চোখ সয়ে যেতে হিটারের সামনে ইজিচেয়ারে চোখবুজে এলিয়ে থাকা টেডকে নজর করল সে। পল্লব ঢুকতে তার সঙ্গে চেয়ারে বসেই হ্যান্ডশেক করে নিজের পরিচয় দিল টেড। তারপর বলল, আস্তাবলের দিকে তাকিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলে তুমি।

পল্লব হাসল। একটা মারদাঙ্গা মার্কিনী ছবি হচ্ছে টিভিতে। ছবি দেখার জন্যে গদিমোড়া একটা কৌচে বসল পল্লব। হাল্কা কোন বিষয়ে সে গভীরভাবে ডুবে থাকতে চাইছে। উইলিয়ামের সঙ্গে মাঝেমাঝে চাপা গলায় টেড কথা বলছে। ঘরের পরিবেশ অচেনা, অন্যরকম। একটু অস্বস্তিবোধ করল পল্লব। পাখির মত পা ফেলে মাঝবয়সী, গম্ভীর একজন নার্স থার্মোমিটার হাতে ঘরে ঢুকে এক সেকেন্ড ভ্রূ কুঁচকে টেডকে দেখল। চোখ বুজে ঝিমোচ্ছিল টেড। ঠোঁট সরু করে উইলিয়াম সুরেলা, তীক্ষ্ণ শিস বাজানো শুরু করতে টেড ধড়ফড় করে সোজা হয়ে বসে হাসিমুখে নার্সকে বলল, গুড ইভিনিং ডিয়ার।

টেডকে কোন জবাব না দিয়ে পল্লবের জিভের তলায় থার্মোমিটার রেখে নার্স বলল, কাল থেকে সকাল-সন্ধ্যে নিজের টেম্পারেচার দেখে টিকিটে লিখে রাখবে। তোমার বিছানার ওপর দেওয়ালে থার্মোমিটার আছে।

পল্লব ঘাড় নাড়ল। ওয়ার্ডে চারটে বিছানার ওপর দেওয়ালে ঝোলানো শিশিতে ডেটলজলে চারটে থার্মোমিটার বিকেলে পল্লব দেখেছে। চারজন রোগীর চারটে থার্মোমিটার দেখে অবাক হয়েছিল। কারণটা এখন বুঝল। পল্লবের মুখ থেকে থার্মোমিটার নিয়ে ঘরের জোরালো আলো জ্বেলে টেম্পা-রেচার দেখল নার্স। এক সেকেন্ড টেডের দিকে তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করল, কীসব আজেবাজে টেম্পারেচার লিখে রেখেছেন টিকিটে?

নিরীহ গলায় টেড বলল, নো ডিয়ার, থার্মোমিটার দেখেই লিখেছি।

বিরক্ত মুখে নার্স বলল, আপনার দেখা অনুযায়ী সকালে দুশ চল্লিশ এবং বিকেলে তিনশ কুড়ি ডিগ্রি টেম্পারেচার ছিল আপনার।

উইলিয়াম ঠোঁট টিপে হাসি চাপছিল।

কাল থেকে আমিই দেখব আপনার টেম্পারেচার বলে নার্স ঘর থেকে চলে গিয়েছিল।

ভ্যাকুয়াম কব্জা লাগানো ঘরের দরজা বন্ধ হতে হো হো করে হেসেছিল উইলিয়াম। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারের পেছন থেকে হুইস্কিভরা একটা কাঁচের গ্লাস বার করেছিল। চেয়ার ছেড়ে উঠে বই-এর আলমারির পাশ থেকে পেটমোটা একটা হুইস্কির বোতল তুলে নিয়ে নিজের খালি গ্লাসে ঢালল টেড। পল্লবকে প্রশ্ন করল, চলবে নাকি?

প্রশ্ন শুনে চমকে গিয়েছিল পল্লব। ইশারায় জানিয়েছিল, সে খাবে না।

কেন, প্রশ্ন করল টেড।

পল্লব হাত দিয়ে তার হৃৎপিণ্ড দেখাল।

গুলি মারো হার্টে, টেড বলল।

পল্লব ফুসফুসের ওপর হাত রাখল।

গুলি মারো ফুসফুসে, টেড বলল।

পল্লবের কাতর, অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে নরম গলায় টেড বলল, আজ আমার জন্মদিন। আমার স্বাস্থ্যের জন্যে কি এক চুমুক তুমি খাবে না?

পল্লব কী বলবে ভেবে পেল না। জীবনের শেষ বাইশ-তেইশ দিনের হিসেব রাখতে তার ইচ্ছে নেই। যা হয় হোক, নিয়ম, নিষেধ নিয়ে সে আর মাথা ঘামাবে না। ইশারা, ইঙ্গিত বন্ধ করে শান্ত হয়ে বসে থাকল সে। পল্লবের জন্যে গ্লাস আনতে দৌড়ে ওয়ার্ডের দিকে চলে গেল উইলিয়াম।

এখন যে কোনও মুহূর্তে সুন্দরলাল আসবে। এই খোলা বারান্দায় ঠাণ্ডার মধ্যে পল্লবকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে খুশি হবে না। টিবির জন্যে হার্ট অপারেশন বন্ধ হয়ে যেতে সুন্দরলাল ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। তার মুখ দেখে পল্লবের মনে হয়, এক গোপন আতঙ্ক বুকে নিয়ে সে ঘুরছে। তাড়াতাড়ি পল্লবের অপারেশন না হলে সে গুরুভার আতঙ্ক সুন্দরলালের বুক থেকে নামবে না। হিলহিলে শীতল হাওয়ায় কাঁপুনি লাগলেও বারান্দা ছেড়ে পল্লব নড়ল না। কুয়াশাঢাকা মাঠের মধ্যে পাথরের ঘোড়াগুলোকে নজরে রেখে সে দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়াগুলো হাঁটবে চলবে, ঘাসে-মুখ দেবে, এ প্রত্যাশায় ধড়ফড় করছে তার বুক। অবোধ চারটে জীবকে একবার

একপলকের জন্য সজীব, সপ্রাণ, গতিময় দেখলে সে যেন একটা মস্ত বাজি জিতে যাবে। পাথর হয়ে যাওয়া চারটে জীবের শাপমুক্তির জন্যে নিঃশব্দ ব্যাকুল প্রার্থনায় আবিষ্ট হয়ে থাকে সে।

বসার ঘরের দরজা ফাঁক করে পল্লবকে ডাকল বিল, কাম অন প্যাল।

সাড়া দিল না পল্লব।

আরও একবার ডেকে বিল ঘরে ঢুকল। পরশু রাতের ঘটনা মনে পড়ল পল্লবের। তার হাতে হুইস্কির গ্লাস দিয়ে টেড বলেছিল, বিলের সঙ্গে আমার এত দোস্তির কারণ হল, আমাদের পেশা। আমরা দুজনেই ড্রাইভার। আমি চালাই ট্রাক, বিল চালায় দুধের গাড়ি, বাড়ি বাড়ি দুধ বিলি করে।

উইলিয়ামের পোশাকী নাম বিল। ঝাঁকড়া চুল বিলের বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। নিউজিল্যাণ্ডে তার বাড়ি। কাজে খোঁজে এদেশে এসে থেকে গেছে। গায়ের রঙ সাদা হওয়ায় এদেশে বসবাসের অনুমতি পেতে তার অসুবিধে হয়নি। মুখে টুকরো হাসি নিয়ে বিল শুনছিল টেডের গল্প। পল্লবকে টেড বলছিল, একবার হার্ট অপারেশন হবে জেনে তুমি কুঁকড়ে গেছ, অথচ বাইশবার আমার বুক, পেট ছুরিতে ফালাফালা হয়েছে। দেখবে?

কাউকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে জ্যাকেট খুলে, শার্টের বোতাম খুলে দুপাশে সরিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল টেড। হাল্কা সবুজ আলোয় টেডের বুক, পেট দেখে আঁতকে উঠেছিল পল্লব। টেডের বুক, পেট জুড়ে বাইশ, না বিয়াল্লিশ, গুনতে না পারলেও দগদগে লাল, খয়েরি কালো নানা রঙের কাটা দাগ, ক্ষতচিহ্ন মাকড়সার জালের মত ফুটে আছে। পল্লবের মনে হয়েছিল টেডের বুক, পেট থেকে এখনই সব যন্ত্রপাতি, নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসতে পারে।

পল্লবের মুখের চেহারা দেখে খ্যা খ্যা করে হেসে উঠল টেড। তখনই পল্লব নজর করল টেডের ডানহাতের কব্জির ওপরে সবুজ কালিতে আঁকা উড়ন্ত একটা বাজপাখির উল্কি। দুচোখের মণি লাল, তীক্ষ্ন ঠোঁট ধারাল নখ, পাখিটা খুব জীবন্ত। উল্কির তলায় খোদাই করা, আনডিফিটেবল অপরাজেয়।

সিসটার জনসন আসছে।

বিল খবরটা দিতেই বোতল-গ্লাস চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। পল্লবের গ্লাস পা দিয়ে সতর্কভাবে চেয়ারের নিচে ঠেলে দিয়েছিল বিল।

কাচের বন্ধ দরজার বাইরে সিস্টার জনসনকে দেখা যেতে টেড একটা খারাপ গালাগাল দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকল জনসন। পঁয়ত্রিশ, ছত্রিশ বয়স সিস্টার জনসন সুন্দরী এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্না। ঘরে ঢুকে সকলকে একসঙ্গে, হ্যালো, বলল জনসন। তারপর একবার জোরে শ্বাস টেনে গম্ভীর হল তার মুখ। এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে পল্লবকে জনসন বলেছিল, তুমি ছাত্র, মনে হয় ভাল ছেলে, সঙ্গদোষে নষ্ট হয়ে যাবে না আশাকরি।

জনসনের কথায় লজ্জা, সংকোচে ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল পল্লব। আর কথা না বলে জনসন ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পল্লবকে টেড বলল, মাগীর পছন্দ হয়েছে তোমাকে।

কথাটা বলে খ্যা খ্যা করে হাসল টেড।

নিজের খালি গ্লাস আবার ভরে টেডের দিকে উঁচু করে তুলে বিল বলল, দীর্ঘ, সুখী জীবন।

বিল আর টেডের সঙ্গে সেই সন্ধ্যেতেই বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল পল্লবের।

পল্লবের কাঁধে হাত রেখে রঞ্জন প্রশ্ন করল, ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে কেন ?

প্রথম চমকে গেলেও রঞ্জন, শান্তাকে একসঙ্গে দেখে খুশি হল পল্লব। ওয়ার্ডে গিয়ে বসার পর রঞ্জন প্রশ্ন করল, সুন্দরলাল আসবে না ?

ঘাড় নেড়ে পল্লব জানাল, আসবে।

প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে একটা টিফিন ক্যারিয়ার বার করে শান্তা বলল, তোমার জন্যে লুচি এনেছি। সঙ্গে আছে আলুরদম, বেগুনভাজা।

শান্তার কথায় চকচক করে উঠল পল্লবের দু-চোখ।

শান্তা বলল, এখনও গরম আছে। খেয়ে নেবে নাকি ?

পল্লব রাজী জেনে প্লেটে খাবার সাজিয়ে দিল শান্তা। প্রায় একডজন লুচির সঙ্গে সেই পরিমাণ আলুরদম, চারটে বড় বেগুনভাজা দেখে পল্লব হাসল। চারটের বেশি লুচি সে খেতে পারবে না। কথাটা আভাসে জানিয়ে রঞ্জন-শান্তার সামনে প্লেটটা তুলে ধরল সে। ঘরে ঢুকল সুন্দরলাল, মুমু। সুন্দরলালের মুখ দেখে সে যে আজও ব্যথিত, মুষড়ে আছে, বুঝতে পারল পল্লব।

আপনাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

রঞ্জন কথাটা বলতে সুন্দরলাল বলল, ভাল যাচ্ছে না শরীরটা।

মুমু সুন্দরলালের সামনে খাবারের প্লেট হাতে শান্তা গিয়ে দাঁড়ালেও

দু-জনের কেউ লুচি, আলুরদম খেল না।

সুন্দরলাল বলল, সিসটার জনসনের সঙ্গে আসার সময় দেখা হয়েছে। সে বলল, আজ সকালে ডাক্তার বার্টন তোমাকে দেখে গেছে। পরশু মান্টু টেস্ট হবে তোমার।

টেড ঘরে না থাকায় চেয়ারে বেশ আয়েস করে বসে কথা বলছে সুন্দরলাল। গতকাল টেডের কথা, আচরণে খুব চটে গিয়েছিল সুন্দরলাল। টিবি রোগীদের বসার ঘরে সুন্দরলালকে নিয়ে বসতে আপত্তি করেছিল পল্লব। সুন্দরলাল শোনেনি। খানিকটা জোর করেই পল্লবকে নিয়ে সেখানে বসেছিল। সুন্দরলালের জোর করার কারণ ছিল। পল্লবের মুখোমুখি নিজের বিছানায় বসে বান্ধবী নোরার সঙ্গে প্রেম করছিল বিল। সে প্রেম খুব নিরীহ নিরামিষ নয়। চুমু খাওয়ার চকাস চকাস শব্দ শুনে পেছন ফিরে বসে থেকেও সুন্দরলালের কপাল কুঁচকে গিয়েছিল। পল্লবও স্বস্তি বোধ করছিল না। কিন্তু বসার ঘরে টেড, তার সঙ্গও সুন্দরলালের ভাল লাগবে না। তাই ওয়ার্ডে বসতে চেয়েছিল পল্লব। শেষ দুপুরেই আজ আমার জন্মদিন, বলে সবুজ আলো জ্বেলে হুইস্কি নিয়ে বসার ঘরে একটা কোচ দখল করেছিল টেড। ঘরে ঢুকে পল্লবের পাশে সোফায় বসে মদের গন্ধ পেয়ে আবার ভ্রু কুঁচকে গেল সুন্দরলালের। মদে কোন সংস্কার না থাকলেও হাসপাতালে মদ খাওয়া ভাল লাগেনি তার। আড়চোখে টেডকে একবার দেখে সুন্দরলাল বলেছিল, গত রাতে তোমার স্ত্রী কলকাতা থেকে আমার বাড়িতে ফোন করেছিল। তার মনের কথা ভেবে তোমার সব খবর না জানিয়ে ওপর ওপর কিছু কথা আমি বলেছি। ভোকাল কর্ড প্যারালিসিস, টিবির কথা একদম চেপে গেছি। আমার কাছ থেকে ব্রমটনের ফোন নাম্বার নিয়েছে সে। যে কোনদিন তার ফোন পাবে তুমি। কিন্তু কথা বলবে কী করে।

অনিতার ফোন পাবে শুনে বিষাদে, সুখে ভিজে উঠেছিল পল্লবের মন। ভয়ও পেয়েছিল। স্বামী বোবা হয়ে গেছে, জেনে যাবে অনিতা। ভারী দুঃখের হবে সে ঘটনা। সেন্টার টেবিল থেকে ফ্যামিলি অব ম্যান নামে একটা ইংরেজী সাময়িক পত্রিকা নিয়ে, সেটা খুলে মুখ আড়াল করে হুইস্কি খাচ্ছিল টেড। সুন্দরলালের চোখে চোখ পড়ায় মুচকি হেসে টেড বলেছিল, আজ আমার জন্মদিন।

টেডের কথায় বিরক্তিতে ঘাড় ঝাঁকিয়ে নিচু গলায় সুন্দরলাল বলেছিল,

মাতালদের রোজই জন্মদিন।

সুন্দরলালের কথায় অবাক হয়ে পল্লব ভেবেছিল, মানুষটা এক নজরে টেডকে চিনল কী করে ?

পল্লবের জন্যে একটা প্লাস্টিকের থলিতে আপেল কোকাকোলার একটা বড় বোতল কয়েকটা জামাকাপড় এনেছিল সুন্দরলাল। থলি হাতে বস্গার ঘরে চলে এসেছিল সে। এখন খেয়াল হতে বলল, থলিটা তোমার বিছানায় রেখে আসি।

সুন্দরলালকে উঠতে না দিয়ে থলিটা পল্লব ওয়ার্ডে রেখে এসেছিল। বিল আর তার বান্ধবীর দিকে তাকায়নি। ফিরে এসে পল্লব দেখল, সুন্দরলালের সঙ্গে আড্ডা জমাবার চেষ্টা করছে টেড। পাত্তা দিচ্ছে না সুন্দরলাল। পল্লবকে দেখিয়ে টেড হঠাৎ সুন্দরলালকে প্রশ্ন করল, এটা কি তোমার ছেলে।

রাগে মুখ লাল হয়ে উঠলেও কথা বলল না সুন্দরলাল। কয়েক সেকেণ্ড পরে টেড একই প্রশ্ন করতে সুন্দরলাল বলল, হ্যাঁ, আমার ছেলে।

এক মুহূর্ত কিছু ভেবে টেড বলেছিল, আমি ভেবেছিলাম তুমি অবিবাহিত।

রাগ সামলাতে বন্ধ কাঁচের দরজার দিকে তাকিয়েছিল সুন্দরলাল। এক চুমুক হুইস্কি খেয়ে টেড বলল, তোমার মত আমিও অবিবাহিত। আমারও কয়েকটা ছেলেপুলে আছে। তোমার সঙ্গে আমার অনেক মিল, বন্ধুত্ব হতে পারে। বন্ধুত্বের নামে আমার সঙ্গে একটু হুইস্কি খাও।

বেশ চেঁচিয়ে টেডকে গোল্লায় যাও বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল সুন্দরলাল। তারপর পাঁচ-সাত মিনিট পল্লবের বিছানার পাশে বসে চলে গিয়েছিল সে।

সুন্দরলাল, রঞ্জন খুব নিবিষ্ট ভঙ্গিতে কথা বলছে। মুমুর সঙ্গে ছেলেমানুষী গল্পে মেতে উঠেছে শান্তা। তার পোশাকে, মুখে একটু বাড়তি চাকচিক্য লাবণ্য দেখতে পেল পল্লব। ভেতরে ভেতরে খুশিতে শান্তা যেন মজে উঠছে। সুন্দরলাল বলছে, গাঁটে-গাঁটে বাতের ব্যথা, সর্দিকাশির পাশাপাশি পরশু রক্ত পরীক্ষা করে জানলাম, ব্লাড সুগার বেড়েছে।

রঞ্জন প্রশ্ন করল, এতো উতলা হচ্ছেন কেন ?

কারণ আছে।

জবাব দিয়ে দু আঙুলে নিজের কপাল টিপে ধরল সুন্দরলাল। বেশ কাহিল দেখাচ্ছে তাকে। এক লহমা সুন্দরলালকে দেখে রঞ্জন বলল, আমার মনে হয়, পল্লবের টিবি হয় নি। সব মানুষের শরীরেই রোগের ব্যাকটেরিয়া, টিবির ব্যাকটেরিয়া সমেত অল্পবিস্তর থাকে। এগুলো রোগ প্রতিষেধক, অ্যান্টিবডি, সংক্রমণ থেকে শরীরকে বাঁচায়। তৃতীয় বিশ্বের মানুষের শরীরের ভিতরে টিবি ব্যাকটেরিয়া পরিমাণে সামান্য বেশি থাকাতে সাদা ডাক্তাররা সমস্ত ভারতীয়, পাকিস্তানী, বাংলাদেশী, শ্রীলঙ্কাবাসীকে টিবি রোগী ভাবে। এটাও এক ধরনের জাতিবৈরী।

সুন্দরলাল সায় দিতে উৎসাহ পেয়ে রঞ্জন বলল, আমি যা বলছি, ঠিক প্রমাণ হবে। বেশিদিন এখানে থাকতে হবে না পল্লবকে।

রঞ্জনের কথায় সাহস, আত্মবিশ্বাস, আশা পাচ্ছে পল্লব। যদি তাই হয়, দেখা যায় যে, তার টিবি হয় নি, তাহলে জীবনের বাইশ-তেইশ দিন আঁকড়ে ধরে আবার নতুন আশায় বুক বাঁধবে সে। কিন্তু তা বোধহয় হবে না। টিবির চিকিৎসা বলতে, আজ সকালে, ডাক্তার বার্টন এসে দেখে যাওয়া ছাড়া, কিছু হয় নি। চার-পাঁচবার শোয়াব, থুথু রোজ পরীক্ষার জন্যে নেওয়া হচ্ছে। কী ভরসায় রঞ্জন এত জোরের সঙ্গে কথা বলছে, বুঝতে পারল না পল্লব।

ছ-টা বাজার পাঁচ-সাত মিনিট পরে বাড়ি ফেরার জন্যে সকলে উঠে পড়ল। রঞ্জন বলার আগেই সুন্দরলাল মুমুকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার কথা শান্তা নিজে বলেছে। রঞ্জনও যাবে শান্তার গাড়িতে। অক্সফোর্ড স্ট্রিট টিউব স্টেশনে নামার কথা রঞ্জন আজ বলল না।

ওয়ার্ড ফাঁকা হয়ে যেতে পল্লবের হঠাৎ মনে হল, সুন্দরলালের উতলা হওয়ার কারণ কী? রঞ্জনের প্রশ্নের জবাবে সুন্দরলালের কথা শুনে খটকা লেগেছে পল্লবের। কারণ আছে, বলে কী বোঝাতে চাইল সুন্দরলাল! অসুস্থ সুন্দরলাল কি নিজে শয্যাশায়ী হওয়ার ভয় পাচ্ছে? ভয় পাওয়ার লোক সুন্দরলাল নয়। বাতের ব্যথায় উ আ করে, বিশ্রী আবহাওয়াকে গাল দেয়, নিজের রোগ নিয়ে এটুকুই তার মাথা ঘামানো। পল্লব ভাবে, কারণ কি আমি? আমার তিনমাস পরমায়ুর কথা জেনে গিয়ে সুন্দরলালও কি হিসেব রাখছে? কী করে জানাল সুন্দরলাল?

পল্লবের মনে হল, তিনমাসের পরমায়ু নয়, অন্য কোন কারণে সুন্দরলাল উদ্বিগ্ন। পল্লবের চিকিৎসার সঙ্গে সে কারণ জড়িয়ে আছে। অনেক ভেবেও কারণ শব্দটার রহস্য ভেদ করতে পারল না পল্লব। ডিনারের ট্রলি আসার শব্দ পেয়ে ওয়ার্ডে ঢুকল প্রথমে বিল, পেছনে টেড। ফৌলিস গ্যালারির টিবি রোগীদের জন্যে সকালের ব্রেকফাস্ট থেকে রাতের ডিনার পর্যন্ত খাবারের এলাহি আয়োজন। ঢাকালাগানো গরম বাক্সে সকালের ব্রেকফাস্টে আসে কর্নফ্লেকস্, দুধ, ডিম, বেকন্, কলা, টোস্ট. মাখন, মার্মালেড। ডিম, টোস্ট, কলা বেকন ইচ্ছে করলে একজোড়া-দুজোড়া এমনকি তিনজোড়া নেওয়া যায়। দুপুরের খাবারে সুপ থেকে শুরু করে মাংস, সব্জি, আইসক্রিম, ডেসার্ট, ফল অপর্যাপ্ত। ডিনারেও তাই। কিন্তু বারই পল্লব খুব সামান্য খায়। মাখন, মার্মালেড সে ছোঁয় না। ফলও বেশিরভাগ পড়ে থাকে। রাংতার প্যাকেটে মোড়া মাখন, মার্মালেডের দুটো কিউব পল্লব রোজ বিলকে দেয়। টেডও দেয়। প্যাকেটগুলো বিল তার বান্ধবীর জন্যে জমিয়ে রাখে।

খাবারের গাড়ি ঘরে ঢুকতে তার পাশে গিয়ে বিল দাঁড়িয়েছে। সুপের ড্রামের ঢাকা খুলতেই ভকভক করে গরম বাষ্প বেরচ্ছে। তিনটে বাটিতে তিনজনকে গরম সুপ দিয়ে রুটি, মাংস, সব্জি প্লেটে সাজাচ্ছে খয়েরি পোশাক নার্স। তিন প্লেট খাবার তিনজনের টেবিলে দিয়ে গাড়ি চলে গেল। মন দিয়ে খাচ্ছে টেড। রোগে ভুগে মুখ ফ্যাকাসে, শরীর রক্তহীন হলেও এই পঞ্চাশ বছর বয়সে তার হাতের চওড়া হাড়, দেহের মজবুত গঠন অটুট আছে। গত তিনমাস ফৌলিস গ্যালারিতে টেড আছে। বাউন্ডুলে স্বভাব অবিবাহিত টেডের সাতকুলে কেউ নেই আরও তিন-চার দফায় আগেও টেড এখানে থেকে গেছে। প্রতি রবিবার বিকেলে চার্চের এক পাদরি ছাড়া গত তিন মাসে টেডের সঙ্গে কেউ দেখা করতে আসে নি।

সুপ শেষ করে খালি বাটি সরিয়ে ছুরি, কাঁটা ধরে মাংস কাটছে টেড। বিল কথা বললেও টেড শুনছে না। সকলের আগে খাওয়া শেষ করে বসার ঘরের দিকে চলে গেল টেড। বিল আর পল্লব প্রায় একসঙ্গে খাওয়া শেষ করল। পল্লবকে ডেকে টেডের কাছে গেল বিল।

পল্লব ঘরে ঢুকতে টেড বলল, চল, ঘুরে আসি।

টেডের দিকে একবার তাকিয়ে পল্লব সোফায় বসল। গত তিন সন্ধ্যেতে ডিনারের পর ফৌলিস গ্যালারির পেছনের ঘোরানো লোহার সিঁড়ি দিয়ে টেড

আর বিলকে নেমে যেতে দেখেছে পল্লব। ওদের তৃষ্ণা অপরিসীম। হাসপাতালে খেয়ে আবার রাস্তার পাবে যায়। রাত দশটায় সিসটার জনসনের টহলের আগে ফিরে বিছানায় শুয়ে থাকে। অন্ধকার, ঘোরানো লোহার সিঁড়ি দিয়ে নামার আগে বিল বলল, জনসন এসে গেলে বলবে, আমি টয়লেটে গেছি।

আমিও, টেড বলল, দু-জনে একসঙ্গে।

হঠাৎ পল্লবের কাঁধে হাত রেখে টেড প্রশ্ন করল, এত মনমরা হয়ে থাকো কেন? হার্ট অপারেশন কি খুব দুঃখের? মোটেই নয়। বরং তোমার হার্ট, হৃদয়, হার্ট অন্তঃকরণ আছে, এ কথা তুমি বুক ফুলিয়ে বলতে পার।

আবছা হেসে নিজের মনে পল্লব বলল, বেশি হলে আর উনিশ-কুড়ি দিন আমি বাঁচব। হৃদয়ের কথা বলার সময়, সুযোগ কই? কাঁধ ছেড়ে পল্লবের হাত ধরে টেড বলল, আজ তোমার জন্মদিন। চল আমাদের সঙ্গে, তোমার দীর্ঘজীবন কামনায় এ সন্ধ্যের সব খরচ আমার।

পল্লব গেল না। সিঁড়ি দিয়ে ওরা নামতে থাকল।

•

রাতে ডিনারের গাড়ি আসার আগে পল্লবের কব্জির ওপরে সকালে দেওয়া মান্টু পরীক্ষার রঙ-দেখতে এল জনসন। খাবারের গাড়ি আসার শব্দ পেয়ে জনসনের আগে বসার ঘর থেকে ওয়ার্ডে ফিরেছে টেড, বিল। আলোর সামনে তুলে পল্লবের ডান হাতের কব্জির ওপরে লাল কালিতে আঁকা চৌকো ঘরটা জনসন দেখল। ইঞ্জেকশনের বিন্দুর চারপাশে কলম দিয়ে সকালে এ ঘর বার্টন এঁকে দিয়েছিল। ঘরের মাঝখানটা আধখানা আলুর মত ফুলে লালচে হলেও সিঁদুরে লাল হয় নি। সেরকম লাল হলে, পল্লবের যে টিবি হয়েছে, সে সিদ্ধান্ত পাকা হবে। পল্লবের হাত ছেড়ে দিয়ে টেড আর বিলকে জনসন বলল তোমাদের জন্যে সুখবর আছে। পরশু সকালে বাড়ি যেতে পারবে তোমরা।

কথাটা শুনে বিলের মুখে ভাবান্তর হল না! টেডের মুখ শুকিয়ে গেল। সে দিকে নজর না করে পল্লবকে জনসন বলল, মেরামতের জন্যে ফোলিস গ্যালারি খালি করা হবে। তোমাকে পাঠানো হবে দোতলার ডানবার ওয়ার্ডে।

জনসন চলে যেতে চিন্তিত, গম্ভীর মুখে বসে আছে টেড। খাবারের গাড়ি ঢুকতেও সে তাকাচ্ছে না। গাড়ি চলে যাবার পর সুপের বাটি, গরম খাবারের

দিকে সে এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন তার খিদে-রুচি সব গেছে।

খেয়ে নাও।

বিলের কথা শুনে তার দিকে তাকিয়ে টেড বলল, হাসপাতাল থেকে কোথায় যাব আমি? বাড়ি, ঘর, যাবার জায়গা আমার নেই।

খুব চিন্তিত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে টেডকে। সিগারেট খাওয়ার পর টুকরো উচ্ছিষ্ট সিগারেটের কাগজ ছিঁড়ে তামাক বার করে পাউচে ঢোকাচ্ছে টেড। পোড়া সিগারেটের তামাকে ওর পাউচ সবসময়ে ভর্তি থাকে। মদের সঙ্গে ওই তামাকে বানানো সিগারেট ফুঁকলে নাকি বাড়তি মৌজ হয়। নিকোটিনে হলুদ হওয়া হাতের আঙুলের দিকে তাকিয়ে টেড বলল, সোসাল সিকিউরিটির টাকা হাসপাতালে থাকার জন্যে বন্ধ হয়ে গেছে। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সে টাকা পেতে কয়েকদিন সময় লাগবে। টাকা যা দেয়, তাতে আমার চলে না।

এক সেকেন্ড থেমে বিলকে টেড বলল, তোমার কাছে ধার হয়ে গেছে অনেক।

বিল কথা বলল না।

ডান হাতের কব্জির ওপরে ফুলে ওঠা মাংসের ঢিবিটা খুঁটিয়ে দেখছে পল্লব। শরীরে যক্ষ্মার জীবাণু থাকলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই মাংসপিণ্ড টকটকে লাল হয়ে উঠবে। ঠিক কতটা লাল হলে যক্ষ্মা বোঝা যায়, পল্লব জানে না। কিন্তু মাংসের ঢিবিটার চারপাশে যে লাল, দেখতে পাচ্ছে সে। সকালে ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর থেকে দুপুর পর্যন্ত রঙ একরকম ছিল। বিকেলে অল্প বদলেছে। কাল সকালেই পরিষ্কার ধরা পড়বে তার টিবি হয়েছে কিনা, সে খবর। যদি জানা যায়, তার টিবি নেই, বোবা হওয়ার কারণ আর কোন অসুখ, তাহলেই বা কী লাভ? কোন লাভ নেই। বরং ক্ষতিই হল তার। মূল রোগের চিকিৎসা অপারেশনের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল। নব্বই দিনের গাঁট সে পার হতে পারল না। এক অস্থির আকুলতায় বন্ধ জানলার কাঁচের বাইরে আস্তাবলের দিকে তাকাল সে। আস্তাবলের ফাঁকা মাঠে কয়েকটা আলো মিটমিট করে জ্বলছে। গাছপালা, দোতলা বাড়ি, চারটে ঘোড়া, কিছুই দেখতে পেল না পল্লব। হিমবাহের মত এক প্রবল কান্নায় তার চেতনা, অস্তিত্ব, সুখ, অসুখ, বিষাদ, আনন্দ ডুবে যাচ্ছে।

পাউচ থেকে তামাক বার করে সিগারেট বানাচ্ছে টেড। তার এমন নিরানন্দ মুখ, এখানে আসার পর থেকে পল্লব কখনও দেখেনি। বিকেল শেষ হবার

আগেই আজ বিলকে নিয়ে পাবে চলে গিয়েছিল টেড। তখন ভিজিটিং আওয়ার। দর্শনার্থীদের কথা, গুঞ্জনে হাসপাতালের বিশাল বাড়িটা জেগে ছিল। পল্লবের কাছে তখনও কেউ আসেনি। বারান্দায় গদিমোড়া একটা চেয়ারে বসে আস্তাবলের দিকে তাকিয়েছিল পল্লব। চেয়ারে বসে আলোয় ঝলমলে লম্বা, টানা করিডোরের দিকে চোখ যাচ্ছিল তার। চকচকে মেঝেতে নার্সদের ব্যস্ত ছায়া, ভিজিটরদের নিঃশব্দ যাওয়া-আসা। হঠাৎ আলোকিত বিশাল হাসপাতাল বাড়ি একটা রাজপুরী, চারপাশের পরিবেশ অন্যরকম হয়ে গেল। সময়, পটভূমি, মানুষ, ঘটনাস্রোত বাস্তব, অথচ ঘোলাটে, বিচ্ছিন্ন এবং একাকার, পল্লব টের পেল দিবাস্বপ্ন দেখছে সে। ধবধবে সাদা পাথরে তৈরি নির্জন, শব্দহীন রাজপুরীর জানলাগুলো হুহু হাওয়ায় আছড়ে বন্ধ হচ্ছে, আবার খুলে যাচ্ছে। প্রাসাদে কোথায় মানুষ আছে ভেবে রাজপুরীর লম্বা অলিন্দ ধরে পল্লব হেঁটে চলেছে। পাথরের সেই প্রাসাদ আস্তে আস্তে কর্পূরের মত নীল আকাশে মিলিয়ে গেল।

দেখতে খুব কষ্ট হলেও চেয়ার ছেড়ে বসার ঘরে যেতে পারল না পল্লব। মাথার মধ্যে অবশ মগ্নতা, কানের দুপাশের শিরার দপদপানি, শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছিল। তার চোখের সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল পাতলা ঘোলের স্রোত।

একটা সিগারেট শেষ করে নতুন একটা বানাচ্ছে টেড। বিছানায় শুয়ে ফ্যামিলি অব্ ম্যান, পত্রিকা পড়ছে বিল। পল্লবের মনে হচ্ছে, তার হৃৎপিণ্ডের জখম ভালভ্ দুটো টিবি জীবাণুতে খেয়ে নিচ্ছে। সিগারেট ধরাতে গিয়ে অদ্ভুত শব্দ করে একটা হেঁচকি তুলে ঘরের বেসিনের সামনে দৌড়ে গেল টেড। হুড়হুড় করে বমি শুরু হল তার। বিছানা থেকে নেমে বিল গিয়ে দাঁড়িয়েছে টেডের পেছনে। বিলের পাশে দাঁড়িয়ে পল্লব দেখল, বেসিন টকটকে লাল, সাদা বেসিনের ভেতর এইমাত্র যেন তরল আলতার একটা শিশি ভেঙে গেছে। আরও কয়েকঝলক রক্ত উগরে টেড হাঁপাচ্ছে।

বিল বলল, নার্সকে ডেকে আনি।

নো।

ঘুরে দাঁড়িয়ে কথাটা বলে আবার বেসিনের ওপর ঝুঁকে দাঁড়াল টেড।

বেসিন ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যেতে বিছানায় গিয়ে চোখ বুজেছে টেড।

এত রক্ত দেখে পল্লবের মাথা, চারপাশের দেওয়াল ঘুরছে। ঘরের ভেতরটা

ধারণ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে হঠাৎ। টেডের বিছানার পাশে চেয়ারে রয়েছে তার জ্যাকেট, টাই। টেডের দিকে তাকিয়ে তার বুকের ধীর স্বচ্ছন্দ ওঠানামা দেখা গেলেও, সে জেগে না ঘুমিয়ে পড়েছে, পল্লব বুঝতে পারল না। টেডের কব্জির উল্কি, আনডিফিটেবল খোদাই দেখে পা টিপে বিছানায় ফিরে এল পল্লব।

সকাল আটটায় বার্টনের সঙ্গে ফুসফুস বিশেষজ্ঞ ম্যাকডোনাল্ড এসে যখন পল্লবের হাতের কব্জিতে সুপুরির মত ফোলাটা দেখে গেল, সারারাত ছটফট করে তখন সে তন্দ্রাচ্ছন্ন, চোখ মেলে তাকাতে পারছে না। দুই ডাক্তার চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে ওয়ার্ড থেকে চলে যাবার পরেও পল্লব শুয়ে থাকল অনেকক্ষণ। তারপর চোখ খুলে প্রথমে হাতের ফোলা জায়গাটা দেখল সে। নাহ, সিঁদুরের মত লাল হয় নি, অল্প লালচে, তার বেশি নয়। বন্ধ কাঁচের বাইরে চোখ রেখে সে চমকে গেল। রোদে ঝলমল করছে পৃথিবী। তার মনে হল চোখের ভুল। কিন্তু বিল, টেড গায়ে গা লাগিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। আস্তাবলের দিকে তাদের দৃষ্টি। বিল বলল, দে আর মুভিং, ঘোড়াগুলো চলছে।

এখনই আমাদের এক পাঁইট বিয়ার খেয়ে সূর্যদেবকে স্বাগত জানানো উচিত।

বিলের কথা, টেডের কথা, ঘোড়াগুলো হাঁটছে, রোদ উঠেছে, বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে পল্লবের। আকাশ-নীল পোশাক, মুখে স্নিগ্ধ হাসি সিসটার জনসন ওয়ার্ডে ঢুকে পল্লবকে বলল, কলকাতা থেকে তোমার ফোন।

বিছানা থেকে পল্লব লাফিয়ে নামতে জনসন বলল, ক্রেজি, মাইণ্ড ইওর স্টেপস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইওর হার্ট। সাবধানে হাঁটো।

ফোন পাওয়ার চমক, আনন্দে বিছানা থেকে নেমেই উঠে গেল। বিবর্ণ, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে পল্লবের মুখ। কে ফোন করেছে? নিশ্চয়ই অনিতা। তাকে কী বলবে পল্লব? তার কথা বলার শক্তি নেই, সে বোবা হয়ে গেছে। অনিতা উতলা, ব্যস্ত হবে ভেবে এতদিন কোন খবর, যা পুরোটাই দুঃসংবাদ তাকে জানায়নি পল্লব। যে কটা চিঠি লিখেছে, জানিয়েছে, ভাল আছি।

এখন তার মনে হচ্ছে, বোকার মত নিজের ফাঁদে সে ধরা পড়ে গেছে। বারান্দা পেরিয়ে আস্তাবলের দিকে নজর না করে অফিসে ঢুকল পল্লব। রিসিভার তুলে কানে, লাগাতে, অপারেটর বলল, কথা বলুন।

সাতসমুদ্র তের নদীর বিজবিজ, কিরকির ধ্বনি ছাপিয়ে ভেসে এল কাঁচ গলা,

হ্যালো, হ্যালো বাপি, আমি বুবাই। কেমন আছ, কেমন আছ তুমি?

কথা নয়, শব্দ নয়, ঢেউ ভেঙে পড়ছে পল্লবের কানে। উত্তেজনায়, আবেগ অস্থির পল্লব চেঁচিয়ে উঠল, ভাল আছি, আমি ভাল আছি।

তার গম্ভীর, ভারী গলার শব্দে গমগম করে উঠল অফিসঘর। সিসটার জনসন অবাক চোখে দেখছে পল্লবকে। অফিসের দরজার মুখে দাঁড়িয়ে বার্টন বলল, মাইগড, হি হ্যাজ এ ফ্যাসিনেটিং ভয়েস। দারুণ কণ্ঠস্বর!

কোন কথা, প্রশংসা পল্লবের কানে ঢুকছে না।

অনিতা প্রশ্ন করল, অপারেশন কবে?

খুব তাড়াতাড়ি। দু-চার দিনের মধ্যে।

অপারেশনের খবর সুন্দরলাল যেন তখনই আমাদের ফোনে জানান। জানাবেন।

রিসিভার রেখে উত্তেজনায়, সুখ, দুঃখে থরথর করে পল্লব কাঁপছে। তার কাঁধে হাত রেখে বার্টন বলল, ডাক্তার ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন, কোন এক সময়ে তোমার টিবি হলেও এখন নেই, তুমি সুস্থ। হার্ট অপারেশনে কোন অসুবিধে হবে না।

বার্টনের কথার মধ্যেই টলমল করে কেঁপে গেল পল্লবের শরীর। মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগে তাকে দু-হাতে ধরে ফেলল বার্টন। শ্বাসকষ্টে জিভ বেরিয়ে আসছে পল্লবের। পল্লব বুঝতে পারছে, এ নিছক কষ্ট নয়, সে নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। কলকাতার সেই বিভীষিকার রাতের ছবি তার মনে পড়ছে।

বার্টন, জনসন এবং আর একজন নার্স প্রায় পাঁজাকোলা করে তুলে তাকে বিছানায় নিয়ে এল। বেডের তিনপাশের পর্দা টেনে ঘেরটোপ বানিয়ে ফেলল জনসন।

বার্টন বলল, অক্সিজেন।

ঝড়ের গতিতে জনসন, নার্স বেরিয়ে গেল ওয়ার্ড থেকে। দুহাতে বিছানার চাদর মুঠোয় ধরে খাবি খাচ্ছে পল্লব! দুমড়ে, মুচড়ে যাচ্ছে তার শরীর। তার বুকের উপর হাত রেখে হৃৎপিণ্ড ম্যাসাজ করছে বার্টন। পল্লব বিড়বিড় করল, আই অ্যাম ডাইং, মরে যাচ্ছি আমি। নব্বই দিন শেষ হতে এখনও পনের, ষোল দিন বাকি। কিন্তু নব্বই দিন মানে আঙুলে গোনা নব্বই দিন নয়, বেশি, কম হতেই পারে। আমার পরমায়ু কমের দিকে।

অক্সিজেন সিলিন্ডারের সঙ্গে কার্ডিওস্কোপ, ওষুধ, ইঞ্জেকশেন নিয়ে একজন কার্ডিওলজিস্ট এসে গেল। নাকে অক্সিজেনের নল গুঁজে দিয়ে পল্লবকে পেথিডিন ইঞ্জেকশন দিল ডাক্তার। পল্লবের ছটফটানি, খাবি খাওয়া ধীরে ধীরে কমে এল। সে শুনল, বার্টনকে কার্ডিওলজিস্ট বলছে হার্টের অবস্থা অ্যালারমিং, খুব খারাপ, রোগীর শেষ অবস্থা, টারমিনেটিং স্টেজ। মিঃ কলিন্সকে জানিয়ে দিন।

ঠিক সাতদিন পরে ব্রমটন হাসপাতাল থেকে আবার হার্ট হাসপাতালে পল্লব যখন ফিরল, তখন সে ধুঁকছে। সকাল, সন্ধ্যে গত দু-দিন পেথিডিন ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছিল তাকে। কিন্তু কড়া ঘুমের ওষুধেও কাজ হয়নি। দশ, পনেরো মিনিট ছাড়া ঘুম ভেঙে গেছে তার। ঘুম না হলেও ওষুধের নেশায় আচ্ছন্ন, বুঁদ হয়েছিল সে। যে কোন মুহূর্তে দম ভেটে মরে যাওয়ার অস্বস্তি, কষ্টে সে ছটফট করছে। তার মধ্যেই টেড আর বিল হাসপাতাল ছেড়ে চলে গেল। যাবার আগে বিল বলল, কিপ ওয়েল প্যাল, ভাল থেক। স্ট্রেচারে তুলে খুব সতর্কভাবে হার্ট হাসপাতালে নিয়ে আসা হল তাকে। ফোলিস গ্যালারি থেকে স্ট্রেচারে শুয়ে বেরবার সময়ে আস্তাবলের মাঠে নজর পড়তে পাথরের ঘোড়াগুলোর মধ্যে দুটোকে মুহূর্তের জন্যে ঘুরে বেড়াতে দেখল সে। হার্ট হাসপাতালে ওয়ার্ডের যে বিছানায় পল্লব ছিল, সেখানে নতুন রোগী আসায় হপ্‌কিন্সের খালি বেড়ে তার জায়গা হল।

দুপুর শেষ হতেই সুন্দরলাল, ডরোথি, মুমু এল। গত দু-দিন ব্রমটন হাসপাতালে যখনই পল্লব চোখ মেলেছে, চোখের সামনে সুন্দরলাল বা রঞ্জনকে দেখেছে। পর্দা ঢাকা ঘেরাটোপের মধ্যে একটা চেয়ারে ফ্যাকাসে, শুকনো মুখে সুন্দরলাল, রঞ্জন যে কত সময় কাটিয়েছে পল্লবের ধারণা নেই। সময়, চারপাশ, দিন, রাত, লণ্ডন, কলকতা, বাড়ি, হাসপাতালে আলাদা করার মত বোধ, জ্ঞান তার ছিল না। গুলিয়ে ফলার পাকিয়ে গিয়েছিল সব। সকালে হার্ট হাসপাতালে আসার পর তার শরীর-মনের বিশেষ উন্নতি হয়নি। মার্টেলি, ব্যারেট এসে তাকে দেখে পেথিডিন ইঞ্জেকশন বন্ধ করে নতুন কিছু ওষুধ দিয়ে গেছে। পল্লবের কথা বলার শক্তি নেই, কথা বলা বারণও, তবু তার বিছানার পাশে এসে দু-ঠোটের ওপর আঙুল রেখে চুপচাপ থাকার ইঙ্গিত করল সুন্দরলাল। ঘোলাটে চোখে সুন্দরলাল, ডরোথি, মুমুকে পল্লব দেখছে। ফিসফিস করে

সুন্দরলালকে কিছু বলল ডারোথি। তখনই একজন নার্স এসে সুন্দরলালকে বলল, দয়া করে এখনই একবার অফিসে আসুন। তার সঙ্গে চলে গেল সুন্দরলাল। করুণ চোখে পল্লবের মুখের দিকে তাকিয়ে ডরোথি দাঁড়িয়ে আছে। ভিজিটিং আওয়ার শুরু হতেই রঞ্জন, শান্তা এসে গেল। তাদের পেছনে এল্ বিনয়, জয়া, টুকাই। পল্লবের মুখোমুখি বিছানায় মোজেস, এখনও তার অপারেশন হয়নি। গভীর আচ্ছন্নতার মধ্যেও পল্লব বুঝল, যে, যেদিন মোজেসের আপারেশনের কথা ছিল, হয়নি, বাতিল হয়ে গেছে। সকালে পল্লব এখানে আসতেই বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে একবার দেখে গেছে মোজেস। পল্লবের শরীরের হাল দেখে শান্তা নিস্তব্ধ। জয়া ঠিক বুঝছে না, পল্লব কেমন আছে। বুঝলেও লাখ টাকা দামের একটা খবর পল্লবকে এখনই না বলে শান্তি পাচ্ছে না সে। পল্লবকে সে বলে যাচ্ছে, আমরা দেশে ফিরে যাচ্ছি। বোম্বেতে একটা চাকরি পেয়েছে বিনয়। দু-বছর সেখানে থাকার পর তাকে পাকাপাকি কলকাতায় পাঠিয়ে দেবে কোম্পানি।

তার উচ্ছ্বাস, কথায় ডরোথি যে গম্ভীর, শান্তার মুখে বিরক্তি, খেয়াল করছে না জয়া। সে বলল, নাম কা ওয়াস্তে একটা ইন্টারভ্যু দিতে তেইশে মার্চ বিনয় বোম্বে যাচ্ছে। তোমারা দু-জন একসঙ্গে যেতে পার। তুমি সঙ্গে থাকলে আমি একটু নিশ্চিন্ত হতে পারি। দশদিন পরেই তেইশে মার্চ।

জয়ার সব কথা না বুঝলেও শেষ কথাটা, দশদিন পরে তেইশে মার্চ, বল্লমের মত পল্লবের মাথায় বিঁধে গেল। তেইশে মার্চ নিয়ে কি একটা হিসেব করতে গিয়ে সে দিশা পেল না। বিড়বিড় করে সে বলল, জল।

তাড়াতাড়ি শান্তা জলের গ্লাস ধরল তার মুখের কাছে। ছ-টা বালিশে আধশোয়া পল্লব দু-চুমুক জল খেয়েই হাঁপিয়ে গিয়ে চোখ বুজল। মুমু, টুকাই-এর বন্ধুত্ব খুব পেকে উঠেছে। ওয়ার্ডের শেষ মাথায় ছুটোছুটি করছে তারা। গম্ভীর মুখে পল্লবের বিছানার কাছে এসে এত ভিড় দেখে চটে গেল সুন্দরলাল। মুখে কিছু না বললেও রাগ, বিরক্তি তার দু-চোখ থেকে ঠিকরে বেরচ্ছে। পল্লব ঘুমিয়ে আছে ভেবে রঞ্জনকে চাপা গলায় সুন্দরলাল বলল, কাল সকাল ন'টায় পল্লবের অপারেশন।

এই শরীরে?

অস্ফুট গলায় রঞ্জন প্রশ্ন করতে গলা আরও নামিয়ে সুন্দরলাল বলল, সে আলোচনার জন্যেই অফিস ডেকেছিল আমাকে। ডাক্তার মার্টেলকে কলিন্স

বলেছে, পল্লবের শরীর এখন যা আছে, তার চেয়ে ভাল হবে না, বরং আরও খারাপ হবে। এ অবস্থায় অপারেশন না হলে, আর সুযোগ পাওয়া যাবে না।

উদ্বেগে, দুশ্চিন্তায় সুন্দরলাল হাঁপাচ্ছে। এক মুহূর্ত থেমে দম নিয়ে সুন্দরলাল বলল, কলিন্সের ধারণা এখনই অপারেশন না হলে পল্লবের বিপদ একশভাগ, অপারেশন হলে আশিভাগ। কলিন্স জানতে চেয়েছে, আমরা কী চাই, কাল অপারেশন হলে আমরা রাজী আছি কিনা? হ্যাঁ বলে দিয়েছি আমি। সকলের মুখের দিকে এক লহমা তাকিয়ে সুন্দরলাল প্রশ্ন করল, আমি কি ভুল করলাম?

নাহ, এছাড়া কিছু করার নেই, রঞ্জন বলল।

আমিও তাই ভেবেছি, সুন্দরলাল বলল, বাঁচার সম্ভাবনা কুড়িভাগ হলেও ঝুঁকি আমাদের নিতে হবে।

বিনয়ের ঠোঁট শুকিয়ে চড়চড় করছে। কোনও কথা না বলে একটা ঢোক গিলল সে।

কাল সকাল ন-টায় অপারেশন। হাসপাতালে কাল রাতে একজনকে থাকতে হবে।

কথাটা বলে বিনয় আর রঞ্জনের মুখের দিকে সুন্দরলাল তাকাতে রঞ্জনকে শাস্তা বলল, তুমি থাকতে পারবে না?

শান্ত গলায় রঞ্জন বলল, আমিই থাকব।

আমিও থাকতে পারি, শাস্তা বলল।

নাহ, তুমি নয়, সুন্দরলাল বলল, রঞ্জনের সঙ্গে রাতে আমি থাকব।

তাকে নিয়ে, তার অপারেশন সম্পর্কে যে কথা, আলোচনা হচ্ছে, আভাসে টের পেলেও পল্লব বুঝতে পারছে না। তার হঠাৎ মনে হল, রঞ্জন, শাস্তার বিয়েতে কলাপাতায় গরম, ফুলকো লুচি, বেগুনভাজা, আলুরদম সাজিয়ে খেতে বসেছে সে।

আরও একটা রাত শেষ হল। আবার সাদা আলখাল্লা, অ্যাটোপিন, চাকা লাগানো খাট, লিফট ঘুরে অপারেশন থিয়েটারে পৌঁছে গেছে পল্লব। থিয়েটারের দরজার ওপর জ্বলন্ত লালবাতিটা দেখে হঠাৎ যেন চটকা লেগে ঘুম ভাঙল তার। তিনদিন আগে দু-হাজার মাইল দূর থেকে টেলিফোনে ভেসে আসা বুবাই-এর কথা শুনে যেভাবে তার গলার পক্ষাঘাত, জড়তা কেটে গিয়েছিল, লাল আলোর কাপটায় ঠিক সেভাবেই নিমেষে মুছে গেল তার মাথার

আচ্ছন্নতা, কুয়াশা। বাঁচার প্রবল তাগিদে সে বিড়বিড় করল, এখনও ন-দিন আমার হাতে আছে। ন-দিনের হিসেব গুণে গেঁথে বুকে না নিয়ে এক ইঞ্চি জায়গা আমি ছাড়ব না। কেউ হটাতে পারবে না আমাকে।

অপারেশন থিয়েটারে আসার আগে কেন যে সে বেঘোরে পড়েছিল, শেষবারের মত আকাশ, মাটি, গাছপালা দু'চোখ ভরে দেখে নেয়নি, ভেবে আপসোস হল তার। নিজের গাফিলতির জন্যে চোখ বুজে করুণাময়ী, সহনশীলা পৃথিবীর কাছে মাপ চাইল সে। তখনই সে দেখল, চাকা লাগানো আর একটা খাটে মোজেস শুয়ে আছে। পাশাপাশি দুটো থিয়েটারে অপারেশন হবে দু'জনের। পল্লবকে দেখে আধবোজা চোখে মোজেস শুভেচ্ছার প্রতীক বুড়ো আঙুল দেখাল। পল্লবও তাই করল। তিন, চারটে ক্যাসেট হাতে থিয়েটারের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে শার্লি। গানের ক্যাসেট হাতে এখানে শার্লিকে দেখে অবাক হল পল্লব। পল্লবের কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় শার্লি বলল, মিঃ কলিন্সের কড়া হুকুম অপারেশনের সময় বাজনা চলবে। বাজনা না বাজলে তিনি অপারেশন করতে পারেন না।

একটু থেমে মুচকি হেসে শার্লি বলল, বাজনার সঙ্গে নেচে নেচে তিনি অপারেশন করেন। বন্ধুরা তাঁকে বলে ডান্সিং সার্জেন।

থিয়েটারের দরজা খুলে মুখে সাদা ঢাকা, মাথায় সাদা টুপি, ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ হাতে অচেনা এক ডাক্তার বেরিয়ে এল।

পল্লবকে শার্লির কথা শুনতে দেখে এক সেকেণ্ড তাকিয়ে থেকে ডাক্তার বলল, হি লুকস্ রিমার্কেবলি ইমপ্রুভড্।

গলা শুনে ব্যারেটকে চিনতে পেরে পল্লব হাসল। ব্যারেট ইঞ্জেক্শন দেওয়ার পর ওয়ান, টু, থ্রি করে দশ পর্যন্ত গুণে গভীর ঘুমে ডুবে গেল পল্লব।

দারুণ কষ্ট হচ্ছিল পল্লবের। ডুব দিয়ে জলের তলায় চলে গেলে ভেসে উঠতে যেমন কষ্ট, প্রায় সেরকম। চারপাশে মরা আলো, মাথার ওপর লোহার পাহাড়ের মত বিপুল জলের চাপে ভেসে ওঠার জন্যে হাঁসফাঁস করতে করতে আবার সে তলিয়ে যাচ্ছে। দমবন্ধ হয়ে, হাত-পা ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়ার

আগে মাথার ওপর থেকে পহাড়টা এক ঝটকায় ফেলে দিয়ে ভেসে উঠল সে। ভেসে উঠেই দেখল হালকা সবুজ আলোয় ডুবে আছে একটা ঘর, চারপাশে কোনও সাড়াশব্দ নেই। এখন দিন, না রাত, সে বুঝতে পারছে না। চোখের সামনে দেওয়ালটা কাঁপছে, সরে যাচ্ছে। চোখের পাতা অসম্ভব ভারী, তাকিয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে তার। তবু দু-চোখ খুলে রাখার চেষ্টা করছে সে। তার কানের কাছে মিষ্টি গলায় কেউ বলল, ইওর অপারেশন ইজ ওভার, য়ু আর অলরাইট। খুব ভাল, সফল অপারেশন হয়েছে তোমার।

পল্লবের মাথার পাশে দুধে আলতায় গড়া টুকটুকে এক নার্স। অপারেশন হয়ে গেছে শুনে তার মাথার জমাট কুয়াশা, মেঘ, ধোঁয়া আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। আবছা সবুজ আলোয় চোখ সয়ে যেতে ঘন নীল দেওয়ালে পল্লব দেখল একটা সাদা ঘড়ি। ঘড়ির কাঁটা দুটো চিনতে পারলেও ঠিক কটা বাজে, সে বুঝতে পারল না। কিছুক্ষণ স্থির চোখে ঘড়ির দিকে সে তাকিয়ে থাকতে কাঁটা দুটো ধীরে ধীরে গলে জল হয়ে গেল। ধোঁয়াটে আলোয় সাদা ইউনিফর্ম পরা নার্সকে এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে। তার কানের কাছে মুখ এনে নার্স আবার বলল, তুমি ভাল আছ।

এতক্ষণে পল্লব স্পট বুঝতে পারছে, যে তার অপারেশন হয়ে গেছে, সবুজ আলোয় ডুবে থাকা এই ঘর, ইনটেনসিভ কেয়ার রুম। মিষ্টি একটা গন্ধ তার নাকে এসে লাগল। দুপাশের দেওয়াল আগের মতই গলে যাচ্ছে জমাট, বাঁধছে। ঘড়ির কাঁটা দুটো গলে যাবার আগেই পল্লব দেখল, সাতটা দশ। সকাল, না সন্ধ্যে আন্দাজ করতে গিয়ে তার মাথায় ধোঁয়া, আলো, অন্ধকার ঢেউ তুলল। মনে হল, জল ভর্তি একটা অ্যাকুইরিয়ামের নিচে সে শুয়ে আছে। ঢেউ উঠছে অ্যাকুইরিয়ামে, চারপাশের পৃথিবী, সময় মানুষ ঢেউয়ে দুলছে।

কিছু একটা বলতে গিয়ে চোয়াল নাড়তে পারল না পল্লব। অপারেশনের আগে যে সিসের বলের কথা ব্যারেট বলেছিল, মুখের মধ্যে সেই বল অনুভব করল সে। কথা বলার উপায় নেই। তবু এই মুহূর্তে একটা কথা না বলতে পারলে সে মরে যাবে। তেষ্টায় তার মুখ, গলা বুক শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছে। সে তৃষ্ণার্ত। তেষ্টায় ফেটে যাচ্ছে তার ছাতি। একটু জল দাও, কথাটা বলার জন্যে তার সারা শরীর কাঁপছে। পায়ের দিকে তাকিয়ে পল্লব দেখল, অন্ধকার ঘরে টেবিলে ল্যাম্প জেলে দাড়িওলা একটা লোক চেয়ারে বসে বই পড়ছে। বই-এর আড়ালে আধখানা দেখা যাচ্ছে লোকটার মুখ।

ল্যামিনেট করা বই-এর চকচকে কালো মলাটের ওপর হলুদ হরফে লেখা, লাইফ অব উ থান্ট।

দাড়িওলা লোকটা উ থান্টের জীবনীতে ডুবে আছে। বই-এর নামটা পড়ে, পল্লব বুঝতে পারল, তার অক্ষরজ্ঞান, স্মৃতি অটুট আছে। দাড়িওলা লোকটা নিশ্চয়ই পুরুষ নার্স। দুটো হাসপাতালে বেশ কয়েকজন পুরুষ নার্স দেখেছে পল্লব। পল্লবের অস্বস্তি, ছটফটানি দেখে রূপবতী সেই নার্স অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে তার বুকের উপর ঝুঁকে প্রশ্ন করল, খুব কষ্ট হচ্ছে?

পল্লব উত্তর দিতে পারল না। ঘরের নীলাভ, অলৌকিক আলোয় নার্সের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল পল্লব। পিপাসায় গলা, বুক জ্বলে গেলেও জ্ঞান হওয়ার ঠিক পরে জল, বিষ। খালি পেটে জল ঢুকে পাকস্থলী মুচড়ে বমি টেনে আনে। বমির বেগে শরীরে ঝাঁকুনি, কাঁচা সেলাইয়ে টান লাগলে গুরুতর ক্ষতি হতে পারে। সেলাই ছিঁড়ে দুর্ঘটনা হয়। অপারেশনের আগে এসব জেনেও তেষ্টায় অস্থির হল সে। তার নাভিমূলে বসে কেউ জিভ ধরে টানছে, পেটের মধ্যে গুটিয়ে নিতে চাইছে জিভটা। শুকনো জিভ সেই টানে ছিঁড়ে-খুঁড়ে যাচ্ছে। কষ্টটা ইশারায় নার্সকে বোঝাতে গিয়ে পল্লব টের পেল, তার হাত-পা কয়েক ডজন নল, টিউবে বাঁধা হাতের পাতায়, কনুইয়ে ছুঁচ বিঁধে আছে। শরীরে সাড় নেই, ব্যথা নেই। ডান হাতটা সে আস্তে আস্তে তুলতে নার্স এগিয়ে এল। ইশারায় সে একটা কলম চাইতে বুঝতে পারল না নার্স। বার-কয়েক চেষ্টার পর ইঙ্গিত বঝে একটা খোলা বলপেন তার হাতে ধরিয়ে দিল। পকেট থেকে একটা ছোট নোটবই বার করে মেলে ধরল কলমের সামনে। ইংরেজীতে ওয়াটার শব্দটা খাতায় লেখার জন্যে চোখ বুজে খাতায় কলম ঘষল পল্লব। একবার, দুবার, তিনবার, কী লিখল সে, পড়তে পারল না নার্স। পল্লবের কান্না পেল। উ থান্টের জীবনী রেখে দাড়িওলা লোকটা নার্সের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। খাতার ওপর এবার জলের কেমিকেল ফর্মুলা এইচ টু ও লিখল পল্লব। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে খাতাটা দেখে এবার দুজনে বুঝল। নিজেদের দিকে তাকিয়ে হাসল তারা। লাল মিষ্টি একটা ওষুধে ভিজিয়ে কাঠিতে জড়ানো একটুকরো তুলো পল্লবের দাঁতে আলতো করে চেপে দিল নার্স। জলের মত কয়েক ফোঁটা তরল তার মুখে ছড়িয়ে গেলেও গলা ভিজল না। আরও কয়েকবার দাঁতের ওপর মিষ্টি ওষুধে ভেজানো তুলোটা নার্স

বুলিয়ে দিলেও বুকফাটা তেষ্টার উপশম, আরাম হল না। বরং আরও খর পিপাসায় তার গলা, বুক পুড়তে থাকল।

ঘরের ফিকে আলোয় ক্রমশ সয়ে যাচ্ছে তার চোখ। সে টের পেল, তার দু-পাশে দুটো বিছানায় আরও দু-জন শুয়ে আছে। পায়ের দিকে বিছানাতেও একজন রোগী। হঠাৎ হাউ হাউ কান্না শুনে মিসেস মোজেসকে দেখতে পেল পল্লব। তার ডানপাশের বিছানায় মোজেসের জ্ঞান ফিরেছে। মিসেস মোজেসের মুখে হাসি, চোখে জল। মোজেসের কানে নিচু গলায় নার্স কিছু বলতে সে দরজার দিকে তাকাল। স্বামীর সঙ্গে চোখাচোখি হতে রুমালে মুখ চেপে আবার ফুঁপিয়ে উঠল মিসেস মোজেস। ভদ্রমহিলার দুচোখে ঠিকরে পড়ছে খুশি। নিজের চোখ আর সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছে না মিসেস মোজেস। পল্লবের পায়ের দিকের বিছানায় রয়েছে একনম্বর ওয়ার্ডের তাসিয়োস। একতলার এক্স-রে, ই সি জি ঘরে তার সঙ্গে ব্রমটন হাসপাতালে যাওয়ার আগে কয়েকবার পল্লবের সঙ্গে দেখা হয়েছে। পঁচিশ, ছাব্বিশ বছরের এই গ্রীক তরুণের সঙ্গে আলাপও হয়েছে পল্লবের। ছবিতে দেখা গ্রীক দেবতার মত তাসিয়োসের সুঠাম, সুন্দর চেহারা। দাড়িগোঁফের জঙ্গলে শিশুর মত সরল, কচি মুখ। তাসিয়োসের এখনও জ্ঞান না ফিরলেও ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তার মা পাগলের মত চুমু ছুঁড়ে দিচ্ছে ছেলের দিকে। হঠাৎ হু-হু করে উঠল পল্লবের বুক। অনেক দূরে ভারতবর্ষ, কলকাতা, মনোহরপুকুর রোড, বাড়ি, বৌ ছেলেমেয়ে, আত্মীয় বন্ধুদের মনে পড়ল তার। মার্চের এই দ্বিতীয় সপ্তাহে শীত, মেঘ, বৃষ্টি কমলেও এদেশের নানা জায়গায় এখনও বরফ জমে আছে, নিষ্পত্র কঙ্কাল গাছের তলায় জমে আছে পচা পাতার স্তূপ। মেঘ, বৃষ্টি, বরফ, সাঁই-সাঁই ঠাণ্ডা হাওয়া কমলেও বন্ধ হয়নি। আকাশে সূর্য হপ্তায় দু-একদিন উঠলেও রাস্তায় মানুষ নেই। এই অচেনা শীতের দেশে সে নিঃসঙ্গ, অসহায়, একা। তার অপারেশন, বাঁচা মরার খবর এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। অপারেশন থিয়েটারের দরজায়, ইনটেনসিভ কেয়ার রুমে তার জন্যে বুকে কেউ ক্রস আঁকে না, চুমু ছুঁড়ে দেয় না কেউ।

চিন্তাটা মাথায় আসার একটু পরেই লজ্জা পেল পল্লব। খুব অকৃতজ্ঞ, স্বার্থপর মনে হল নিজেকে। সুন্দরলাল, ডরোথি, রঞ্জন, শান্তা, এমনকি জয়া বিনয়ও কম সাহায্য করেনি তাকে। তার জন্যে সুন্দরলাল, রঞ্জন যা করেছে, আত্মীয়স্বজন করে না। তাদের কথা সে ভুলবে কী করে? বাড়ির লোক,

আত্মীয় কেউ না থাকলেও এদেশে সে নির্বান্ধব নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও রোগে, শোকে, সংকটে আর পাঁচজন মানুষের মত একজন প্রিয়জনকে পাশে পেলে খুব আরাম লাগত তার।

দু-তিন মিনিট অন্তর টেম্পারেচার, রক্ত চাপ মাপছে নার্স। মিষ্টি ওষুধের বদলে একটু জল খাওয়ার জন্যে ছটফট করছে পল্লব। কয়েক ঢোক জল খেতে চায় সে। তার শব্দহীন উন্মাদনা দেখে একটু বিরক্ত হয়ে নার্স বলল, বার ঘণ্টা পরে, সকাল আটটায় জল পাবে।

মুখে চোখে অসহায় কষ্ট নিয়ে দেওয়ালের রেডিয়াম লাগানো বড় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকল পল্লব। ঘড়ির নম্বর, কাঁটা দুটো জ্বলছে। ঘড়িতে পৌনে আট মানে সন্ধ্যে শেষ হয়েছে। এক গ্লাস জলের জন্যে আরও বার ঘণ্টা, সকাল আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করার কথা ভেবে তার শরীর জুড়ে দুঃসহ যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ল।

কতক্ষণ বেহুঁশ ছিলাম, পল্লব ভাবল।

কাঁটায় কাঁটায় সকাল ন'টায় তাকে অপারেশন থিয়েটারে ঢোকানো হয়েছিল। ব্যারেট ইঞ্জেকশন দেওয়ার আগে পল্লবের নাম লেখা একটা প্লাস্টিকের ফিতে তার পায়ের গোড়ালির ঠিক ওপরে বেঁধে দিয়েছিল একজন নার্স। মাথার ওপর জ্বলছিল লাল আলো, পাশের ট্রলি বিছানায় মোজেস, ব্যারেটের ইঞ্জেকশন, ওয়ান, টু, থ্রি, একটুকরো পাথরের মত টুপ করে গভীর সমুদ্রে ডুবে গেল পল্লব।

আগুনের সাপের মত তলপেট থেকে গলায় পাকিয়ে উঠছে তেষ্টা। শরীরের ভেতরের সব রস শুষে নিচ্ছে। বৈশাখের রোদে পোড়া ঠাঠা মাঠের মত বুক জুড়ে পিপাসা। ঘড়িতে চোখ রেখে পল্লব দেখল, টুকটুক করে সরে যাচ্ছে সরু ফালি সেকেণ্ডের কাঁটা। এই কাঁটাটা প্রথম দেখল সে। সকাল আটটার আশায় ঘড়িতে আটকে গেছে তার দৃষ্টি। সরু কাঁটা নিয়মমাফিক সেকেণ্ডে একবার সরছে। বার ঘণ্টায় কত সেকেণ্ড, ষাটের সঙ্গে ষাট গুণ করে বার দিয়ে আবার গুণ করতে গিয়ে গুণফল তিনশো ষাটে এসে তারপর লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। ঘড়ির তিনটে কালো কাঁটার দিকে তাকিয়ে থেকে টনটন করছে তার চোখ। কাটা, ছেঁড়া, রক্তপাতের জ্বালা যন্ত্রণার বদলে সর্বনেশে তেষ্টার লু হাওয়ায় তার শরীর পুড়তে থাকে। সবুজ আলোয় ডুবে থাকা ঘর, দাড়িওলা নার্স, সুন্দরী নার্স, অন্য তিন বেডের রোগীরা, চারপাশের পৃথিবী, সময়

মুছে গিয়ে তার চোখের সামনে একটা ঘড়ি জেগে থাকে। মাঝে মাঝে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে একাকার, অদৃশ্য হয়ে গিয়ে আবার জেগে উঠছে ঘড়িটা। তিনটে কাঁটা খসে গিয়ে ফের জায়গা মত ফিরে আসছে।

আবছা তন্দ্রার মধ্যে হঠাৎ ডুবে যেতে ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল পল্লবের। শৈশব তার গ্রামে কেটেছে। সেখানেই তার দেশ, বাস্তুবাড়ি। বাড়ির সামনে সবুজ গাছপালায় ঘেরা সোনার পুকুরের কাকচক্ষু গভীর জল, পুকুরের পেছনের বাগানে সারি সারি নারকোল গাছে ঝুলে থাকা কচি ডাবের স্বপ্ন দেখে চমকে উঠল সে। সিসের শক্ত বলের জন্যে মুখের ভেতর, চোয়াল টনটন করছে। চোখ খুললেই সাদা ঘড়ির সময় সেকেণ্ডের পা ফেলে এগিয়ে চলেছে দুলকি চালে। মোজেসের বিছানার পাশে টেবিলের ওপর জলের জাগ, স্কোয়াশের বোতলের দিকে লোভী চোখে তাকাল পল্লব। জল আর স্কোয়াশ চুরি করার জন্যে বিছানা থেকে নেমে পড়ার পাগলামি ভর করল তার মাথায়। শরীরে জোর নেই, পাইপ, নলের জালে জড়িয়ে থাকায় নড়তে পারল না সে। পল্লব ভাবল, মোজেস বা তাসিয়োসের কি তেষ্টা পায়নি? ওরা কীভাবে তেষ্টা ঠেকাচ্ছে? স্ত্রী, মা, বাবা, আত্মীয়দের দেখে বোধহয় তেষ্টার কথা ভুলে গেছে ওরা।

এ্যানেসথেসিয়ার ঘোরে বুঁদ হয়ে আসছে পল্লবের মাথা। চোখের সামনে ফিরে আসে ছেলেবেলা, দেশ-গাঁ, মাঠ, পুকুরের ছবি। বাড়ির কাছে বাউলের ডাঙায় এখন তরমুজ ফলেছে। রসালো, বিরাট সেই ফলগুলোর চামড়া এবং বুক প্রতিদিন কালো আর ঘন লাল হয়ে উঠেছে। কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাথে যে বুড়ো মানুষটা ঝাঁকায় জলভরা কচি তালশাঁস নিয়ে বসে, সে নিশ্চয় নিজের জায়গায় এসে গেছে। তালশাঁসের বুকের ভেতরে মিষ্টি, ঠাণ্ডা যে জল থাকে তার সঙ্গে কোনও পানীয়ের তুলনা চলে না। বাইরের কোনও রেস্টুরেণ্টের ডিপ ফ্রিজ থেকে পেটি পেটি ঠাণ্ডা কোল্ড ড্রিংকস-এর বোতল বেরচ্ছে। খোলা বোতল উপচে বেরিয়ে পড়ছে, লাল, হলুদ, সাদা ফেনা। হাজার হাজার বোতলে স্ট্র গুঁজে কোল্ড ড্রিংকস টানার সোঁ-সোঁ শব্দ শুনছে সে। স্ট্র ছুঁড়ে ফেলে নিজের ভর্তি বোতল পল্লব গলায় ঢালল। গলায় পানীয় আটকে দম বন্ধ হয়ে যেতে দারুণ ঝাঁকুনিতে তার তন্দ্রা ছুটে গেল। ঘড়িতে দেখল রাত নটা। সেকেণ্ডের কাঁটা ঢিমেতালে ঘুরে চলেছে।

ফাঁকা ঘর। টেবিল ল্যাম্প নিভিয়ে দাড়িওলা নার্স কোথাও গেছে।

নীরবতায় ডুবে আছে ইনটেনসিভ কেয়ার রুম। পল্লবের নাড়ি দেখে তরুণী নার্স তুলো ভিজিয়ে কয়েক ফোঁটা লাল তরল দিল তার মুখে। সে কয়েক ফোঁটা গলায় না পেঁছিতে খাণ্ডব জ্বলতে থাকল তার কণ্ঠনালীতে। ঘড়িটা এত আস্তে হাঁটছে, যে মনে হচ্ছে থেকে গেছে। বার ঘণ্টা সময় এত লম্বা হয় কী করে? হঠাৎ তার মনে হল, মানুষের ষাট, সত্তরের পরমায়ু খুব কম নয়। ষাট, সত্তর বছরের জীবনে মানুষ অনেক ভাল অথবা অনেক মন্দ কাজ করতে পারে। ষাট, সত্তর বছরে কত সেকেণ্ড অঙ্ক কষে বার করার কথা ভেবেও ভয়ে পেছিয়ে যায় পল্লব। এত বড় গুণ এ মুহূর্তে করার শক্তি নেই তার। তবে এ কথা ঠিক যে এই ষাট, সত্তর বছর বেঁচে থাকার প্রতিটা সেকেণ্ড নতুন সম্ভাবনায় সীমাহীন। এক গ্লাস জলও পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা পানীয় হয়ে উঠতে পারে। ঘরের সবুজ আলো ফ্যাকাসে, মেঘ জমছে আকাশে। আষাঢ়ের ঘন কালো, নধর মেঘে ভরে যাচ্ছে আকাশ। ভীষণ গুমোট, একফোঁটা হাওয়া নেই। পাথুরে, শুকনো, শূন্য মাঠ আকাশের মেঘের দিকে চেয়ে হাঁ করে বসে আছে। দিগন্ত জুড়ে ঘন সবুজ গাছগাছালির মাথায় সজ্জিত, নিবিড়, গম্ভীর মেঘ। হঠাৎ গুমোট কেটে গিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া দিতে হলুদ ধুলোয় ঝাপসা হয়ে গেল চারপাশ। নিটোল বড় বড় দানার বৃষ্টি নামল পৃথিবীতে। একটা, দুটো, হাজার, লক্ষ ফোঁটায় ধুলো মরে গেল। বৃষ্টির ঘুমপাড়ানি সুরে গাছপালা নাচছে। ঠাণ্ডা, ঘন জল শুকনো মাটি সাঁ-সাঁ করে শুষে নিতে সোঁদা গন্ধে ভরে যাচ্ছে বাতাস। জল নেমে যাচ্ছে মাটির গভীরে, পৃথিবীর নিচে শক্ত পাথরের স্তর ভেদ করে লাভার সমুদ্র পর্যন্ত নরম, উর্বর করছে। পল্লব দেখল, আদিগন্ত সবুজ ফসলের ক্ষেতে শস্যমাতার কোলে মাথা রেখে সে শুয়ে আছে।

সকাল আটটায় এক গ্লাস অরেঞ্জ স্কোয়াশ নিয়ে এসে নার্স দেখল, পল্লব ঘুমোচ্ছে। তার কপালে, মুখে গুঁড়ি গুঁড়ি ঘাম, যেন সারারাত তার শরীরে শিশির পড়েছে। তোয়ালে দিয়ে পল্লবের কপাল, মুখ আলতো হাতে তরুণী নার্স মুছে দিল। তোয়ালের ছোঁয়ায় পল্লব জেগে উঠতে অরেঞ্জ স্কোয়াশের গ্লাস তার মুখের সামনে ধরল নার্স। নার্সের বাঁহাতে গ্লাস, ডান হাতে অল্প উঁচু করে ধরা পল্লবের মাথা। পল্লব গ্লাসে চুমুক দিতে নার্স বলল, টেক ইওর টাইম, আস্তে আস্তে খাও।

তাই করল পল্লব। ছোট ছোট চুমুকে, ধীরে ধীরে কমলালেবুর ঠাণ্ডা

রস সে গিলে নিচ্ছে। মিষ্টি, শীতল পানীয় তার গলা, বুক, পেট, পায়ের পাতা, অস্তিত্বের শেকড় পর্যন্ত ভিজিয়ে দিচ্ছে। মনে হচ্ছে বিশাল মরুভূমি পেরিয়ে প্রথম বর্ষার প্রবল বৃষ্টিতে স্নান করছে সে। সুখ, তৃপ্তিতে বুজে আসছে তার চোখ। গ্লাস শেষ করে ঘাড় তুলতে পল্লব দেখল, ইনটেনসিভ কেয়ার রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে সুন্দরলাল, পাশে রঞ্জন। দুজনের মুখে উপচে-পড়া হাসি। পল্লবের দিকে হাত নাড়ছে দুজনে।

পরপর দুটো ঘটনায় শেষদুপুরে খুব মুষড়ে পড়েছে পল্লব। আজ সকালে প্রায় তার চোখের সামনে মারা গেছে মোজেস। অপারেশনের দশদিন পরে মোজেস যে মারা যাবে, পল্লব ভাবতে পারেনি। তিনদিন ইনটেনসিভ কেয়াররুমে থেকে মোজেস, পল্লব একই দিনে ওয়ার্ডে যে যার বিছানায় ফিরে এসেছিল। ইনটেনসিভ কেয়াররুমে বেশ তাড়াতাড়ি সেরে উঠেছিল পল্লব। ওয়ার্ডে ফিরেও প্রথম দুদিন নিরাময়ের দৌড়ে পল্লবের চেয়ে এগিয়ে ছিল মোজেস। পল্লবের জ্বর হয়েছিল, মোজেসের হয়নি। কড়া এ্যান্টিবায়োটিকস খেয়ে দু-দিন পরে পল্লবের যখন জ্বর ছাড়ল, মোজেসের তখন জ্বর, বুকে ইনফেকশন। জোরালো এ্যান্টিবায়োটিকসেও কাজ হল না। মোজেসের শরীর এ্যান্টিবায়োটিকস নিল না। অব্যর্থ সব ওষুধকে তার শরীর বাতিল করে দিল। পাঁচ ছ-দিনে যমে মানুষের টানাটানির মধ্যে গতকাল পল্লবের মনে হয়েছিল, মানুষ জিতবে, সেরে উঠবে মোজেস। মনে করার কারণও ছিল। পাঁচদিন মোজেসের বিছানা পর্দায় ঘেরা থাকবার পর গতকাল পর্দা সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিছানায় মোজেস শুয়ে থাকলেও অনেক সুস্থ দেখাচ্ছিল তাকে। পল্লব তাই দেখেছিল। পল্লবের চোখে চোখ পড়তে আবছা হাসি জেগেছিল মোজেসের মুখে। আজ সকাল ন'টায় দৃশ্যটা যখন বদলে গেল, মোজেসের বিছানার তিনদিকের পর্দা টেনে দিয়ে মার্টোলি, ব্যারেট নার্সরা অস্থির পায়ে ওষুধ, ইঞ্জেকশন নিয়ে যাতায়াত শুরু করল, তখনও মোজেসের মৃত্যুর কথা কল্পনায় আনেনি পল্লব। পর্দা টেনে বিছানা ঘিরে দেওয়া, ঘেরাও মুক্ত করা, গত কয়েকদিন বারবার দেখে মামুলি, নিয়মমাফিক একটা কাজ মনে হয়েছে পল্লবের। সকালে মোজেসের পর্দা ঘেরা বিছানার পাশ থেকে তাই ডাক্তার, নার্সরা চুপচাপ চলে যাবার পরেও কী ঘটেছে পল্লব বুঝতে পারেনি। ওয়ার্ডের আর কোন রোগীও বোঝেনি। আধঘণ্টা পরে

সবুজ রঙের মশারি টাঙানো একটা ট্রলি বিছানা ওয়ার্ডে ঢুকতে চমকে গেল সকলে। চারপাশ মাথা ঢাকা কফিনের মত এ বিছানা কেউ মারা গেলে তবেই ওয়ার্ডে ঢোকে। মোজেস যে মারা গেছে, তখনই জানাজানি হল। সবুজ মশারি ঢাকা বিছানায় মোজেসকে তুলে ট্রলি যখন ফিরছে, তখন তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিল হিল। এখনও ক্যাথিডার না হওয়ায় সে সবসময়ে রাগে ফুঁসছে। ঢাকা গাড়ি দেখে বুকে ক্রস এঁকে হনহন করে নিজের ওয়ার্ডে চলে গেল সে। মশারি ঘেরা বিছানার দিকে ফাঁকা চোখে তাকিয়ে পাথরের মত বসে ছিল পল্লব।

শেষ শীতের লক্ষণ ফুটে উঠছে প্রকৃতিতে। মেঘ, কুয়াশা পাতলা হয়ে মাঝে মাঝে নীল হচ্ছে আকাশ, সূর্যের উঁকিঝুঁকিতে রোদে, আলোয় হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে পৃথিবী। নীল আকাশ, রোদ বেশিক্ষণ না থাকলেও বোঝা যায়, বসন্ত আসতে দেরি নেই। সকালে চোখ খুলে জানলার কাঁচে ঝলমল রোদ দেখে আজ ভারি খুশি হয়েছিল পল্লব। একটু বেলায় রোদ চড়লে একতলার মাঠে যাবার ইচ্ছে ছিল তার। রোদ উঠলেই এখন মাঠে রোগীর ভিড়, মেলা। সে যখন বেড়াতে যাওয়ার কথা ভাবছে, পর্দার আড়ালে মোজেস যে তখন মারা গেছে, সে টের পায়নি। নীল আকাশ, রোদ, মাঠে বেড়াবার ইচ্ছে মুহূর্তে পল্লবের কাছে বিস্বাদ, বিবর্ণ, নিরর্থক হয়ে গেল। পল্লবের মনে হল, অপারেশনের ঠিক পরে বুকের কাঁচা সেলাইয়ের ওপর লাগানো ব্যাণ্ডেজ যেমন প্রায়ই রক্তে ভিজে লাল হয়ে উঠত, এখন শুকনো সেলাই ফেটে একই কাণ্ড ঘটবে। ব্যায়াম করাতে তখনই মিসেস কুপার এসে যাওয়ায় পল্লব স্বস্তি পেয়েছিল। শরীরে, মনে ব্যায়াম করার ছিটেফোঁটা ইচ্ছে না থাকলেও মিসেস কুপারকে দেখে পল্লব বিছানায় শুয়েছিল।

বিছানার পাশে চেয়ারে বসে সুরেলা গলায় টেনে টেনে কুপার উচ্চারণ করছিল, ব্রিইইদ্ ইইন, ব্রিইইদ আআউট।

কুপারের বলার সঙ্গে তাল রেখে পল্লবের শ্বাস টানা এবং ছাড়ার কথা। সে উল্টোটা করছিল। ব্রিদ্ ইনে নিঃশ্বাস ছেড়ে ব্রিদ আউটে টানছিল। রোগীর অন্যমনস্কতা, এবং কারণ বুঝতে অসুবিধে হয়নি কুপারের। পল্লবকে ব্যায়াম করা থেকে রেহাই দিতে কুপার বলেছিল, আজ এই পর্যন্ত।

ইনটেনসিভ কেয়াররুম থেকে ফেরার পর কুপারের নির্দেশে রোজ দু-তিন বার পাঁচ, সাত মিনিট ব্যায়াম করতে হয় পল্লককে। সবচেয়ে কঠিন হল কাশির

ব্যায়াম। জোর করে কেশে বুক থেকে সর্দি, শ্লেষ্মা তুলতে স্টিলের তারে বাঁধা করাত কাটা বুকের পাঁজরা মড়মড় করে। বুকের লম্বা সেলাইয়ে এমন চাপ লাগে যে মনে হয় পটপট করে ছিঁড়ে যাবে সেলাই। বুকে শ্লেষ্মা, সর্দি নেই জেনেও আইসক্রিম কাপের মত কাগজের একটা পিকদানি সামনে রেখে কাশতে হয় তাকে। গলা খাঁকারি দিয়ে নিজে কেশে কীভাবে কাশতে হয় কুপার শিখিয়ে দেয় পল্লবকে। একবার, দুবার, তিনবার কাশার পরও কফ না ওঠা পর্যন্ত পল্লবকে ছাড়ে না কুপার। আশ্চর্য হল, পল্লব কফ নেই ভাবলেও কয়েকদফা কাশলে বুকের ভেতর থেকে ঘন কফ সত্যি বেরিয়ে আসে। বুক থেকে গলায় কফ ওঠার শব্দ শুনে পল্লবের পিঠে খুশিতে হাত রেখে কুপার বলে, বিউটিফুল, ফ্যানটাসটিক, ফ্যাসিনেটিং।

ব্যায়াম করায় আজ পল্লবের আলস্য, অবহেলা দেখেও কুপার কিছু বলেনি। মোজেস মারা যেতে কুপারও নিশ্চয় আঘাত পেয়েছিল। তাছাড়া এ হাসপাতালে অনেকদিন পরে মারা গেল একজন রোগী।

অসুখের সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোতে সময়, সমাজ, দায়িত্ব, কর্তব্যের কথা ভুলে পল্লব শুধু চিকিৎসা, হাসপাতাল, বেঁচে ওঠার স্বপ্ন দেখত। সেসব দিন এখন জন্মান্তরের স্মৃতি। মোজেসের মৃত্যুতে তার তৃপ্তি, প্রসন্নতা টলমল করে উঠল। সে ভারি বিপন্ন বোধ করছে। পালকের মত পলকা, তুচ্ছ লাগছে এ জীবন, বেঁচে থাকা। দুপুরে খাওয়ার রুচি ছিল না। সুপ, দুটুকরো রুটি আর আইসক্রিম খেয়ে মাংস, সব্জি সরিয়ে রাখল। দুপুর দুটো নাগাদ মার্টেলি, ব্যারেট, শার্লিকে নিয়ে কলিন্স এলেন ওয়ার্ডে। গম্ভীর মুখ, চকচকে টাক, দুহাতে হীরের কাপলিঙ্ক, কানে স্টেথো লাগিয়ে কলিন্স পরীক্ষা করলেন পল্লবকে। তারপর বললেন, য়ু আর অলরাইট, তুমি সুস্থ, বাড়ি যেতে পার।

সকালে মোজেসের মৃত্যুর পর যে মার্টেলি, ব্যারেটের মুখ থমথমে কালো হয়ে গিয়েছিল, এখন তারা হাসছে। কলিন্স বললেন, খুব বেশি নয়, সামান্য সাবধানে থাকতে হবে। কৃত্রিম ভালভ্গুলো যদি ঠিকঠাক কাজ করে তাহলে আগামী অনেক বছর সুস্থ থাকবে তুমি। তবে ভালভ্গুলো তোমার শরীরের অংশ নয়, ফরেন, বাইরের জিনিস। একটা সময় আসতে পারে, যখন তোমার শরীর এই বিদেশী ভালভ্ দুটোকে বর্জন করতে, ঝেড়ে ফেলতে চাইবে। তখন আবার অপারেশন করাতে হবে তোমাকে।

কলিন্সের কথা শুনে পল্লবের মাথাতে বাজ পড়ল। কৃত্রিম ভালভ্ দুটো যে আজীবন টিকবে না, শরীর বর্জন করবে, আবার অপারেশনের দরকার হবে, এমন আশংকা পল্লব করেনি। ফ্যালফ্যাল করে তাকে চেয়ে থাকতে দেখে কলিন্সের মুখে স্মিত হাসির ঢেউ জাগল। তিনি বললেন, সুস্থ, নতুন জীবনকে কাজে লাগাও, ভবিষ্যতে কী ঘটবে, না ঘটবে সে দুশ্চিন্তায় ক্ষয়ে যেও না।

প্লাস্টিকের এ ভালভ্ দুটো কতদিন চলবে, জানার ইচ্ছে থাকলেও সে প্রশ্ন পল্লব করল না। সঙ্গীদের নিয়ে কলিন্স চলে যেতে সকাল থেকে পরপর দুটো দুর্ঘটনার ধাক্কায় অবসাদ, ক্লান্তিতে গুম হয়ে গেল পল্লব। যুদ্ধজয়ের যে প্রবল আনন্দ, সফলতা নিয়ে সে গত দশদিন টগবগ করে ফুটছিল, সে জয় অসার, অর্থহীন ঠেকল। অনেকদিন পরে মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের কথা মনে পড়ল তার। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জিতে সিংহাসনে না বসে বৈরাগ্যে, বেদনায় কেন যে তিনি মহাপ্রস্থানে গেলেন, এতদিনে পল্লব যেন বুঝতে পেরেছে।

আজ সারাদিন রোদ আর মেঘের খেলা চললেও শেষ পর্যন্ত রোদ জিতেছে। সরে গেছে মেঘ। পৃথিবী জুড়ে সূর্যের কিরণ, তাপ ঝরে পড়ছে। একতলার মাঠে যাবার অনুমতি কলিন্সের কাছে নেওয়ার কথা ভেবেও ভুলে গেছে পল্লব। দুটো কৃত্রিম ভালভ্ ভবিষ্যতে অকেজো হয়ে যাবে শুনে সে আড়ষ্ট, অবশ হয়ে গিয়েছিল। একতলার মাঠে যাওয়ার কথা মনে ছিল না তার।

দুপুর ফুরবার আগেই রঞ্জন, শান্তা এসে যেতে একা থাকার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার আশায় হাসি ফুটল পল্লবের মুখে। নিঃসঙ্গতা থেকেই যত ভয়, দুশ্চিন্তার জন্ম, পল্লব জানে। খুব চনমনে প্রাণোচ্ছ্বল দেখাচ্ছে শান্তাকে। পল্লবের দিকে তাকিয়ে রঞ্জন বলল, একদম নরম্যাল, স্বাভাবিক, দেখে মনে হচ্ছে না দশদিন আগে অপারেশন হয়েছে তোর।

মোজেসের মৃত্যুর খবর পল্লব ইচ্ছে করেই রঞ্জন, শান্তাকে বলল না। কিছু একটা বলতে চেয়েও বিষয় বদলে রঞ্জন বারবার অন্য কথায় চলে যাচ্ছে। পল্লব টের পেয়েও কোনও প্রশ্ন করল না। কয়েক মিনিট পরে রঞ্জন বলল, শান্তাকে বিয়ে করছি আমি।

কথাটা শুনে দমকে দমকে খুশি, উল্লাসে পল্লবের অবসাদ, ক্লান্তি ভেসে যাচ্ছে। দুটো ব্যর্থতা মিলে যে একটি নিটোল সফলতার ছবি সে মনের মধ্যে তৈরি করেছিল, চোখের সামনে এত তাড়াতাড়ি সেই বর্ণাঢ্য ছবি দেখে আবেগে, বিহ্বলতায় কথা হারিয়ে গেল তার। মুখের দিকে রঞ্জন তাকিয়ে আছে দেখে

তাকে হঠাৎ দু-হাতে জড়িয়ে ধরল পল্লব। কিছু বলতে হল না তাকে। তার শরীরের তাপ আবেগ অনুভব করে রঞ্জন বলল, এ খবরে তোর চেয়ে বেশি খুশি যে কেউ হবে না, আমি জানতাম।

রঞ্জনকে ছেড়ে দিয়ে শান্তার দিকে যখন পল্লব তাকাল, তার দু-চোখে চিকচিক করছে জল। পল্লব দেখল, আলো ছড়িয়ে আছে শান্তার মুখে।

আমি কিন্তু বিয়েটা দেখে যেতে চাই।

পল্লবের কথায় মুচকি হেসে রঞ্জন বলল, বিয়ে হবে কলকাতায়। এখানে রেজিস্ট্রি করে পুজোর সময় কলকাতায় যাব, সব দায়িত্ব তোর।

হেসে রঞ্জনের কাঁধে হাত রাখল পল্লব।

মুমুকে নিয়ে সুন্দরলাল এল। পল্লবের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, হ্যালো ইয়ংম্যান, কবে বাড়ি যাবে?

পল্লব কিছু বলার আগেই মোজেসের খালি বিছানায় চোখ পড়তে সুন্দর-লাল প্রশ্ন করল, মোজেস কোথায়?

পল্লবের জবাব শুনে চুপ হয়ে গেল সকলে। একতলার মাঠ থেকে ভেসে আসছে কথা, হাসি, গ্রীষ্মের গুঞ্জন। নীল ইউনিফর্ম, হাতে প্লাস্টিকের থলি, বুরম্যান এসে পল্লবের কাঁধে হাত রেখে বলল, য়ু লেজি বোন্‌স্‌, এরকম একটা ঝকঝকে চমৎকার দিনে মাঠে না গিয়ে বিছানায় শুয়ে আছ কেন?

পল্লবের অবাক মুখের দিকে তাকিয়ে নকল ধমকের সুরে বুরম্যান বলল, পোশাক বদলে এখনি মাঠে যাও। এখনই।

বুরম্যানের কথায় হুড়মুড় করে বিছানা থেকে নেমে পড়ল পল্লব। হাতের প্লাস্টিক ব্যাগ টেবিলে রেখে বুরম্যান বলল, তোমাদের পাঁচজনের জন্যে পাঁচ ক্যান বিয়ার আছে। মাঠে গেলে তবেই পাবে।

থলি রেখে বুরম্যান চলে যেতে সুন্দরলাল বলল, চটপট, জলদি।

লিফ্‌টের সামনে দাঁড়িয়ে সুন্দরলাল বলল, মাঠে বসার আগে তোমাদের একটা ঘটনা বলে রাখি। চিকিৎসার সুযোগ চেয়ে মহারানীর কাছে পল্লব যে আবেদন করেছিল, তার জবাব এল প্রথম যেদিন পল্লবের অপারেশন করার কথা ছিল তার আগের দিন। পল্লবের আবেদন নাকচ করে দিয়েছিল মহারানী। ব্রমটন হাসপাতালে পল্লব যাওয়ার পর থেকে তার অপারেশন হওয়া পর্যন্ত যে কী উদ্বেগ, দুশ্চিন্তায় কাটিয়েছি।

লিফ্‌ট এসে সামনে দাঁড়াতে খাঁচার মধ্যে বিনয়, জয়া, টুকাইকে দেখল পল্লব। দরজা খুলে খাঁচা থেকে বেরবার আগেই পল্লবকে জয়া বলল, বিনয় তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। কাল, মানে তেইশে মার্চ, ও বোম্বে রওনা হচ্ছে।

দরজা খুলে বিনয়, জয়া, টুকাই বেরবার আগেই সুন্দরলাল বলল, তোমাদের নামতে হবে না। আজ মাঠে বসব আমরা।

কাল তেইশে মার্চ, পল্লব ভুলে গিয়েছিল। কেন ভুলে গিয়েছিল, ভাবতে আজ হাসি পেল তার। লিফটের মধ্যেই জয়া বলল, বোম্বে থেকে কলকাতায় যাবে বিনয়। অনিতাকে চিঠি, ছেলেমেয়ের জন্যে ছোটখাট উপহার, ইচ্ছে করলে বিনয়ের হাতে পাঠাতে পার তুমি।

এক সেকেণ্ড থেমে জয়া বলল, আবার আমরা দেশে ফিরব। ভাবতে কাঁটা দিচ্ছে শরীরে।

আমাকে নিয়ে যাবে ?

হালকা গলায় সুন্দরলাল প্রশ্নটা করলেও নিজের প্রশ্নের জবাব যখন সে দিল, তার গলায় বিষাদ, ক্লান্তি। সুন্দরলাল বলল, তুমি নিয়ে যেতে চাইলেও যাওয়া হবে না আমার। এই মেয়েটা, এর মা।

লম্বা করিডোরে সুন্দরলালের কণ্ঠস্বর পাখির ডাকের মত পল্লবের মনে হল।

ঘন রোদে ডুবে থাকা মাঠের চিকন সবুজ ঘাসে পা দিয়ে চারপাশ গভীর আগ্রহে দেখছে পল্লব। পাতাঝরা, কঙ্কাল গাছগুলোর শ্যাওলা-ধরা ফ্যাকাসে গুঁড়ি, ডালপালায় আকাশ, মাটি, রোদ, রসের রক্ত বইতে শুরু করেছে। সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকা গাছের মাথায়, শরীরে সবুজ কুয়াশার মত জড়িয়ে আছে হাজার, লক্ষ কচি পাতা, কিশলয়, কুঁড়ি। দুটো বাচ্চা ঘোড়ায় চেপে মাঠে ঘুরছে। ফুরফুরে হাওয়া নাকের মধ্যে দিয়ে পল্লবের বুকের গভীরে ঢুকে যায়। দু-চোখ বুজে জোরে শ্বাস টানল সে। আঃ, কি আরাম। পৃথিবীতে এত বাতাস, আলো, আনন্দ, ওয়ার্ডে শুয়ে সে টের পায়নি। পল্লব ঠিক করল, কাল সে বাড়ি ফিরবে। কালই, তেইশে মার্চ, মঙ্গলবার।